শেষ দৃশ্য

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

মুকুন্দ পাবলিশার্স
৮৮, বিধান সরণী, কলিকাতা—৪
(রসরাজ অমৃতলাল বসুর জন্মস্থান)

সাড়ে ছয় টাকা

প্রচ্ছদ—চারু খাঁ

মুকুন্দ পাবলিশার্স, ৬৮ বিধান সরণী কলিকাতা—৬, হইতে কানাই পাক
কর্তৃক প্রকাশিত ও সোমা প্রকাশন, ২এ, কেদার দত্ত লেন, কলিকাতা
হইতে শ্রীবাবুলাল প্রামাণিক কর্তৃক মুদ্রিত।

॥ এক ॥

হরিদ্বার থেকে কোনো একদিন ওরা রওনা হয়েছিল—ওরা অন্তত তাই বলে। প্রয়াগ বারাণসীর পথ ধবে গঙ্গার ধারে ধারে ওবা ডেরা বেঁধেছিল। রাজা হরিশ্চন্দ্রের নাম ওরা জানত—তিনি গঙ্গাপুত্র। সে নাম স্মবণ করার সময় ওবা মাটি ছুঁয়ে প্রণাম করত। তার চেয়ে বেশী ওদের জানা নেই। এরা বলবে তখন, না জানে বাবু কাঁহাসে আযা, লেকিন জানে, হামবা সব আছে গঙ্গা-পুত্তুব। বলবে, হরিদ্বারসে কোলকাত্তা- তেমন হাজার চটান খুঁজে পাবেন। চটানে হামরা ঘাটের কাঁথা-কাপড়ে ডেরা বেঁধেছি। ঘাটের দুচার পয়সায় হামলোগ নসিবকে ঢুঁড়েছি।

চটানে পাশাপাশি কুঁড়ে ঘর অনেকগুলো। কুঁড়ে ঘরগুলোর কোনোটায় চাল আছে, বেড়া আছে, দরজা আছে। চাল—ঘাটের ছেঁড়া তোষক এবং কাঁথাব, বেড়া—ফালি বাঁশের। কিছু কিছু ঘরের চাল আছে, কিছু ঘরেব বেড়া নেই, দরজা নেই। শুধু মেঝের উপব ফালি বাঁশের মাচান। মাচানেব নীচে রাজ্যের হাঁড়ি-কলসী। দরজাব বদলে কোনো ঘবে ছেঁড়া কাঁথা ঝুলছে। ছেঁড়া কাঁথাটাই দবজার মত কাজ করছে। ছেঁড়া কাঁথাটা তেলচিটে নোংরা। কোথাও পোড়া—চিতার আগুনের দাগ। তবু এতেই ওদের দবজার আব্রু, মনের আব্রু, চটানের ভালবাসার আব্রু। চটানের উঠোনে উঠোনে শূয়োরের খোঁয়াড়, মোরগের ঘর, কুকুরের আস্তানা। ঘরে ঘরে অভাব অনটন, মারধোর। আবার ভালবাসার কথা। ঘরে ঘরে হল্লা চীৎকার—নাচন-কোঁদন। তখন আসেন ঘাটোয়ারীবাবু। তিনি সালিসী সাজেন, বিচার করেন। চটানের মা-বাপ তিনি।

চটানের সঙ্গেই ঘাট অফিস। এখানে মড়ার নামধাম লেখানো হয়। একটা কাউন্টার আছে—ঘাটোয়ারীবাবু সেখানে একটা কালো চেয়ারে চুপচাপ বসে থাকেন সারাদিন। রাতে পাশের তক্তপোশে চুপচাপ শুয়ে থাকেন। ঘরে কতকগুলো ছবি টাঙানো আছে। এই শহরের বনেদী লোকগুলোর ছবি। তারা মরল—তিনি তাদের ছবি রাখলেন। এই ছবিগুলো দেখে কোনোদিন রাত কাটিয়ে দেন অথবা কোনোদিন ঘুমিয়ে পড়েন। ঘাট-অফিস পার হলে বারান্দা। ঘাটের কিছু কাঁথা-কাপড় ইতস্তত ছড়ানো। দুটো কুকুর শীতে কাতরাচ্ছে পাশে। ডোমেদের ছেলে পিলেরা কুকুর দুটোকে সরিয়ে দিয়ে নিজেরা দিব্যি আরামে ঘুমোচ্ছে।

তখন চটানে শীতের রোদ নেমেছে। শীতের ভোর। কাকের শব্দ, কুকুরের শব্দ, মোরগের শব্দ পাশাপাশি কোথাও। পাশাপাশি দুটো ঘরের ফাঁকে একটা শূয়োর পড়ে আছে। ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ করছে শূয়োরটা। দুটো বাচ্চা শূয়োর শীতে কাঁদছে।

হরিতকী দরজায় বসে সব দেখছিল। অন্য ঘরে গোমানী ডোম খক্ খক্ কাশছে। হরিতকীর কোমরে ব্যথা, তবু বসে বসে সব দেখছিল। কাশির জন্যে গোমানী ডোমের গোঁফ কাঁপছে। চোখ দুটো জ্বলছে—জবাফুলের মত হচ্ছে। কাঁপতে কাঁপতে মুখ থুবড়ে পড়ছে মাচানের ওপর। হরিতকীর কোমরে ব্যাথা, তবু এ-সব দেখছিল।

গোমানী এদিক ওদিক তাকাল। বেলা দেখল। শীতের বেলা—রোদে তাপ নেই, তাপ থাকলে ঘাটের তোষক বালিশ ছেড়ে চটানের উঠোনে কিংবা ঘাট-অফিসের বারান্দায় গিয়ে বসতে পারত। হরিতকী দরজায় বসে এখন সব কিছুই অনুমান করছে। হরিতকী দরজায় বসে রয়েছে এক মালসা গরম জলের জন্যে। দুখিয়ার বৌ ঘাটের পোড়া কাঠে গরম জল করতে গেছে। একটু দেরী হবে—সে ভাবল, এত সাধারণ কথা। গোমানীর

চোখ দুটো কাশির জন্য চোখ থেকে বের হয়ে আসতে চাইল। আবার ভিতরের দিকে পালাতে চাইল। সে দেখল বসে বসে। কোমরে ভীষণ ব্যথা! কোমরটা ধরে টিপল হরিতকী! ব্যথার উপশম খুঁজল। কোমরে চাপ ধরে আছে। সে দাঁড়াল, বাঁশে হেলান দিয়ে উঁকি দিল বাইরে। দুখিয়ার বৌ মংলী আসছে, হাতে গরম জলের মালসা। হরিতকী এত খুশী যে কিছু বলতে পারল না। মালসাটা টেনে নিয়ে পর্দার মত কাঁথার আব্রু ফেলে দিয়ে গা ধুতে লাগল।

গোমানী মুখ তুলে হরিতকীর খুশী-খুশী ভাবটুকু লক্ষ্য করে বিরক্ত হল। সঙ্গে সঙ্গে শরীরে চটানের নেমকহারাম উত্তাপ জমতে থাকল। রাগ হল ওর। খিস্তি করতে ইচ্ছা হল—মাগী জাত একটা জাত! ওয়ার আবার ধম্ম, ওয়ার আবার স্বভাব! মাগীর বাচ্চাটা হয়েছে শশ্মানে—হবে না! মাগীর নেই জাতের ঠিক, নেই ধম্মের ভয়—চতুরাকে মদ খাইয়ে খুন করেছে—ও শ্মশানে বাচ্চা বিয়োবে নাত কি হাসপাতালে বিয়োবে! কিন্তু বলতে পারল না। শরীর দুর্বল—শীতের ব্যাঁমোতে ওকে জব্দ করেছে। তা ছাড়া কাল না খেয়ে থাকার জন্য শরীরটা বেজান হয়ে আছে। ভুখা শরীর হল্লা করতে দিচ্চে না। সেজন্য শরীরে আরও কাঁথা-কাপড় জড়িয়ে পাশের কতকগুলি পোঁটলা-পুঁটলি ঠেলতে থাকল। বলল, উঠ্ নেলী, সকাল হো গিয়া।

কতকগুলো কাঁথা-কাপড়ের ভিতর থেকে নেলী ধড়ফড় করে উঠে বসল। নেলীর মুখটা শুকনো থাকত—যদি না রাতে এত গভীর ঘুমোত। শ্যামলা রঙের শরীর, এক মাথা চুল। চুলগুলো মুখ ঢেকে রেখেছে। চোখ অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। চোখে বিরক্তির চিহ্ন। আরও ঘুমোনোর ইচ্ছে। অথচ সে কিছু বলছে না, আড়-মোড়া ভাঙছে শরীরের। চোখ রগড়াচ্ছে। চুলগুলো জড় করে তালুতে খোপা বাঁধছে এবং মাচান থেকে নামার সময় বলছে, ক্যান ডাকলি বাপ? খোয়াব এয়েছিল, তু ডাকলি ক্যান!

গোমানী কাশল কবার। ওর উত্তর দিতে সেজন্য দেরী হচ্ছে, অথচ মেয়েটা নেমে যাচ্ছে - চলে যাচ্ছে। সে দম নিতে পারছে না। কথা বলতে পারছে না। ওর জ্বলন্ত চোখ একবার ভিতরে, একবার বাইরে যাওয়া আসা করছে। তবু কোনোরকমে লেপ-তোষকের ভিতর থেকে কচ্ছপের মত গলাটাকে বের করে দিল—ভুখ লাগিছে।

নেলী চলে যাচ্ছে। চলে যেতে যেতে থামল। আঁচলটা টেনে কাঁধে ফেলল। চোখ টান করে, ঘাড় কাত কবে তাকাল বাপের দিকে। তারপর ফের চলতে চলতে উঠোনে নেমে গেল। নীচে থেকে শূয়োরের বাচ্চা দুটোকে ছেড়ে দিল—টঙ্‌-এ কবুতর ছিল, তাও উড়িয়ে দিল। শেষে বসুমতীকে প্রণাম কবল দুহাত ঠেকিয়ে।

এমন অবস্থায় গোমানীর রাগ না বেড়ে যায়না। নেলী কথা বলছেনা, খেতে দেবে কি দেবে না—তাও কিছু বলছে না। বড় বাড় বাড়ছে মেয়েটা। সে ডাকল, হেঁ শূয়োরের ছা, তুকে কি বলিছে হাম? যেছিস কুথা!

—যেছি—মরতে। নেলী সাফ জবাব দিল। সাফ সাফ কথা বলল। সে ফের মাচানে উঠে গেল এবং একটা কাঁথা শরীরে জড়িয়ে নিল। রোদের তাপ বাড়ছে একটু এক করে। উঠোনের উপর দাঁড়িয়ে সে তা ধরতে পারছে। কবুতরগুলো উড়ে উড়ে চালে, মাঠে ময়দানের ঝাউগাছটায় বসল। সে দেখল কবুতরগুলো পরস্পর ঠোঁট কামড়াচ্ছে—সে দেখল। ঝাউগাছের ডাল ধরে রোদ নীচে নামছে—সে দেখল। একটা পোয়াতী মাদী শূয়োর কাঠগোলায় শুয়ে আছে—সে দেখল। সে এখন ওর গঙ্গা যমুনাকে খুঁজছে! এই ভোরে ওরা কোথায় গেল! সে গলা ছেড়ে ডাকল, গ···ঙ্গা··· যমু · না, কুথা গেলি এবেনে তুরা।

গোমানী কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল মাচানে। বুকটা ওর ভেঙ্গে যাচ্ছে উঠতে। নেলীর ভাবসাবগুলো ওকে উন্মাদ করে দেবার মত। সে কাশতে কাশতে বলল, দেখ্ নেলী, তুর এ ভাব-

সাব হাম্যা ভাল লাগে না। যা বুলবি সাফ সাফ বুলবি—লয়তো ঘাটের মড়া মুখে ঠেসে ধরবে।

নেলী তখন ওর কুকুর দুটোকে আদর করছিল। ওরা ওর গায়ের উপর লাফিয়ে উঠছে। সে শুনতে পাচ্ছে -বাপের গলায় গরল। সেও গরল তুলল গলায়—কিয়া বাত তুম বলেহ! ঘাটের মড়া ঠেসে ধরবে! ধর ধরে যদি খানা মিলে ত জরুর ধরবে।

হরিতকী শরীর পরিষ্কার করে ফের দরজায় বসে সব দেখছে। শ্মশানে বিয়োনো বাচ্চাটা কাঁদছে ওর কোলে। সে এই সব দেখতে দেখতে ষাট সোহাগ করল, নেলী ওর ঘরের দিকেই আসছে। কুকুর দুটো তখন উঠোনের মাটি শুঁকছে। হরিতকী বাচ্চাটাকে রোদে রেখে দিল। তখন ঝাড়ো ডোমের ঘরে কি নিয়ে বচসা হচ্ছে। শিব মন্দিরের পথ ধরে সহর থেকে যাত্রী নামছে তখন। ওদের কোলাহল এই চটানে ভেসে আসছে। নেলী সেই সব কোলাহল শুনতে শুনতে হরিতকীর দরজায় এসে হাজির হল। পিসির বেটি হয়েছে—বেটির পাশে বসল। নাক নেড়ে আদর করল।

হরিতকী বলল, কিরে ভোর না হতেই বাপের সাথ ঝগড়া বাঁধালি?

—হেঁ বাঁধিয়েছি ত। নেলী জবাব দিতে গিয়ে ঘাড়টা কাত করে দিল।

হরিতকী ধমক দিল নেলীকে। ওকে শাসন করারও ইচ্ছা। —যা যা ঘরে যা। বাপকে দুটো রেঁধে দেগা। হাসপাতাল থেকে পুলিশ এলে ওকে ফের ভুখা থেকে যেতে হবে।

নেলী চুপচাপ ঘাড় গুঁজে পিসির বেটির পাশে কিছুক্ষণ বসে থাকল। তারপর কি ভেবে পিসিকে জবাব দিতে গিয়ে ভেঙ্গে পড়ল—তু বল পিসি, হামি ওয়াকে কি রেঁধে দি। ঘরে কিছু না আছে। গিল রাতে ভুখা থাকতে হল। বুললাম তু যা, এক আধ রূপেয়া ধার লিয়ে চাল দাল কিছু লিয়ে আয়। গিল ঠিক, টাকায়

আট আনা স্থদে ধার ভি লিল, কিন্তুক কিছু চাল দা[illegible] দিল না। পারে সব কুচ রেখে দিল। পিসি, হামি ওয়াকে কি বেঁধে দি বুল।

এই সব কথা শুনে হরিতকী নেলীকে এড়িয়ে যেতে চাইল। এই সাত সকালে গোমানী ডোমের জন্য দরদ উথলে ওঠায় নিজের উপরই সে বিরক্ত হল। সে জন্যে হরিতকী কোনো জবাব দিল না। নেলী পিসির বেটির পাশে বসে মাটিতে আঁচড় কাটছে। ঘাটের কাঠ এসেছে গরুর গাড়ীতে। দূরে কুকুরের আওয়াজ, মোরগ, শূয়োর, কবুতরের শব্দ নেলীর দেহ-মনকে কেমন মাতাল করে রেখেছে যেন। সে নড়তে পারছে না পর্যন্ত। গোমানী কাশছে। বসে বসে গোমানীর গালাগাল খাচ্ছে। সে তখন মাতালের মত উঠে দাঁড়াল। কুকুর দুটোকে নিয়ে গঙ্গায় নেমে গেল। কিন্তু ভুখা শরীর নিয়ে ওর চলতে খুব কষ্ট হচ্ছে।

শীতের গঙ্গা। জল নেই—হু হু করে বাতাস আসছে উত্তর থেকে। নেলীর এক মাথা চুলের খোঁপা খসে গেছে। ওর পাঁশুটে চুল বাতাসে উড়ছে। ঘাটে মড়া আসেনি। শ্মশানটা সেজন্য খাঁ খাঁ করছে। শ্মশানের চালাঘর ফাঁকা। কুকুরগুলো সেখানে জটলা পাকাচ্ছে। নেলীর উপোসী শরীরটা চলছেনা। ও ক্রমশ নীচে নেমে যাচ্ছে। যাত্রীদের ঘাট থেকে সে একটু দূরে দাঁড়াল। কুকুর দুটো ওর দু পাশে। কুকুর দুটোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে আকাশ দেখল, উত্তরের হাওয়া গায়ে মাখাল এবং হিসেব রাখল যাত্রীরা কটা তামার পয়সা জলে ফেলছে।

চটান থেকে নামছে গেরু, সোনাচাঁদের ছেলে টুনুয়া, ঝাড়ো ডোমের বেটা লখি। গেরু নেলীর পাশে এসে দাঁড়াল। নেলীর গঙ্গা যমুনাকে আদর করল। ওরা যাত্রীদের অপেক্ষায় আছে। যাত্রীরা উঠবে, ওরা নামবে। যাত্রীদের পয়সা, সোনাদানা, ডুবে ডুবে তুলবে।

গেরু বলল, নেলী তু এত সকাল সকাল!

—তুভি ত এসেছিস রে। সকাল সকাল হামি একলা না আছি।

—লেকিন তুর বাপ চিল্লাতে সুরু করেছে। বুলছে, ও মাগি কাঁহা গ্যাল।

—বুলছে ত বুলছে। লেকিন তুর নসিব ত ভাঙ্গেনি।

লখি, টুনুয়া ততক্ষণ সবুর করতে পারল না। ওরা সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সন্তর্পণে নেমে পড়েছে। যাত্রীদের চোখেও ওরা ধরা পড়ছে না। টুনুয়া একটা ডুব দিল। টুনুয়া, লখি একসঙ্গে ডুব দিল। ওরা ডুব দিয়ে যাত্রীদের ভিতরেই ভেসে উঠছে। ওরাও যাত্রী হয়ে গেছে। নেলী গেরু এই সব দেখতে পেয়ে লাফিয়ে জলে পড়ল। শীতের জলে ডুব দিয়ে যাত্রীদের ভিতর হারিয়ে গেল।

যাত্রীরা সব উঠে যাচ্ছে। ওরা ডুব দিয়ে দিয়ে সাঁতার কাটছে এবং গঙ্গার বুক থেকে মাটি, কাঁকড়, বালি খড়কুটো সব তুলে আনছে। গেরু অনেকক্ষণ ডুব দিয়ে থাকতে পারে। বালির ওপর মাছের মত খুঁটে খুঁটে চলতে পারে—নেলী জলের ভিতর থেকে সব দেখতে পাচ্ছে। জলের ভিতর দিয়ে গেরুর শরীরটা বেশী মোটা লাগছে। কোমরটা সরু লাগছে। বুকের পেশীগুলো শক্ত মনে হচ্ছে। গেরু অনেকক্ষণ জলের নীচে ডুব দিয়ে থাকতে পারে। মাছ হয়ে ভাসতে পারে। গেরুর নসিব ভাল — সে একটা একটা তুটো পয়সা পেল। তামার পয়সা। সে এক আনা পেল! নেলীও ডুব দিয়ে দিয়ে জল কাটছে। আঁচলটা বুক থেকে নেমে মাছের পাখার মত কাঁপছে। নেলী জলের নীচে দেখল গেরু পয়সা খুঁজছে আর ওর দিকে যেন তাকাচ্ছে। নেলী এসময় এক আনা পেল, গেরু রে, তু আরও দেখ, যত পারিস দেখ। নেলী ডুব দিয়ে দিয়ে চোখ লাল করছে – যদি নসিব খোলে। যদি সোনাদানা উঠে আসে আবর্জনার সঙ্গে। দাঁতে দাঁত ঠেকল। সে ডুব দিল। এত করেও সে যখন

পাচ্ছেনা, যখন লখি, টুনুয়া সোনাদানা পেল, যখন সকলে খুশী হয়ে উঠে যাচ্ছে, তখন নেলী গাল দিল—ডাক ঠাকুর তুর মুখে আগুন!

জল থেকে নেলী উঠে এল। গেরু উঠে এল। উত্তরের হাওয়া আরও বেড়েছে। নেলী শরীর সামলে নিল এবং বলতে ইচ্ছা হল, গিল কাল হামি ভুখা থাকল গেরু। তুব চারঠো পয়সা হামারে দিয়ে দে। দু আনায় মুড়ি পিঁয়াজি কিনেলি। দুটো হামি খাই, দুঠো বাপ ভি খাক। কিন্তু নেলী বলতে পারল না—জলের নীচে যে ইচ্ছার রঙে ডুবেছিল, উপরে উঠে সেই ইচ্ছাই ওকে বলতে দিল না। গেরুর দিকে তাকাল এবং নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে দৌড়ে উপরে উঠতে থাকল। বলতে থাকল যেন—গেরুরে, তু বহুত জোয়ান হয়ে উঠেছিস। উপরে উঠে টুনুয়াকে ডাকল, এ টুনুয়া শোন। টুনুয়া কাছে এলে বলল, চারঠো পয়সা ধার দিবি। কাল হামি ভুখা থাকল, বাপ ভুখা থাকল।

টুনুয়ার কাছ থেকে চারটা পয়সা নিয়ে ফের ছুটতে থাকল নেলী। কাপড়ের আঁচলে পয়সা দু আনা শক্ত করে বেঁধে শিব মন্দিরের পথে উঠতে থাকল। আকাশটা পরিষ্কার। প্রচণ্ড শীত যেন আকাশ থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে নামছে। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কাপড় নিংড়াল নেলী। দুপুর হচ্ছে অথচ রোদের উত্তাপ বাড়ছে না। নেলী গায়েপিঠে উত্তাপ নিয়ে শরীরে উত্তাপ জমাতে পারল না। সে বিরক্ত হয়ে চটানের দিকে নেমে গেল। ঝাড়ো ডোম গাওয়াল করতে বের হচ্ছে—লাঠির দু পাশে ডালা-কুলো ঝুলছে। সোনাচাঁদ সহরের কুকুর বেড়াল ফেলতে মিউনিসিপাল অফিসে যাচ্ছে। দুখিয়া হল্লা করছে চটানে। নেলী চটানে না ঢুকে পুরোনো অশ্বত্থের নীচে দাঁড়িয়ে শুনল সব। দুখিয়া নালিশ দিচ্ছে গোমানীকে—তেরে বেটি চোর গোমানী। তেরে বেটি চোর। সাবধান করে দিস বেটিকে।

পুরোনো অশ্বত্থের নীচে দাঁড়িয়ে নেলী বুঝল বাপ উত্তর

করছে না। এখানে দাঁড়িয়ে অন্তত কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। বাপের চেহারা এ সময় কেমন দেখাচ্ছে এই ভেবে নেলী মুষড়ে পড়ল। ভাবল, এখন চটানে উঠে গেলে বাপ হয়ত চেলা কাঠ নিয়ে তেড়ে আসবে। বলবে, হারাম তু চটানসে নিকাল। নেলী সুতরাং নড়লনা। আরও কিছু কথাবার্তা না শুনে সে নড়তে পারছে না। বাপের আওয়াজ কানে আসায় পুরোনো অশ্বত্থের নীচে দাঁড়িয়ে থাকল। শীতে কাঁপল। কারণ আওয়াজ শুনলেই সে বুঝতে পারবে বাপের রাগ চেলাকাঠের না দু দণ্ড গালমন্দের। নেলী শুনল তখন বাপ বলছে—চোর! মেরে বেটি চোর!

—হা জরুর চোর। তেরে বেটি চুরি করে লিছে ঘাটের কাপড়। বে হুদা হামার ডাক হল। তু কিছু করে না দিস ত পাঁচ জনকো হাম জরুর সালিসী মানে।

—তু সালিসী না মানে দুখিয়া। ও আর ঘাটসে কিছু লেবে না। আমি ওয়াকে বারণ করে দেব।

নেলী বাপের এইসব কথাগুলো শুনে নিশ্চিন্ত হল। চটানে উঠে গিয়ে মাচান থেকে কাঁথা-বালিসের ভিতর থেকে একটা শাড়ী বের করল। ভিজে শাড়ীটা এবং কাঁথাটা চালের উপর ফেলে দিল। এ সময় হরিতকী দরজা থেকে মুখ বের করে দেখল দুখিয়া নেই—চলে গেছে। নেলী কাপড় ছাড়ছে, কাপড়ে বুক ঢাকতে চায় না। হাঁটু ঢাকতে চায় না। তবু নেলী কাপড়টা টেনেটুনে সব শরীরে পেঁচিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। এই সব দেখে হরিতকীর কষ্ট হল এবং হাতমুখ নেড়ে ভিতরের কষ্টটাকে উগরে দিল—চামার! চামার! ছোটলোক!

গোমানী কাঁথা-কাপড়ের ভিতর থেকে সম্মতি জানাল, ছোটলোক—হা ছোটলোক বটে।

হরিতকীর মনের ঝাল যেন মিটছে না।—ঘাটের কাপড় না বুলে লিয়েছে ত ওয়ার জান গেছে!

—হা তাই বটে।

—চুরি করে লিছে ঘাটের কাপড়! এর নাম চুরি! আর বুলি গোমানী, বেটিকে কাপড় দেওয়ার মুরদও নাই তোমার! ঘাট থেকে চুরি করে তবে ওয়ার পিনতে হয়।

নেলী পুরোনো অশ্বথের নীচে দাঁড়িয়ে বাপের শেষ জবাবটাও শুনে গেল।—নাই আমার, হা নাই যা বুলছ।

নেলী চটান পার হয়ে শিব মন্দিরের পথ ধরল। সে শরীর ঢেকে গা বাঁচিয়ে হাঁটছে। সে জানে কেউ ওকে ছোঁবে না। সে জানে ছুঁয়ে দিলে ওরা স্নান করবে গঙ্গায় এবং নেলীর চোদ্দ পুরুষকে উদ্ধার করবে। নেলী রাস্তার পাশ দিয়ে হাঁটল। বাবুদের দেখে আল্গা হয়ে থাকল। নর্দমার পাশে দাঁড়িয়ে শরীর আল্গা করে দিল। জড়সড় হয়ে সকলকে পথ খুলে দিল।

নেলী রামকান্তর দোকানে এসেও আল্গা হয়ে দাঁড়াল। রামকান্ত বলল—তোর বাপ চটানে আছে, না হাসপাতালে গেছে?

—চটানেই আছে। মাচানে পড়ে গোঙাচ্ছে।

—ধারে টাকা নিল, টাকাও দিল না, সুদের নামও করল না।

—করবে। হাতে টাকা হলে বাপ দিয়ে দিবে।

এবার গলা খাটো করল রামকান্ত। জেঁাকের মত গলা লম্বা করে দিল। এবং ফিসফিস করে বলল, হরিতকীর বাচ্চাটা মেয়ে না ছেলেরে?

—মেয়ে বাচ্চা দি লিছে পিসি।

—তুই বাচ্চা দিবিনে? তোর বাচ্চা দিতে সখ যায়না?

নেলী বাবুর মুখ দেখে অর্থ ধরতে পারল। সে চোখ ঢাকল। মুখ কুঁচকাল। কিন্তু কিছু প্রকাশ করল না। রামকান্ত সুদের মহাজন—নেলী রামকান্তকে ঘাঁটাতে সাহস করল না। অথচ চোখে-মুখে অস্বাভাবিক ভাব নেলীর। বিরক্তিতে চোখ দুটো জ্বলছে। তবু সে এতটুকু রাগ দেখাল না। নরম গলায় ঢুলে ঢুলে বুলল, কি যে বুলছে বাবু!

এমন কথা শুনে অনেক দিন পর রামকান্ত প্রাণ খুলে হাসল। কি যে বুলছে বাবু! নেলীর মা ফুলনও এ-গলায় এমনি করে .বলত। এমনি করেই চোখমুখে অস্বাভাবিক ভাব ফুটিয়ে তুলত। তখন ফুলনের লম্বা মুখটা আরও মিষ্টি লাগত। .তখন ফুলনের ভরা কোটালের যৌবন। নেলীকে প্রশ্ন করার মত সেদিন ফুলনকেও প্রশ্ন করেছিল—ঝাড়ো ডোমের বাচ্চাটা মেয়ে না ছেলে? ডোমের বৌ বাচ্চা কেমন দিলে। তুই বাচ্চা দিবিনে, তোর মা হতে সখ হয় না?

তারপর একদিন চটানে শুনতে পেয়েছিল গোমানীর পোয়াতী বৌর কান্না। মাচানের নীচে ফুলন উপুড় হয়ে পড়ে আছে। মেটে হাঁড়ি-কলসীগুলো নীচে থেকে সরিয়ে রেখেছে গোমানী। ঘাটের কাঁথায়-কাপড়ে মাচানের চারিদিক ঢেকে দেওয়া হয়েছে। মাচানের উপর গোমানী নিশ্চিন্তে বিড়ি টানছে। সুদের মহাজন রামকান্ত চটানে এসে অপেক্ষা করছে। এসময় গোমানীর টাকার দরকার হতে পারে। টাকা দেওয়ার জন্য বসে রয়েছে, সে। গোমানী এখন মাচানের উপব ফকির দরবেশের মত। গোমানী এখন ঈশ্বরকে যেন উদ্দেশ করে বলছে, ছুনিয়া আজব জায়গা। এখানের জনম-মরণ বহস্য আমরা ছোট মানুষ হয়ে কি করে জানব। ওর আসমান, ওর জমিন—ও ঠিক টেনেটুনে খালাস করবেই। মাঝে মাঝে গোমানী মাচানের নীচে উঁকি মারছিল আর দেখছিল—খালাস পাচ্ছে কি পাচ্ছে না, এবং ঝাড়ো ডোমের বৌকে বলছিল—ভাবি, টেনে নামাসনা। ওকে আপনি নামতে দে।

সেই মেয়ে এখন এত বড় হয়েছে, সেই মেয়ে এখন কাপড় সামলে হাঁটে। সেই মেয়েকে সে অযথা এখানে দাঁড় করিয়ে রাখতে চায়।

নেলী কিছু মুড়ি কিনল। কিছু পেঁয়াজি কিনল।

নেলী চটানে ফিরে এসে দেখল মাচানে তেমনি উপুড় হয়ে

পড়ে আছে গোমানী। বালিসের ভিতর মুখ গুঁজে পড়ে আছে। হাত পা কুঁকড়ে রেখেছে। শরীরটা শুকনো লাউ ডগার মত। গোমানী নেতিয়ে আছে মাচানে। মানুষটার পেটে রাজ্যের খিদে। নড়তে পারছে না—এ-পাশ ও-পাশ হতে কষ্ট।

নেলী সন্তর্পণে উঠোন পার হয়ে ঘরে উঠল। মাচানে বসল। ধীরে ধীরে বাপের শরীর থেকে কাঁথা-কাপড় সরিয়ে ডাকল—বাপ, উঠ্‌রে বাপ। খা। হুটো দানা মুখে দেনেসে তাগদ হবে শরীরে। হাসপাতালসে আজ জরুর সিপাই আওগে। তু খা লে।

গোমানী উঠে বসল। ওর পাতলা আমসী ঠোঁটে হাসি ফুটল। শেষে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে মুড়ির ঠোঙাটা জোর করেই যেন নেলীর হাত থেকে কেড়ে নিল। তারপর মুঠো মুঠো মুড়ি কুমীরের মত হাঁ করে মুখটায় ঠেলে দিতে থাকল এবং মুড়ি খেতে খেতেই গোমানী বলল—খুব ভাল মুড়ি আছে। হুটো মুড়কী নিলে ভাল হত রে। লয় তো কিছু বেগুনি, ফুলরি।

—লিয়েছি। এক আনার পিঁয়াজি ভি লিয়েছি। দ্যাখ্‌ কেমন গরম গরম আছে।

বাপের এই খুশী-খুশী ভাবটুকু নেলীর ভাল লাগছে। নেলী আঁচলের গিঁট খুলে পেঁয়াজির ঠোঙাটা ওর হাতে দিল।—দেখ্‌ কেমন গরম গরম লিয়েছি। তুর চারঠো হামার চারঠো। মুড়ি সবটা খেয়ে লিসনা আবার। হামার লাগি রাখিস। ভুখ হামর ভি লাগিছে।

নেলীকে খুশী-খুশী দেখে বিড়ি খাওয়ার জন্য গোমানী চারটা পয়সা চাইল।—চারঠো পয়সা জায়দা হবে ?

নেলী ঘাড় নাড়ল। তারপর বাপের দিকে চেয়ে বলল—না।

গোমানীর দাঁত না থাকায় কথা খুব অস্পষ্ট। মুখভর্তি মুড়ি থাকার জন্য কথা আরও অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মুড়িগুলো মাড়ি দিয়ে চিবুচ্ছে আর বলছে, চারঠো পয়সা জায়দা হোবেনা বুলছিস। তবে চার পয়সার বিড়ি কিনে লিতাম।

নেলী দেখছে বাপ মুড়ি প্রায় শেষ করে এনেছে। একবার ওর কথা ভাবছে না। যেন সবটা মুড়ি, সবকটা পেঁয়াজি শেষ করে দেবে। যেন গোমানী একাই খাবে সব। বাপের এই অবিবেচনার জন্য নেলী বিরক্তিতে ভেঙ্গে পড়ল! না হবে না। পয়সা হামার নেই। পয়সা থাকে কুথা? দুচার পয়সা তু হামারে দিস?

—তব তু এ-পয়সা কাঁহা পেলি? বুল শূয়োরের ছা, তু কুথা পেলি? গোমানী গলাটাকে ওঠাতে নামাতে থাকল।

—পয়সা হামি কামিয়েছি। এ-মুড়ির পিণ্ডি যে তু গিললি সে হামার রোজগারের। লজ্জা লাগেনা তোর মেয়েমানুষের রোজগার খেতে! পোড়া কাঠ খেতে পারিসনা ঘাটের। পোড়া মানুষ চিবিয়ে খেতে পারিস না! নেলীর মুখে গরল উঠল।

—খুন! খুন করে দেব। গোমানী কাঁথা-কাপড় ছেড়ে উঠে পড়ল। কোমর থেকে লুঙ্গিটা খুলে যাচ্ছিল, সেটা কোনোরকমে ধরে ফেলল! এক হাতে কোমরের লুঙ্গিটা চেপে ধরে মাচান থেকে লাফ দিয়ে নামল। সে মুখ থুবড়ে পড়তে পড়তে বেঁচে গেল। মাচানের নীচে গলা বাড়িয়ে সে খুঁজছে দা-টা। মুড়ির ঠোঙা এক হাতে—সেটা ছাড়ছে না। মাচানের নীচে থেকে গলাটা ফের কচ্ছপেব মত বের করে ধরল। কচ্ছপের মত চোখ ক র সে নেলীকে দেখছে—খুন করে দেব বেইমানের ছা! আমি না তোর বাপ!

নেলী ভেংচে উঠল। হাত পা নেড়ে বলল, বাপরে! হামার বাপ! বাপের মুরদ দেখলে বাঁচিনে!

গোমানী ওর ভোঁতা দা-টাকে মাচানের নীচে খুঁজে বেড়াচ্ছে। হাঁড়ি টেনে, কলসী টেনে দা-টা খুঁজল। দা-টা ওর এ-মুহূর্তে চাই-ই। খুন সে যেন করবেই। নেলীকে খুন না করে জলগ্রহণ করবেনা—এমন ভাব চোখে-মুখে। নেলী কিন্তু নড়ছে না। মেঝেতে দাঁড়িয়ে বাপের কাণ্ড দেখছে। আর যখন দা পেয়ে গোমানী ওর সামনে দা-টাকে ঘোরাতে ঘোরাতে চীৎকার করল—খুন, খুন, আজ খুন হবে লিশ্চয়, তখন নেলী গলার স্বরটা শক্ত করল এবং পরে কোমল করে বলল,

চুপ কর্, চুপ কর্। অমন করে ছোটলোকের মত চিল্লাসনা। যা খাচ্ছিস তাই খা, পয়সা না থাকলে দি কোথেকে।

গোমানী দেখল ঠোঙায় মুড়ি প্রায় নেই। সুতরাং সে নেলীর মুখে ঠোঙাটা ছুঁড়ে দিল। —আর খাবনা। তুর গতরের রোজগার হামার লাগেনা।

গোমানী ফের মাচানে উঠে কাঁথা-কাপড় গায়ে দিয়ে বসে থাকল। যেন সে এ-মাচান থেকে আর উঠবেনা, নড়বেনা। অনড় হয়ে বসে থাকবে। হাসপাতালে যাবে না। কোথাও যাবেনা। কোথাও না। নেলী হাঁটু গেড়ে মাটি থেকে একটা একটা করে মুড়ি কোঁচড়ে তুলছিল তখন। একটা দুটো করে মুখে মুড়ি ফেলছিল। এই দুঃসহ দুঃখে বাপের দিকে চোখ খুলে তাকাতে পারছেনা। রাগে চোখ থেকে জল বের হচ্ছে। ওর কান্না পাচ্ছে। এবং এ-সময়ই নেলী গেরুর মুখ মনে পড়ছে। যোয়ান শরীরটার কথা মনে পড়ছে। কৈলাস ডোমের বেটা দিন দিন চটানে মরদ হয়ে উঠছে। বাপের মত কসরত দেখাতে শিখেছে। বল্লম ছুঁড়ে গাছ এফোঁড় ওফোঁড় করে দিচ্ছে। আকাশ ফুটো করে দেওয়ারও ইচ্ছা যেন গেরুর।

মাচানে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকল গোমানী। রাগ পড়তে সুরু করছে। কিন্তু নেলীর হাবভাব দেখে মনটা ওর ফের বিগড়ে গেল। নেলী পিঁয়াজি খাচ্ছে—আহা পিঁয়াজি খাচ্ছে—যেন কিছু খায়না। যেন গোমানীকে দেখিয়ে দেখিয়ে খাওয়া হচ্ছে। যেন বলছে খেতে খেতে তোর কামাই খাচ্ছিনারে, আমার মুরদের কামাই খাচ্ছি। তবে এত ডর কিসের।

—থুঃ থুঃ! গোমানী থুথু ছিটাল। —না আর খাবনা। তোর গতরের রোজগার হামার লাগেনা। যেন পারলে এক্ষুনি উগলে দেয় সব। বাপের এই সব কাণ্ড দেখে

নেলী খিলখিল করে হেসে উঠল। না হেসে পারল না। না হাসতে পারলে খালি পেটে খিল ধরে যাবে যেন। উঠোনে নেমেও সে হাসল। পাগলের মত হাসতে থাকল। মুখে বাপের থুথু লেগে আছে, মুড়ির কুচি লেগে আছে —সব মিলে ভীষণ একটা দুর্গন্ধ। নেলী হাত মুখ ধুল মালসার জলে। ফের হাসতে গিয়ে দেখল সামনে দাঁড়িয়ে সিপাহী। নেলী ফাটা বেলুনের মত চুপসে গেল। ছুটে এসে ঘরে ঢুকল সে।

হরিতকী গোমানীর এই সব কাণ্ড দেখে বলেছিল—তুমি একটা বাপই বটে গোমানী।

—হে বাপই বটে! গোমানী মাচানে বসে জবাব দিয়েছিল।

—এটা বহুত আচ্ছা কাজ হলনা। মেয়েটা ভি না খেয়ে রয়েছে, ওটাকে তুমি খেতে দিলো না।

গোমানী একটা কোঁত গিলল।

গোমানীর সওয়াল শুনল নেলী। সিপাহী উঠোন পার হয়ে গোমানীর খোলা ঘরটার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ওর জুতোর শব্দে মুখ তুলল গোমানী। সিপাহীকে দেখে খুব ভালমানুষ হয়ে গেল। যেন এতক্ষণ চটানে কিছুই হয়নি। সে হাসল পুলিস দেখে!

নেলী সিপাহীকে একটা পিঁড়ি দিল বসতে।

সিপাহী বলল—হে গোমানী চলেহ।

—হা জি চলতে রহেহ। গোমানী কাঁথা বালিসের নীচে এখন গামছাটা খুঁজছে।—কাঁহাসে লাস এল?

—মধুপুরসে। সিপাহী পিঁড়ি টেনে বসল উঠোনে।

গোমানী কাঁথার ভিতর থেকে গামছা টেনে বের করল। —খুনের লাস না গলায় দড়ির লাস। মাথায় কাপড় দিয়ে ফেটি বাঁধার সময় এই ধরনের একটা প্রশ্ন করল সিপাহীকে।

সিপাহী দেখে গোমানীর শরীরের সব জড়তা ভেঙ্গে যাচ্ছে।

—নেহি পানীসে ডুবল যোয়ান মেয়ে।

—পেটে বাচ্চা আছে জরুর।

—সে বাত ত গোমানী তুম্ জানবে।

গোমানী গামছা কোমরে বেঁধে উঠোনে নামল। চালাঘরে দুটো মোরগ ডাকছে। এক দল কাক হল্লা করছে পুরোনো অশ্বত্থ গাছে। চটান ছাড়িয়ে একটা দেওয়াল অতিক্রম করে বড় বাড়ীর দোতলায় রেডিও বাজছে। উড়ো জাহাজের শব্দ আকাশে। ঝাড়ো ডোমের বৌ চেলাকাঠ ভাঙ্গছে ওর মেজ বেটার পিঠে। গরুর গাড়ীগুলো চটান থেকে নেমে যাচ্ছে। ঘাটোয়ারী-বাবু চেয়ারে বসে কাগজ পড়ছেন। ঘাটে মড়া আসেনি। কাউন্টারের সামনে কোনো লোক দাঁড়িয়ে নেই। আকন্দ গাছের ডাল বেয়ে রোদ উঠে যাচ্ছে। গোমানী চটান ছেড়ে শিব মন্দিরের পথে পড়ল।

গোমানীকে চলে যেতে দেখে নেলী ডাকল—বাপ!

—ফের পিছু ডাকলি!

—ঘরে কিছু লেই বাপ! ও বেলায় খাবি কি? তু হাসপাতালসে জলদি আওগে ত।

—আওগে। আওগে। খাব, ঠিক খেয়ে লিব। লেকিন তু কোথাও যাসনা। দিনকাল বহুত খারাপ। গোমানী শিব মন্দিরের পথ ছাড়িয়ে বড় রাস্তায় পড়ল।

নেলী চলতে থাকল। সঙ্গে গঙ্গা যমুনা চলছে। চটানে নেলীকে ধমক দেওয়ার মত কেউ নেই। সে এখন একটু ঘুরবে ফিরবে। সে এখন পাশাপাশি সব চালা ঘরগুলোতে উঁকি দেবে। ওদের রান্নার কথা শুনবে, ঘরে ঘরে শুধাবে ওরা বিকেলে কি খাবে। সে-সব শুনে সে বিষণ্ণ হবে। পেটের যন্ত্রণাটা তখন আরও বাড়বে।

নিজের কথা ভাববার সময় গঙ্গা যমুনার কথা মনে হল। গঙ্গা যমুনাকে এখনো পর্যন্ত কিছু খাওয়াতে পারল না। গঙ্গা যমুনা

পায়ে পায়ে ঘুরছে, খেতে চাইছে। আজ এখনও ঘাটে মড়া আসেনি। রাতের বুড়ো মানুষটার নাভিটা নিশ্চয়ই রাতে কচ্ছপেরা শেষ করে দিয়েছে। গঙ্গা যমুনা বিরক্ত করছে ত করছেই। নেলী অগত্যা বলল, লে—লে—খেয়ে লে। হামার গতরটা খেয়ে লে। এই শুনে কুকুর দুটো কি বুঝে ছুটতে থাকল। নেলীও ছুটল কুকুর দুটোর পিছনে। গঙ্গার পার ধরে ওরা ছুটছে। নেলীর ইচ্ছা, এ-সময় গেরু আসুক, ওরা একসঙ্গে ঘাটবন্দরে উঠুক। তারপর আরও দূরে আরও দূরে। সেখানে বুড়ো মানুষটার জন্য আতপ চাউল সিদ্ধ হচ্ছে, কিছু তন্ত্রমন্ত্র হচ্ছে। তারপর ডেলা ডেলা ভাতগুলোতে কিছু ভালো তিল মিলিয়ে বুড়ো মানুষটার বেটারা গঙ্গার জলে ভাসাবে। নেলী সব খবর রাখে। নেলী সেই উদ্দেশ্যেই আপাতত হাঁটতে থাকল।

নেলী লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছে। কুকুর দুটোও লাফাচ্ছে। নেলীর চুল উড়ল উত্তরে হাওয়ায়। কাপড় উড়ল। এখানে ঝোপ, ঝাড়, জঙ্গল। এখানে উঁচুনীচু মাটি। নেলী লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছে। কতবার ঘুরে গেছে এ-অঞ্চলে নেলী। কতবার লখি এল, টুনুয়া এল। গেরু, গঙ্গা, যমুনা এল। কতবার সে একা এসেছে। কুকুর দুটো ওকে পাহারা দিয়েছে। জল কলের সেই অদ্ভুত শব্দটা সে কতবার শুনল। কতবার শুনেছে। আজও নেলী কান পেতে শুনল। মাটি এখানে কুমীরের পিঠের মত উঁচু। ঝোপ-ঝাড়ে সবুজ কাঁটার জঙ্গল দুধারে, দু মানুষ সমান উঁচু বনফুলের ঝোপ। দু একটা গিরগিটি লাফিয়ে পড়ল ওদের উপর। দু একজন মানুষ সহর থেকে ফিরছে। আকাশে চিল উড়ছে—দূরে দূরে আসশ্যাওড়ার জঙ্গল। সোনা ব্যাঙের ঢিবি মাঝে মাঝে। দুটো একটা খরগোশের গর্ত—গঙ্গা যমুনা নাক দিয়ে গর্তগুলো শুঁকছে। নেলী পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল। সে জানে বুড়ো মানুষের বেটারা ওই পথে গঙ্গায় নেমে আসবে।

হাতে ওদের নতুন মালসা থাকবে। মালসায় আতপ চালের ভাতগুলো ডেলা ডেলা হয়ে থাকবে। বুনো ঘাস থাকবে উপরে। নেলী এখানে দাঁড়িয়ে ঝোপ-জঙ্গল অতিক্রম করে দূরে পুরোনো বড় বাড়ীটা দেখতে পাচ্ছে—বুড়ো মানুষটা গত রাতে এ-বাড়ী থেকেই ঘাটে গেছে। যমুনাকে দিয়ে বুড়োর খাটো কাপড়টা সে রাতে চুরি করিয়েছে। দুখিয়া বলছে, নেলী চোর। বলছে, নেলী বেইমানী কিয়া। হাম জরুর সালিসী মানে, —তু বলিছে, হামে শুন লিছে। চামার! চামার! নেলী এই পথের উপর দাঁড়িয়ে দুখিয়াকে গাল দিতে থাকল। ··ঘাটের ডাক লিয়েছিস বুলে মাথা কিনে লিয়েছিস! একটা খাটো কাপড় লিয়েছি, ওয়ার লাগি জান গেছে। হাম সালিসী মানে! সালিসী! কে শুনে লিবে রে তুর সালিসী। কোন শুনে লিবে। হামি বুলবেনা কিছু তু ভেবে লিছিস! নেমকহারাম! বেইমান! নেলী এখন সেই কাপড়টাই পরে আছে বলে ওর যেন যন্ত্রণা হতে থাকল এবং গলায় গরল উঠতে থাকল। কুকুর দুটো ওর পায়ে পায়ে ঘুরছে। সে এ-সময় কুকুর দুটোকে সালিশ দিল—শুনে লে দুখিয়া কি বাত বুলছে। হামি চোর, তু চোর—এ বাত বুলছে। তুরা হামার সালিশী থাকল। নেলী এবার কুকুর দুটোকে হাত জড়িয়ে আদর করল। জলের নীচে দেখা গেরুর শরীরটা ওর মনে পড়ল।—গেরু, তু বহুত আচ্ছা আছে। তু একদফে বড় হয়ে ঘাটের ডাক লিবি। ঘাটের কাঁথা-তোষক সব লিবি। দুখিয়ার মাথায় লাঠি ভাঙ্গবি। হামি বহুত খুশী হবে। তু আওর হামি, হামি আওর তু। নেলী এই নিঃসঙ্গ পথে দাঁড়িয়ে অভুক্ত শরীরে স্বপ্ন দেখল। এখন চিলের ছায়াটা জলের উপর ভাসছে। জলের উপর নিজের ছায়া দেখল, গেরুর ছায়া এবং বুঝল নেলী এখন বড় হয়েছে। হঠাৎ এই ভর দুপুরে শরীরটার দিকে চেয়ে ওর কেমন ভয়

ভয় করল। ও ছুটতে থাকল। ও ছুটছে ফের। হঠাৎ কি এক রহস্যকে ধরতে পেরে নেলী ভয়ে ভয়ে চটানে উঠে এল। চটানে উঠেই শুনল শিব মন্দিরের পথে হরিধ্বনি দিচ্ছে। ঘাটে মড়া নামানো হচ্ছে। নেলী বুঝতে পারছে মড়াটা বড় ঘরের। বাবু মানুষদের কাঁধে খাটুলী। নেলী এই বাবু মানুষদের গঙ্গার পারে কতদিন দেখেছে। কতদিন সে দিদিমণিদের আল্লা হয়ে পথ করে দিয়েছে। কতদিন এই সব বাবু ভাইদের ধমক খেয়ে চটানে ফিরে এসেছে। ওরা এখন সিঁড়ি ধরে নেমে ঘাটের দিকে যাচ্ছে। তুখিয়া ছুটছে চটান থেকে।—আহা রে মরদ হামার! ছুটছে ত ছুটছেই। তুর বৌটা কুথারে? বৌটাকে সাথে লিয়ে লে! একা ছুটলে আছাড় পড়বি। নেলী রসিকতা করতে চাইল তুখিয়াকে। এখন চটানের মাগী মরদরা অফিসের বারান্দায় সব জমা হয়েছে। ওরা এখন কাঠ বইবে ঘাটে। ঘাটোয়ারীবাবু কাউন্টারে বসে পত্রিকা পড়ছেন। চোখ তুলছেন না অথচ বুঝতে পারনেছ কোথায় কি হচ্ছে। তিনি জানেন তুখিয়া ঘাটে ছুটে গেছে। মড়ার কাঁথা-কাপড় আগলাচ্ছে। মড়ার নাকে কানে হাতে গহনা আছে কিনা দেখছে। তিনি জানেন হরিতকী আজ কাঠ বইতে আসবে না, সোনাচাঁদ আসবেনা। কৈলাশ আসবেনা। গোমানী চটানে থাকলে আসত। নেলী আসবে, গেরু, লখি, টুনুয়া, ঝাড়ো ডোমের সব বেটারা, পারলে বৌটা পর্যন্ত। মণ পিছু দু আনা পাবে—চার মণে আট আনা। আনা আনা ভাগ বসাবে—না পেলে মার ধোর করবে। চটানে নাচন কোঁদন সুরু হবে ফের।

এ-ছাড়া তিনি কাউন্টারে মুখ না তুলে বুঝতে পারেন কে সেখানে দাঁড়াল। কার ছায়া পড়ল। তিনি সব বুঝতে পারেন।

তিনি প্রশ্ন করলেন, কোত্থেকে মড়া এল? কার মড়া?

—মড়া সেন বাবুদের।

—কি হয়ে মরল ?।

—দু দিনের জ্বরে।

—বেশ, বেশ। কি নাম ? মেয়েছেলে না বেটাছেলে ?

ঘাটোয়ারীবাবু এবার মুখ তুললেন। রেজিস্ট্রিখাতা বের করে লাল কালিতে প্রথমে নখে নিব ঘষলেন। রেজিস্ট্রিখাতা থেকে কয়েকটা নাম উচ্চারণ করলেন। ওটা ওঁর স্বভাব। তিনি বললেন, কৃষ্ণ পক্ষে গেল, যশোদানন্দন, আহা যশোদানন্দন ! তুমি তবে মরেছ। বেশ করেছ। কাজের কাজ করেছ। হীরামতি গেল, নিতাই পাঠক গেল—এবারের নামটি কি যেন বললেন ?

—সুচিত্রা গুপ্তা।

—বেশ, বেশ সুচিত্রা গুপ্তা। বয়স ?

—আঠারো।

—কাঁচা গেল দেখছি। কি হয়ে মরল যেন ?

—দু দিনের জ্বরে।

—তা হলে দু দিনের জ্বরে লোক এখনও মরছে। বেশ, বেশ। হরি ওঁ।

ঘাটোয়ারীবাবু রসিদ লেখার আগে বললেন, হাসপাতাল থেকে এল ?

—না।

—ডেথ-সার্টিফিকেট থাকলে দেখাতে পারতেন।

—নেই।

—তবে থাক। বেশ, বেশ। পরম ব্রহ্ম নারায়ণ। রসিদটা কাউন্টারে ফেলে দিয়ে এই সব কথাগুলো বললেন।

তারপর ঘাটোয়ারীবাবু বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। শীতের নদী বালিয়ারিতে নেমে গেছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে শ্মশান দেখা যাচ্ছে না। শ্মশান বালিয়ারিতে নেমে গেছে, সুতরাং শ্মশান দেখতে হলে ঘাটে নামতে হবে। ধারে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। ঘাটোয়ারীবাবু কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। ঘাট থেকে মানুষের
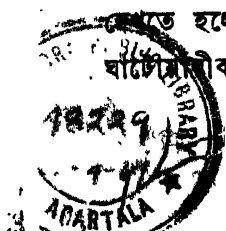
কান্না ভেসে আসছে। তিনি তাড়াতাড়ি ইচ্ছা করেই যেন ডাকলেন এ গেরু, তোর বাপকে ডাক। কৈলাশকে কাঠ দিতে বল! তোরা ঘাটে কাঠ দিয়ে আয়। মড়াটা তাড়াতাড়ি জ্বলে যাক।

সেই সময় নেলী শুনতে পেল মড়াটার নাকে কানে গহনা আছে। গলায় গহনা আছে। ছুখিয়া লাঠি নিয়ে পাহারা দিচ্ছে। মংলী চিতা সাজানোর আট আনা পয়সা নিয়ে বচসা করছে। চিতা সাজানোর কাজ হরিতকীর। হরিতকী না থাকলে মংলী। মংলী বচসা করছে, আওর জায়দা লাগবে।

নেলী চটান থেকে ঘাটে গিয়ে দাঁড়াল। এখানে অনেক মানুষের ভিড়। চার পাশের লোকগুলো খুব কাঁদছে। নেলী ভিড়ের ভিতর গলাটা বাড়িয়ে দিল। মড়াটা দেখল। ওর হাতের কানের গহনা দেখল। গলার গহনা দেখল। গহনা সহ পুড়িয়ে দেওয়া হবে বলে ছুখিয়া পাহারায় আছে; কয়লা ধুয়ে কেউ গহনা চুরি করে না নেয়, অথবা ওর নসিবে কেউ যেন ভাগ না বসায়। নেলী মনে মনে বাপের উপর রাগ করল। বাপ এক দফে ডাক নিলনা ঘাটের। নসিব খুলার চেষ্টা কভি না করল। নেলীর বলতে ইচ্ছে হল, তু বুড়বক আছে বাপ। ছুখিয়ার নসিব দেখে নেলীর পেটের যন্ত্রণা আরও বাড়ছে।

যেমন বেঁটেখাটো ছুখিয়া, তেমন মংলী। মরদ মাগী সমান— কথায়, বচসায়, নাচনে কোঁদনে সব কিছুতে। নেলী হাতের কানের গহনা দেখে ছুখিয়া-মংলীকে দেখল চেয়ে। নেলী মংলীকে দেখে গাল দিল। কি লুকঝুক লতুন চাদরের লাগি! মংলীর কদর্য মুখটা নেলীকে যেন ঘাটে বিব্রত করে মারছে। বিরক্ত করে মারছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে বদলা নেওয়ার ইচ্ছায় গঙ্গা যমুনাকে লেলিয়ে দেবার এক তীব্র হিংসায় জ্বলে পুড়ে সে খাক হতে থাকল। মংলীর চোখ তুলে নেওয়ার জন্য গঙ্গা যমুনাকে ওর একমাত্র ভরসা। —ওয়ার মরদ বুলে কি না হামি চোর! হামি চোর আছে। চোর আছে ত ঠিক আছে। চোর

যখন আছে তখন ঘাটের গহনা ভি চুরি করে লিব। হেঁ লিব। জরুর লিব। নেলী মনে মনে এই সব বলে যেন শপথ করল। —লিব। লিব। লিব। সে ছুটতে চাইল ঘাট থেকে। নেলীর এ-ঘাট এখন ভাল লাগছে না। চটান ভাল লাগছে না। শ্মশানটার চ ার পাশে ঘুরে ঘুরে সে অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে। নিজের বাপের কথা মনে হল। বাপ হয়ত এখন হাসপাতালে লাসটার পেট চিরছে। নেলী ঘুরে ঘুরে উপরে উঠে এল। উপরে কাঠ বইতে হবে। কাঠ ফেলতে হবে ঘাটে। সুতরাং নেলী চটানে উঠে গেল। চটানে যাকে দেখল বলল—ত্বখিয়ার নসিব খুলে গেল। মংলীর ভি নসিব। বহুত সোনাদানা ঘাটে এসেছে। কয়লা ধুয়ে ত্বখিয়া সব গহনা লিয়ে লিবে। ডোমের কোনো বেটা বেটিকে ত্বখিয়া ঘাটে কিছু ঢুঁড়তে দেবেনা।

নেলী চটানে উঠে কয়েকটা কাঠ নিল কাঁধে। হরিতকীর দরজার পাশ দিয়ে ঘাটে নামাব সময় ডাকল—পিসি!

হরিতকী দরজা থেকে মুখ বার করে জবাব দিল—বুল।

—তু ঘাটে যাবিনা পিসি? বহুত পয়সায়ালা ঘরের যোয়ান বেটি ঘাটে এসেছে। বেটি কি খুবসুরৎ, তু যাবিনে ঘাটে?

—না যাব না।

—ক্যানে যাবিনা তু পিসি?

—শরীর দিচ্ছে না। ত্বখিয়ার জবরদস্তি হামার ভাল লাগেনা। ওয়ার ঘাটে হামি থুথু ফেলি। ভোরে তু ত চোর বনে গেলি। ও নালিশ দিল গোমানীকে, তু চোর। তু ওয়ার কাঁথা-কাপড় চুরি করে নিচ্ছিস।

এইসব শুনে নেলীর কোমরটা ত্বলে উঠতে শুরু করেছে। মংলীকে বিদ্রূপ করার জন্য সাপের মত জিভটা লকলকিয়ে উঠল। —মংলীটা বুলে কি পিসি! বুলে যা ঘাট অফিসে যা, ঘাটোয়ারী-বাবুকে বুলে ভাল ভাল কাঠ লে। বিছানার চাদরটার লাগি কি লুকঝুক! লতুন চাদর, আহা মাটার কি সর্বনাশ পিসি! মংলী

বুলছে চাদর, তোষক, বালিসে আগুন ধরাতে দেবে না। হাতের কানের গহনা ভি লেবে। অত ভাল লয় পিসি। তু কি বলিস্?

হরিতকী জবাব দিলনা বলে ফের বলল—পিসি!

—বুল।

—একজোড়া গহনা হলে হামি কত্তদিন খেয়ে লিব দেখে লিস। বাপকে কত বুললাম তু ঘাটের ডাক লে এক দফে। দেখে লিবি তখন কত সুখ হামাদের। কত গহনা! এক দফে যদি লিত পিসি!

—তুর বাপ পচাই খাবে না ও কাম করবে? তুরোজ আগে দেখলাম মাচানের নীচে বসে ওত ইসপিরিট খাচ্ছে। হাসপাতালসে চুরি করে ইসপিরিট লিচ্ছে। তুর বাপ মরবে। জলদি ও পার পাবে দেখে লিবি। খাবেনা, দাবেনা—পেট ওয়ার জরুর পচবে।

খড়ম পায়ে তখন ঘাটোয়ারীবাবু ঢুকছেন চটানে। খড়মের শব্দ শোনা যাচ্ছে। হরিতকী তাড়াতাড়ি কাপড় সামলে বসল। বাচ্চাটাকে কোলে নিল। আদর করল। নেলী তখন চটান থেকে সরে পড়ার চেষ্টা করছে। ঘাটোয়ারীবাবু ওকে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে বকবে। কাজে ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে এ-কথা বলবে। কিন্তু নেলী দু কদম সরে না যেতেই তিনি ডাকলেন—কাজ খুব ফাঁকি দিচ্ছিসরে।

—না বাবু। বাবু, ওরা গহনা পুড়িয়ে দেবে না লিয়ে যাবে? নেলীর ইচ্ছা গহনা ওরা নিয়ে যাক। গহনা না পুড়িয়ে শুধু মানুষটা পুড়িয়ে দিক। দুখিয়ার নসিবে আগুন লাগুক।

ঘাটোয়ারীবাবু ধমক দিলেন নেলীকে—তার আমি কি জানিরে ডোমের মেয়ে! আমি কি মড়ার মালিক! কি কথা বলেগো মেয়েটা! কাজে যা, কাজে যা। যা করছিস তাই কর। গহনা গহনা করিস না। গহনা দিয়ে কিছু হয় না। তারপর ঘাটোয়ারীবাবু চারিদিকে চাইলেন—তখন নেলী গঙ্গায় নেমে যাচ্ছে। কাঠ সাজাচ্ছে ঝাড়ো। সোনাচাঁদ অফিস থেকে

ফিরে এসেছে। ঝাড়ো ডোমের বৌ বাঁশের পাতি তুলছে বঁটিতে। কৈলাশের শেষ বৌটা মানুষের কঙ্কাল সিদ্ধ করছে সোডার জলে। ঘাটোয়ারীবাবু এইসব দেখতে দেখতে হরিতকীর দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। দরজার উপর ঝুঁকে বললেন, বাচ্চাটাকে দেখা। একবার দেখি। বাচ্চাটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, শেষ পর্যন্ত শ্মশানেই বাচ্ছা বিয়োলি! বাচ্ছাটা বাঁচবে অনেকদিন।

ঘাটোয়ারীবাবুর কথা শুনে হরিতকীর চোখ দুটো ভার হয়ে উঠল। ওঁর বসার জন্যে পিঁড়ি বের করল, পেতে দিল। তিনি বসলেন। হরিতকী বলল, কি আর করব বাবু। ঘাটে কাঠ দিতে গিয়ে গিল রাতে বেটী হামার হয়ে গেল। হরিতকী বাবুর সামনে ওকে শুইয়ে দিল। পা নেড়ে খেলছে। রোদের উত্তাপে আর কাঁদছে না। চোখ দুটো ঠিক মেলতে পারছে না। বুড়ো বয়সের এই বাচ্চা হরিতকীর খুব দরদের। হরিতকী খুব খুশী হয়েছে। হরিতকী অপলক চেয়ে থাকল।

ঘাটোয়ারীবাবু ভাবলেন চতুরা বেঁচে থাকলে দু হাঁড়ি পচাই গিলত আজ। খুশীতে ডগমগ করত। হরিতকীর দিকে চেয়ে বললেন, কাল কাঠ না বইলেই পারতিস। চিতা না সাজালেই হত। তারপর তিনি ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, যাক সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা। এবার তাহলে তুইও সং সাজলি হরিতকী! তিনি এই বলে উঠে পড়লেন।

হরিতকী ডাকল—বাবু—

—কিছু বলবি আমাকে?

হরিতকীর চোখ দুটো লজ্জায় ভারী হয়ে উঠছে। তবু সে না বলে যেন থাকতে পারল না— বাবু বাচ্চাটা কেমন দেখলি?

ঘাটোয়ারীবাবু নিস্পৃহ জবাব দিলেন—ভাল।

—কার মত হবে বুলত?

—তোর মত।

—না তোর মত হবে দেখে লিস। হরিতকী ঘাটোয়ারীবাবুর দিকে চেয়ে হাসল। তিনি কিন্তু হাসলেন না। তিনি হরিতকীর মুখ দেখলেন। চোখ, মুখ, শরীর, দেখলেন। হরিতকীর চোখে এক ধরনের ইচ্ছার প্রকাশ—যা ঘাটোয়ারীবাবুকে কিছু কিছু ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। যেন বলতে চাইছে—আ যা বাবু কাঁহা ভি চল যাই। যেন বলতে চায়—এ-চটান ছোড় দে।

তিনি মুখের ভাবটুকু উদাস করতে চাইলেন। অথবা কেমন অসহায় মনে হল ঘাটোয়ারীবাবুকে। তিনি বললেন, আমার মত হলে তুই খুশী হবি, কিন্তু লোকে হবে না। চতুরার মত হলেই ভাল হয়। লোকে চতুরার ছা বলেই জানুক। চতুরার মতই ও দেখতে হোক। সংসারের সং সাজতে আমার ইচ্ছে নেই।

হরিতকীর চোখেমুখে গরল উঠতে চাইল!—সংসারের সং সাজতে তুকে বুলেছি! আর বুলব না। পেটটাকে লিয়ে এতদিন ভয় ছিল। পেটটা খালাস হয়ে হামাকে খালাস দিল। হামাকে লিয়ে তোকে আর কোথাও যেতে হোবে না। কোথাও আর পালাতে বুলব না। হামার নসিব লিয়ে হামি বেটি কা সাথ এ-চটানেই পড়ে থাকবে। লেকিন তুকে বুলবেনা—আ যা বাবু—কাঁহা ভি চল যাই। কভি বুলবেনা এ-চটান ছোড় দে।

যে রোদটা অশ্বত্থ গাছের ডাল ধরে নীচে নেমেছিল সেই রোদ এখন অশ্বত্থ গাছের ডাল বেয়ে উপরে উঠছে। ঝাড়োডোম দাওয়ায় বসে তামাক টানছে। হরিতকী বাচ্চা দিয়েছে বলে ঝাড়ো ডোমের ঘর থেকে ঘাটোয়ারীবাবুর খাবার গেছে।

অফিস ঘরের কোণায় টিনের থালায় কিছু ভাত, ডাল, শাক-সবজি। ঘাটোয়ারীবাবু কিছুক্ষণ গীতা পাঠ করেন এই সময়, জানালায় বসে কিছু সময় মা গঙ্গা দর্শন করেন। তারপর তিনি কিছু আহার করেন। এই সময় ডোমেদের ছোট ছোট ছেলেরা অফিস ঘরটার চার পাশে ঘুর ঘুর করবে—কখন তিনি ডাকবেন সেই আশায় অপেক্ষা করবে—যেদিন ডাকবেন না জানালা দিয়ে ওরা উঁকি মারবে অথবা হাত পাতবে। তিনি বলবেন—এখন হবে না। যা।

কৈলাশ ওর ঘরে শুয়ে আছে। মাচানে ঠ্যাং ছড়িয়ে ঘুমুচ্ছে। ওর শেষ পক্ষের বৌ ঠাণ্ডাভাত খাচ্ছে। সঙ্গে দুটো কাঁচা পেঁয়াজ নিয়েছে, দুটো কাঁচা লঙ্কা নিয়েছে। পিঠে রোদ নিয়ে খাচ্ছে। সে পিঠ চুলকাল। চোখ কোঁচকাল। কাঁচা লঙ্কার জন্য জল পড়ছে চোখ থেকে। নেলী ঘরের ভিতর থেকে বেড়ার ফাঁক দিয়ে সব দেখছে। সেও শুয়ে আছে মাচানে। শরীরে কাঁথা-কাপড় টেনে উপুড় হয়ে দুটো হাতের উপর চিবুক রেখে গেরুর সৎমার খাওয়া দেখছে। বেড়ার ফাঁক দিয়ে গঙ্গা যমুনাও নেলীর মত চোখ মুখ নিয়ে বসে আছে। নেলীর কষ্ট হতে থাকল। নিজে খেতে পারল না, গঙ্গা যমুনাকে খেতে দিতে পারল না। এ সময় ঘাটোয়ারীবাবু খেতে বসবেন। সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল এবং ধীরে ধীরে অফিস ঘরের দিকে চলতে থাকল। জানালার পাশে এবং সিঁড়ির উপর সে দেখল লখি, টুনুয়ার ছোট দুটো ভাই, ঝাড়ো ডোমের ছোট দুটো বেটি বসে আছে। নেলীও ওদের পাশে বসল। গঙ্গা যমুনাও বসল। পিঁড়ির উপর বসে ওরা সকলে খাওয়ার গল্প করল।

আজ কিন্তু ঘাটোয়ারীবাবু কাউকে ডেকে ভাতের দলা দিলেন না। তিনি নিজেই সবটুকু চেটেপুটে খেয়ে নিলেন। ঝাড়োর বউ ভাত যতটা পেয়েছে কম দিয়েছে। জল খাওয়ার

সময় তিনি হাসলেন। ভাবলেন, পেটে কিল মেরে কথা বের করে শুনেছি, কিন্তু ঝাড়োর বৌ যে দেখছি পেটে কিল মেরে ভাত বের করবে। ঘরের ভিতর কুলকুচা করার সময় তিনি বললেন - তোরা যা। দাঁড়িয়ে থাকিস না। আজ আমারই পেট ভরল না। তোরা যা। অথচ তিনি জল খেয়ে ঢেকুর তোলার চেষ্টা করলেন।

নেলীর একবার ইচ্ছা হল ফের গঙ্গায় গিয়ে নামে। ফের সেই হাতের গলার গহনা দেখে। ফের মংলীর চোখটা গঙ্গা যমুনাকে দিয়ে উপড়ে আনে। কিংবা ইচ্ছা হচ্ছে হাতের গলার গহনা আগুনে কেমন গলছে সেই দেখার। সোনা গলে গলে যেন ছাই হয়ে যায়। কিন্তু ছাই হবেনা ভেবেই ওর যত দুঃখ এখন। সেজন্য গঙ্গায় নামাতে পর্যন্ত ইচ্ছা হল না। রাগে, দুঃখে, ভয়ে এবং পেটের যন্ত্রণায় দুটো চোখ ক্রমশ বসে যাচ্ছে। ক্রমশ নেলী দুর্বল হয়ে পড়ছে। শরীরটা নিয়ে আর চটানে ঘুরতে ফিরতে পারছে না। নেলী সেজন্য মাচানেই ফিরে এল। মাচানে শুয়ে শুয়ে বাপের জন্য অপেক্ষা করছে। বাপ যদি ধারদেনা করে কিছু চাল ডাল নিয়ে আসে, যদি বাপ রাতের মত কিছু ব্যবস্থা করে ফেরে এই ভে[illegible] দুর্বল শরীর নিয়ে কোনোরকমে মাচানের কাছে এল। মালসায় কিছু জল ঢালল এবং ঢক ঢক করে এক মালসা জল খেল। তারপর মাচানে উঠে বালিস টেনে কাঁথা-কাপড়ের ভিতর শরীর গলিয়ে দিল। কাঁথার নীচে নেলী এখন কিছু যেন ভাবছে অথবা যেন ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করছে।

বেলা পড়ে আসছে। শীতের বেলা। ঝাউ গাছের ও পাশে সূর্য ক্রমশ বাঁশবনে অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে। ঘাটে আগুন উঠছেনা। চিতার আগুন যত নিভে আসছে দুখিয়া তত বেশী উত্তেজনা অনুভব করছে। মংলী ঘাট থেকে ফিরছে ওর মাথায় নতুন তোষক চাদর। হরিতকীর ঘরের

দিয়ে একটু ঘুরেই সে গেল। যেন সকলকে দেখিয়ে যাচ্ছে। নেলী ইচ্ছা করেই কাঁথার নীচে মুখ লুকিয়ে ফেলল। কাঁথা কাপড়ের ভিতর থেকে উঁকি মেরে তোষক চাদর দেখল না। ঝিম মেরে কাঁথা-কাপড়ের নীচে পড়ে থাকল।

আর এ-অসময়ই লাফাতে লাফাতে গেরু এল। গলায় কালো কারে তাবিজ। পুরুষ্টু মরদের মত গজাতে আরম্ভ করেছে গোঁফ। কালো গেঞ্জি গায়ে—হাতে বল্লম—ওকে দুর্ধর্ষ মনে হচ্ছিল। বল্লমটা কাঁথা-কাপড়ের উপরেই যেন ছুঁড়ে দেবে। নেলীর চুল মাচানের পাশে ঝুলছে। গেরু বুঝতে পারছে নেলী মাচানে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। নেলীকে সে ডাকল—এই নেলী, —নে—লী, নেলী—বা তু ত আচ্ছা আছে। অবেলায় এক ঘুম দিয়ে লিচ্ছিস।

নেলী কাঁথা-কাপড় ছেড়ে উঠল না, অথবা ওঠার ইচ্ছা প্রকাশ করলনা, কিংবা ইচ্ছা থাকলেও উঠতে পারল না, শুয়ে থাকার ইচ্ছা কেবল—ঘুম ঘুম ভাব শরীরে। অথচ ঘুম আসছেনা। রাজ্যের চিন্তা এসে নেলীকে জড়িয়ে ধরেছে—গেরু কবে চটানে সত্যি মরদ হয়ে উঠবে, গেরু কবে বুলবে, আ যা নেলী, কাঁহা ভি চলে যাই, কবে অন্য চটানে উঠে গিয়ে ওরা ঘর বাঁধতে পারবে। দু হাতের উপর চিবুক রেখে গেরুর দিকে নেলী শুধু চেয়ে থাকল। কাঁথা-কাপড় ছেড়ে কিছুতেই উঠছে না কিংবা কথার জবাব দিচ্ছে না।

গেরু নেলীকে বলল, হামি ফরাসডাঙ্গায় যাচ্ছি। বাপ হামাকে আজ থেকে লিয়ে লিল।

—তুর বাপ হামাকে লিবে? তবে হামিও সঙ্গে যাই।

গেরু প্রচণ্ড ভাবে হেসে উঠল। বল্লমটা শক্ত করে ধরল। কোমর থেকে গামছা খুলে মুখ মুছে বলল, কি যে বুলছিস তু নেলী। তু যাবি ফরাসডাঙ্গায়। তু যাবি মুর্দার কঙ্কাল তুলতে! তু যে ডরে মরে ভূত হো যাবিরে নেলী, ভূত হো যাবি।

নেলীর গলার স্বরটা সহজ অথচ সুরেলা হল—হামি বুঝি পারে না ভাবছিস!

গেরু এখন কথায় ঢিলে ঢালা হচ্ছে—কেইসে তু পারে? এ তো কাঠ বইয়ে দেয়ার কাজ না আছে। এ বহুত তন্তর মন্তরের কাজ আছে, বহুত তন্তর মন্তর লাগে।

নেলী গেরুর মুখের কাছে হাতটা ঘুরিয়ে আনল। হে রে রাখ তোর তন্তর মন্তর। হাম ভি বহুত তন্তর মন্তর জানে।

—লেকিন তাবিজ ওবিজ লাগে নেলী। বাপ মেরে তিন তিনটা তাবিজ দিল। পুনঃপদের মাতুলি, মহাশক্তি কবচ বাণ, আউর মহাশক্তি কোমর বাণ। এ ঝাড়ফুক লয়, যাতুমন্তর লয় —এ-আছে জড়িবুটির কারবার। দব্য-গুণ। ডান পুকুরে টান মারে তোধক করে, পীর পরীতে নজর দেয়, বাণ মারে, এ-মাতুলি দেহে লিলে আসান পাবে দেহ। এ-তু কাঁহাসে লিবি আর কাঁহাসে দিবি।

গেরু কথাগুলো নেচে নেচে বলল—অনেকটা বাপ কৈলাশের মত। কৈলাশ যেমন করে কোর্ট কাচারীর ময়দানে একদা হেকিমী দানরীর ব্যবসার সময় সকল মক্কেলদের তাবিজের গুণাগুণ ব্যাখ্যা করত, তেমনি গেরু আজ নেলীকে তাবিজের দ্রব্যগুণ ব্যাখ্যা করল।

নেলী এবার কাঁথা কাপড় ছেড়ে উঠে বসল মাচানে। দু হাতের উপর ভর করে বসল। চুলগুলো মুখের উপর এসে পড়েছে। শরীরটা যেন ঝুঁকছে মাচানের বাইরে। যেন এখুনি টলে পড়বে শরীরটা। নেলী তবু বলল, হামার কোনো জড়িবুটি লাগেনা গেরু। লেকিন হামি মেয়ে মানুষ লয় ত হাম ভি যেতরে মুর্দার কঙ্কাল তুলতে। চটানে ভুখা থেকে হামি নেহি মরেগে। নেলী এ-সময় মুখটা ক্রমশ নীচের দিকে নুইয়ে দিচ্ছে।

—তু ভুখা আছে নেলী! গেরু বল্লমটা নীচে রাখল। পাশাপাশি বসল সে। কিছুক্ষণ সে চুপ করে বসে থাকল।

নেলীকে সে এ-চটানে আরো অনেকদিন ভুখা থাকতে দেখেছে, কিন্তু আজ যেন অন্য ভাবে নেলীর উপোসী শরীরটা দেখল। নেলী ভুখা আছে চটানে এই ভেবে ওর খুব কষ্ট হতে থাকল। অথচ নেলীকে কিছু বলতে পারছে না এ-সময়ে। অন্যদিনের মত নেলীকে জড়িয়ে ধরে কথা বলতে পারল না। কিংবা জড়িয়ে ধরতে ভয় হচ্ছে। সে সংশয়ের চোখে চারিদিকে একবার চেয়ে সহসা নেলীর মুখটা তুলে ধরতেই দেখল, নেলী কাঁদছে। ভুখা থেকে নেলী আজ চটানে গেরুর সামনে কেঁদে দিল। নেলী ত ভুখা আছে! পুনরাবৃত্তি করল গেরু। তারপর বল্লমটা তুলে চলে যাওয়ার সময় বলল, হামার কাছে একটা পয়সা ভি নেই। থাকলে তুকে দিয়ে দিতাম। সাত সতের খেলে লখির কাছে সব পয়সা কটা হেরে গেছি।

গেরুর এসব কথা শুনে নেলী বিরক্তিতে ফেটে পড়ল। মান মনে বলল, হেরে গেরু তু হামার বুঝি বাপ। তু পয়সা দিবি, সে পয়সায় হামি খেয়ে লিব! এই সব ভেবে নেলীর নিজের মনেই সরম এল। গেরু ওর কে! গেরু ওর পাশে একটু বসতে পারলনা! গেরু এ-সময় পয়সা নেই বলে, অথবা নেলী আরও কষ্টের কথা শুনাবে বলে চলে গেল! ছিঃ মরণ হামার! তু হামার কে! তু হামার বাপ আছে না বেটা আছে। তু হামার কোন আছে, তুর কাছে কেন্দে ভিখ লিব!

নেলী ফের শুয়ে পড়ল। এই ঘরে শুয়ে পুরোনো অশ্বথ ডালে কাকের শব্দ পেল। সে বুঝতে পারছে চোখ বুজে—সন্ধ্যা হতে দেরী নেই। এই সময়ে সব কাকেরা এই পুরোনো অশ্বত্থে ফিরে আসে। সে চোখ না খুলে বসুন্ধরার সব সুখ দুঃখকে বোঝবার চেষ্টা করল। তখন এল গেরু। সন্তর্পণে ফিরে এল। মরদের মত সে ওর পাশে দাঁড়াল। বলল, দুচারমাস তু সবুর কর। ফরাসডাঙ্গার কায়দা কানুন শিখেলি, তারপর তু আর হামি অন্য চটানে উঠে যাব। হয় কাটোয়ায় লয়তো নবাবগঞ্জে।

তু আর তখন ভুখা থাকবিনে।

কাঁথাকাপড়ের নীচে থেকে নেলী জবাব দিচ্ছে, তুদিন ভি হামার তর সইবেনা। চটানে ভুখা থেকে হাম নেই মরেগে। কাঁথাকাপড়ের আঁধারে নেলীর বাঁচার ইচ্ছা একান্ত।

—লেকিন হামি কিছু শিখলাম না, না দানরী, না হেকিমী। রাহুচণ্ডালের হাড় ভি নেই যে হ্যাকিমী দানরী ব্যবসা করে খাব। বাপ লিয়ে যাচ্ছে আজ, এই পয়লা ফরাসডাঙ্গায় মুর্দার কঙ্কাল তুলতে যাচ্ছি—বাপেব ব্যবসা শিখে লিচ্ছি।

নেলীর কপালে কতকগুলো রেখা ফুটে উঠল তখন। বেখাগুলো কপালের উপরই নাচছে। মনে মনে সে যেন কোনো বাঁচার কৌশলকে আয়ত্ত করছে। সে কাঁথাকাপড়ের ভিতর থেকে মু বার করে বলল, হাম ভি কিছু শিখে লিব, হাম ভি কিছু জরুর কামাব।

—কাঁহাসে কামাবি?

—ঘাটসে। ঘাটের ডাক তুখিয়ার। সেখানে বড় লোকের বেটীর শরীর আগুনে খাচ্ছে। গহনা পুড়ছে। তুখিয়ার ডাক যখন, সব গহনা ও জরুর কয়লা ধুয়ে লেবে। যদি কিছু পড়ে থাকে, পহড় রাতে হামি লিব।

নেলীর কথা শুনে গেরু চোখ টান টান করল। বলল, তু একলা ভয় পাবিনে যেতে? তখন মড়া জ্বলবেনা ঘাটে।

নেলী পাশ ফিরে শুল। বলল, কিসের ভয়! কিসকো ভয়!

—লেকিন দশলোক যদি দশ কথা বুলে?

—বুলে বুলবে। দশ লোক ত দশ কথা বুলছেই। বাপকে ওরা বুলছে রাতে নেলী কাঁহা ভাগে, তু নজর না রাখে গোমানী! মেয়েটা তুর দিন দিন ডাইনী বনে যাচ্ছে। তু বাপ হয়ে নজর না রাখে। খাটো কাপড়টা নেলীর বুক থেকে সরে যাচ্ছিল—নেলী অন্যমনস্ক ভাবে কাপড়টা দিয়ে শরীরটা ঢেকে দিল।—তু রাত ধরে বাপ নজর রাখছে, হামি

যেতে পেছিনা কোথাও। খেতে পেছিনা কিছু। রোজ ভুখা থেকে মর গিলাম গেরু।

গেরু সেই কষ্ট ভাবটা মনে মনে অনুভব করতে পারছে। সে বুলল, ফরাসডাঙ্গায় যাবার সময় হয়ে গিল। কাল সবেরে আওগে। কাল সবেরে তু আর হাম জরুর খাওগে। এই বলে গেরু বল্লমটা তুলে নেলীর ঘর থেকে নেমে চটানে অদৃশ্য হয়ে গেল।

নেলীর কিছু জবাব নেই এখন। শুধু মাচানে বসে থাকা, বাপের জন্য অপেক্ষা করা। মাচানে বসেই সে হরিধ্বনি শুনতে পেল। বড়লোকের বেটারা মেয়েমানুষটাকে ঘাটে রেখে ঘরে ফিরে যাচ্ছে। পোড়া কয়লায় মেয়েটার শরীর পুড়ে ছাই হয়েছে। গহনাগুলো ছাই হয়নি। গহনাগুলো কয়লার সঙ্গে লেগে আছে। দুখিয়া হয়ত এখন নদী থেকে কলসী কলসী জল তুলছে। জল ঢালছে শ্মশানে। বালতিতে সব পোড়া কয়লা তুলে জলে ধুয়ে নিচ্ছে। সোনাদানা সংগ্রহ করছে। নেলীর ইচ্ছা—অনেক ইচ্ছা এখন। বালতি থেকে কি করে সোনাদানা দুখিয়া তুলছে—সে দেখার ইচ্ছা। কিংবা গহনার দু এক অংশ চুরি করার ইচ্ছা। চুরি করে গহনা বেচে কিছু খাওয়ার ইচ্ছা। এতগুলো ইচ্ছার তাড়নায় সে জড়বৎ হয়ে বসে থাকল মাচানে। অথবা সে জানে ঘাটে গেলে দুখিয়া এবং ওর বৌ ওকে এ-সময় তেড়ে মারতে আসবে। ডোমের কোনো মেয়ে মরদকে সে এ-সময় ঘাটে নামতে দেবেনা। সে জন্য মাচানে জড় হয়ে বসে থাকা ছাড়া কোনো গত্যন্তর থাকলনা নেলীর।

রাত নামছে চটানে। অশ্বত্থ গাছটার কাকগুলো শেষবারের মত হৈ চৈ করে ডালে ডালে বসে গেল। গঙ্গার ঢাল থেকে শূয়োরের পাল নিয়ে ফিরে এসেছে বাবুচাঁদ। খোঁয়াড়ে শূয়েরগুলো ঢুকিয়ে দিয়ে সে ওর ছোট্ট কুঠরিটায় ঢুকে গেল। ঘাটোয়ারীবাবু এ-সময় জপতপ নিয়ে বসেছেন অফিস ঘরে। ঝাড়ো ডোমের

ঘরে এখন সকলে পচাই খাচ্ছে। কৈলাশের ঘরে শেষ পক্ষের বৌটা পচাই গিলছে। গেরু এবং কৈলাশ চলেছে—কাঁধে মদের ভাঁড়, হাতে বল্লম। ওরা চটান থেকে নেমে যাচ্ছে। ওরা ফরাসডাঙ্গায় যাচ্ছে বেওয়ারিশ মড়ার তল্লাসে। অন্ধকার মাচানে শুয়ে নেলী সব ধরতে পারছে। নেলী জানে এ-সময়টাই একমাত্র সময় যখন চটানে পচাইর ঝাঁজ ওঠে। সে জানে চটানে এখন হৈ-হল্লা হবে। নাচন-কোঁদন হবে। লখি, টুনুয়া পচাই গিলে মাতলামি করবে চটানে। ওরা এসে নেলীর ঘরেও করতে পারে। কিংবা কৈলাশের শেষ পক্ষের বৌটার কাছে। লখি, টুনুয়া তখন হল্লা রসিকতা করবে। সিনেমার হাল্কা গান গাইবে। তখন কৈলাশের বৌটা পর্যন্ত মাতলামি করবে। এইসব ভেবে নেলীর ইচ্ছে হচ্ছে একটু পচাই গিলতে, ইচ্ছে হচ্ছে বাপ এলে বাপের সঙ্গে একটু মাতলামি করতে। চটানের এইসব চেহারায় নেলীর মনে মাতলামির সখ জাগল।

প্রচণ্ড শীতের হাওয়া চটানের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। গায়ে শীত লাগতেই নেলীর মনে হল কিছু পোড়াকাঠ এনে মাচানের নীচে রাখতে হবে। এবং ভোর রাতে যখন বাপ আর বেটিতে ঠাণ্ডায় কাঁথা-কাপড়ের নীচে ঘুম যেতে পারবে না, এবং বাপ খকখক করে কেবল কাশবে, তখন নেলী মাচানের পাশে পোড়াকাঠের আগুন জ্বালবে। সেজন্য নেলী ঘাট থেকে পোড়াকাঠ এনে উঠোনে রোজ তুলে রাখে, পোড়াকাঠে ভাত হয়, পোড়াকাঠের উত্তাপ নেয়। নেলী কিছু কাঠ তুলে আনার জন্যে মাচান থেকে উঠোনে নামল এবং পোড়াকাঠের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কাঠ কম কম মনে হচ্ছে। নেলীর চোখ মুখ দুটোই জ্বলে উঠল, নেলীর উপোসী দেহ থেকে গরল উঠতে থাকল, মর, মর—ঘাটে গিয়ে মর। হামার কাঠ চুরি করে মরছিস ক্যানে! নেলী দুটো হাত উপরে তুলে সমস্ত দুনিয়াকে শাপশাপান্ত করতে থাকল—ডাক ঠাকুর, তু দেখে লে সব।

তুর ছনিয়ায় হামি ভুখা আছি। হামার কাঠ চুরি করে লিছে। তুর কাছে নালিশ থাকল বাপ! তারপর নেলী কয়েকটা কাঠ নিয়ে ঘরে তুলল এবং মাচানের নীচে রেখে দিল। বলল, ভোর রাতে আগুন জ্বালব, ও ভি মানুষের সহ্য লয়।

নেলী শূয়োরের বাচ্চা ছটোকে খেদিয়ে খেদিয়ে ঘরে তুলল। পলো দিয়ে ওদের ঢেকে রাখল। টঙের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়ার আগে উঁকি মেরে দেখল সবগুলো ঢুকেছে কিনা। কাজগুলো সব শেষ করে নেলী লম্ফ জ্বালল ঘরে। বাপ আভি তক এলনা—মনে মনে এ কথাগুলো আওড়াল। বাপ এলে ছটো চাল ডাল নিশ্চয়ই নিয়ে আসবে আজ—নেলী বাপের জন্য অপেক্ষা করতে থাকল। বাপ এলে ছটো ভাত ফুটিয়ে দেবে বাপকে, নিজেও ছটো খাবে। গঙ্গা যমুনাকেও ভাগ দেবে। শিব মন্দিরের পথটায় এসে নেলী এমন সবই ভাবছে তখন। গঙ্গা যমুনাও ছ পাশে দাঁড়িয়ে গোমানী ডোমের অপেক্ষায় থাকল।

শিব মন্দিরের পথ ধরে বাবুদের মেয়েরা শরীরে ঠাণ্ডা মেখে ফিরছে। ওরা লাফাল। ওরা লাফিয়ে লাফিয়ে রাস্তা পার হচ্ছে। নেলী দেখল—দেখছে। সুখ, সুখ—সর্বত্র সুখ ছড়িয়ে আছে। নেলীও এমন সুখের ইচ্ছায় লাফাতে চাইল। শরীর দিচ্ছেনা। শরীর দিলে সে সত্যি যেন লাফাত। গঙ্গা যমুনাকে নিয়ে অন্যত্র চলে যেত। সুখের রাজত্বে কিংবা গেরুর জগতে। নেলী গঙ্গা যমুনাকে শুনিয়ে যেন বলল, গেরু হামার মরদ হবে। তখন তুরা ভুখা থাকবিনে। তুরা পেট ভরে খেতে পেলে নাচন-কোঁদন করতে পারবি বাবুদের বেটা বেটির মত। তুগো কোনো ছখ কাম রাখবে না। তুরা হামার বেটা বেটির লাখান। সে কুকুর ছটোকে জড়িয়ে ধরল। আদর করল। সুখ জানাল।

তখন গোমানী ডোম ফিরছে। শিব মন্দিরের পথেই ফিরছে।

আঁধার ঘন হয়ে উঠছে এ পথটায়। গ্যাস পোষ্টে আলো জ্বলছে। কোনো কোনো ঘরে হারমনিয়াম বাজছে। ঘুঙুর বাজছে—নাচ, গান হচ্ছে। হাসি-মসকরা, হাল্কা গান হচ্ছে। দু একটা ঘাটের কুকুর নর্দমার ময়লা খাচ্ছে। তখন কিছু কিছু লোক গলি পথে হারিয়ে যাচ্ছে। ওদের পরনে ধুতি, গিলে করা পাঞ্জাবী। দুটো একটা মানুষ প্যান্ট পরে আরো আঁধারের দিকে ছুটছে। তখন গোমানী ফিরছে টলতে টলতে। গালাগাল দিচ্ছে এই পথের বাসিন্দাদের। মুখে যা এল তাই বলে খিস্তি করল। শেষে একটা হাল্কা গানের সুর গলা বেয়ে উঠতে থাকল। নেলী বুঝল, গঙ্গা যমুনা বুঝল—বাপ চটানে ফিরছে।

গোমানী বলল, কোনরে? গঙ্গা যমুনা? নেলী?

নেলী বাপকে দেখে দাঁড়াল। গঙ্গা যমুনাও দাঁড়াল। গোমানী টলতে টলতে ফিরছে।—তুরা ইখানে বসে?

নেলী দেখল বাপের হাত খালি—কাঁধ খালি। গামছায় একটা ছোট্ট পুঁটলি ঝুলছে। নেলীর জানতে বাকি নেই পুঁটলিতে কি আছে। রাগে দুঃখে নেলী কোনো কথা বলতে পারল না। বাপ খালি পেটে আজও মদ গিলে এসেছে। এই সব দেখে নেলী অত্যন্ত ক্লান্ত গলায় বলল, আ যা বাপ!

হরিতকীর ঘরের সামনে আসতেই গোমানী দাঁড়িয়ে পড়ল। ভোরের সব কথাগুলো ওর মনে পড়ছে—হরিতকী ভোরে ওকে গালমন্দ দিয়েছে। বলেছে, গোমানী, তুমি একটা বাপই বটে! গোমানী হরিতকীর বন্ধ দরজার সামনে দাড়িয়ে খিস্তি করার আগে সেজন্য হাঁটু দুটো একটু সামনের দিকে, কোমরটা একটু পিছনের দিকে দিয়ে দু পায়ের উপর ভর করে দাঁড়াল। সে দাঁড়াতে পারছে না, তবু জোর করে দাঁড়াল। মাঝে মাঝে বড় বড় হাই তুলছে। সে যেন কি ভাবল—যেন কি বলতে হবে। যেন—তার মনে পড়ছেনা। বিরক্তিতে সে পা দুটোকে বেতো রুগীর মত কয়েক

বার কাঁপাল। কয়েক বার ভাঁটা ভাঁটা চোখ দিয়ে আশেপাশে কিছু খুঁজল যেন। তারপরই সব ঘটনাটা মনে পড়ায় বলল, মাগী জাত একটা জাত—ওয়ার আবার স্বভাব, ওয়ার আবার ধম্ম! মাগীর বাচ্চা হয়েছে শ্মশানে—হবে না! মাগীর নেই জাতের ভয়, নেই ধম্মের ভয়—চতুরাকে মদ খাইয়ে খুন করলে। ও শ্মশানে বাচ্চা বিয়োবেনা ত হাসপাতালে বিয়োবে! যে খিস্তিটা ভোর থেকে মনে মনে গোমানী ডোম আওড়াচ্ছিল মদ খেতে পেয়ে সে সবটা এবার উগরে দিল।—থু! এতেও শান্তি নেই, গোমানী হরিতকীর দরজার উপর থুথু ছিটাল।

এই সব দেখে নেলী বাপের কাছে ছুটে গেল। সে বাপের হাত ধরে টানছে। এখনি হয়ত পিসি দরজা খুলে বের হয়ে অনর্থ বাধাবে। বাপের চুল ধরে টানবে। বাপের শুকনো দেহটা নিয়ে টানা হ্যাঁচড়া করবে। বাপ হয়ত না পেরে পিসির পা কামড়ে ধরবে। বাপকে তাই টেনে নিয়ে যেতে যেতে ধমক দিল, বাপ, ফের তু ভুখা থেকে মদ গিলেছিস! ইসপিরিট খাচ্ছিস!

—হে মদ গিলেছি ত! ইসপিরিট খাচ্ছি ত! গোমানী এবার জোর করে হাতটা নেলীর হাত থেকে টেনে নিল।

—ভুখা থেকে ইসপিরিট খেলে যে মরবি বাপ!

—হাম মরেগে তু বুলছিস? হাম বাঁচেগে নেই!

—হে তু মরোগে বাপ!

—হাম নেহি মরেগে, নেহি মরেগে। তু মরবে নেলী। রাগে চোখ দুটো চিংড়ি মাছের মত বাইরে বের হয়ে পড়তে চাইল।-গোমানী মরেগে! কোন বুলবে এ কথা। গোমানী নেলীর পেটে লাথি বসিয়ে দিল। তারপর বলল, কোন শালে বুলবে এ কথা গোমানী মরেগে!

নেলীর ইচ্ছা হল এই মুহূর্তে ঘাটের পোড়া কাঠ তুলে বাপের মাথায় বাড়ি মারে। ইচ্ছে হল বাপকে চেপে ধরে

মাটিতে। কিন্তু বাপ তখন এত বড় বড় হাই তুলছে এবং বাপের পেটটা এত বেশী নীচে নেমে গেছে যে সে সব দেখে ওর ইচ্ছাগুলোর রঙ অন্য রকম হয়ে যেতে বাধ্য হল। সে অন্যরকম জবাব দিল, হাসপাতালে খুনের লাস কেটে তু ভি নরক হলি বাপ! খালি পেটে তু হামারে লাথ মারলি! এ আচ্ছা কাজ হল তুর!

গোমানী টলতে টলতে নেলীর সাপের মত বাঁকানো শরীরটা দেখল। যেন ফুলন আবার চটানে ফিরে এসেছে। যেন নেলী ফুলনের মতই শাসন করছে বাপকে। গোমানী এবার কাছে গিয়ে ধরতে চাইল নেলীকে, কিন্তু পা দুটো টলছে বলে এগোতে পারছেনা। সে এবার দু পায়ের উপর শক্ত হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করল। এবং নেলীকে দেখে দেখে সে তার স্ত্রীর কথা ভাবল। স্ত্রীর কথা রোজ এসময় তার মনে হয়, এবং মনে হওয়া মাত্র সে ঝিমিয়ে আসে। নেলী আজ ওর মার মতই যেন বললে, হাসপাতালের লাস কেটে তু ভি নরক হলি। গোমানী এইসব ভেবে আর দাঁড়াতে পারছেনা। সে ঘরের মেঝেতে বসে পড়ল। সেই ফুলনের চোখ দুটো নেলীর চোখে, সেই নাক, সেই মুখ, সেই গড়ন। নেলীর পেটে লাথি মেরে সে এখন খুব দুঃখ পাচ্ছে। গলার গামছা নীচে রাখল। গামছার পুঁটলি খুলল। পুঁটলিতে স্পিরিটের বোতল, কিছু চাল ভাজা, কিছু পেঁয়াজি।

গোমানী কাঁপা হাতে চাল ভাজা এবং পেঁয়াজিগুলো নাড়তে থাকল। নেলীর দিকে চেয়ে বলল, নেলী তুর মায়ী কি বুলত, তু তখন ছোট, খুব ছোট। বুলত খুনের লাস কেটে তু ভি নরক হলি। বুলত কত কথা, কত তারস তখন তুর মায়ীর।

গোমানীর মাথার ভিতর ঘোড়দৌড় হচ্ছে। সেজন্য সে বেশীক্ষণ ফুলনকে মনে রাখতে পারল না। সে এসময় নেলীকে পেঁয়াজি এবং চাল ভাজার সঙ্গে বোতলটা এগিয়ে দিল।— দ্যাখ, তুর লাগি কি লিয়ে এসেছি। খা, খা। দুটো খেয়ে লে।

কিন্তু নেলী খেল না বলে গোমানী বিরক্ত হয়ে চড়া গলায় হেঁকে উঠল, লে আও, লে আও বুলছি মাটির গেলাস। মদ নেসে ছুনিয়া ঠাণ্ডা হোতা হ্যায়, আওর তু ত নেলী।

নেলী বাপের কথায় জবাব দিল না। এমন কি বাপের দিকে মুখ তুলে তাকাল না পর্যন্ত। এক মুঠো চালভাজা, ছুটো পেঁয়াজি তুলে নিল। ওগুলো খেয়ে এক মালসা জল খেয়ে বাপের কাছে এল ফের। বলল, মাচানে চল্, ঘুমোবি।

নেলীর মিষ্টি কথায় গোমানী খুব খুসী হল। মাথার ভিতর ঘোড়দৌড়টা এখনও টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে। সে বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠল—নেলী, তু বেড়ে কথা বুলেছিস। হামি বঁচেগে নেই। তুর মাভি বুলত হামি বঁচেগে নেই। লেকিন মা শীতলার কৃপায় তুর মায়ী জলদি জলদি পার পেল। তুকেও কৃপা করেছিল, লেকিন তু বেঁচে গেলি। একটু হেসে গোমানী কিছু মনে করার যেন চেষ্টা করল। তারপর বলতে থাকল—তা তু বলতে পারিস হামি ইসপিরিট খাই ক্যানে, তুকে ভুখা রাখি ক্যানে, হামি থাকি ক্যানে, সব বুলতে পারিস। লেকিন বাত কি আছে তু জানে, খুনের লাস, গলায় দড়ির লাস, সকল লাসের পেট মাথা চিরে হামার মাথা ঠিক থাকেনারে, মাথাটা হামার গরম হয়ে উঠে। হামি পাগল বনে যাই। মদ খানেসে দেমাক ঠাণ্ডা হোয়ে যায়। মদ পিনেসে ছুনিয়া ঠাণ্ডা হোতা হ্যায়, আওর তু ত নেলী। খা, খা লে। স্পিরিটের বোতলটা গোমানী নেলীর মুখের সামনে তুলে ধরল।

—বাপ, বাপ, আর পারিনে! নেলী কান্না-কান্না গলায় চীৎকার করে উঠল।—তু আর বাপ জ্বালাসনে। নেলী গোমানীর হাত ধরে টানতে থাকল। চটানের সকল লোক তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। একমাত্র ঝাড়োর বৌ জেগে। বাঁশের পাতি তুলছে বসে বসে। ঘরে একটা লম্ফ জ্বলছে। নেলী এসময় বাপকে কোলে তুলে নিল। বলল, আ যা বাপ, তু আর জ্বালাসনে,

হামার বহুত নিদ আতা বাপ। নেলী বাপকে তুলে মাচানে শুইয়ে দিল, এবং কাঁথা-কাপড় দিয়ে ঢেকে জোরে চেপে রাখল বাপের শরীরটাকে। ঠাণ্ডায় গোমানীর শরীরটা বরফ হয়ে আছে।

রাত ঘন হচ্ছে। গভীর হচ্ছে।

বাপের পাশে শুয়ে রয়েছে নেলী। ওর ঘুম আসছেনা। আসবেনা। শ্মশানের সমস্ত ছবিটা সে দেখতে পাচ্ছে। কটা কুকুর—কয়েকটা কচ্ছপ ঘোরাফেরা করছে সেখানে। কয়েকটা শেয়ালের আর্তনাদ অথবা ইতস্তত জোনাকীর আলো। রাত যত ঘন হবে জোনাকির আলো তত বেশী ভুতুড়ে মনে হবে, তত বেশী শরীরটা ছম ছম করবে। অথচ নেলী ভয় পাওয়ার মত করে হাঁটবেনা। কিংবা ওকে দেখে মনে হবেনা যে কোনো ভয় পাচ্ছে। ববং ওকে দেখলেই ভয় পাওয়ার কথা। কুকুর দুটোর জ্বলন্ত চোখ দেখে ভয় পাওয়ার কথা!

প্রথম দিকে দু একবার গোমানী জোর করে উঠে বসবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু নেলী উঠতে দেয়নি। জোর করে চেপে রেখেছে। কাঁথা চেপে গোমানীর উপর বসে রয়েছে। এখন গোমানী হাঁ করে ঘুমোচ্ছে। নেলী লম্ফর আলোটা তুলে আনল। বাপের মুখ দেখল। মুখ ভয়ানক কুৎসিত—মুখে ভয়ানক গন্ধ। ভিতরের দুটো কষ্টি কালো দাঁত শ্বাসের সঙ্গে নড়ছে। আরো ভিতরে আলজিবটা সে দেখতে পেল। আলজিবটা নড়ছেনা— সুতরাং বাপ প্রচণ্ড ঘুমুচ্ছে। মুখের ভিতরটা স্পিরিট খেয়ে খেয়ে কালো হয়ে গেছে। যেন ভোঁতা হয়ে গেছে। বাপের জন্য নেলীর অদ্ভুত রকমের কষ্ট হতে থাকল।

মাচান থেকে নেলী সন্তর্পণে নামল। মেঝেতে গঙ্গা যমুনা মুখ গুঁজে পোড়েছিল। জ্বলজ্বলে দুটো চোখ দিয়ে ওরা ওকে

দেখল। নেলী ইসারা করলে চুপি চুপি [illegible] উঠে এল। চুপি চুপি ওরা উঠোনে নামল। উঠোনে দুটো মালসা—কবুতরগুলো মালসায় জল খায় বিকেলে। সে মালসা দুটো হাতে নিল। একটা পোড়া হাঁড়ি নিল। নেলীর চোখে দুঃসহ সংশয়। ভয়, দুখিয়া বেড়ার ফাঁক দিয়ে ওকে দেখে চীৎকার করে না ওঠে। চীৎকার করে না বলে—ডাইনী মাগী কাঁহা যাচ্ছে দ্যাখ। সে উঠোনের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ভালোভাবে সব দেখে নিল। কেউ জেগে নেই। কেউ না। এমন কি ঝাড়োর বৌ পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়েছে। একমাত্র ঘাটোয়ারীবাবুর ঘরে আলো জ্বলছে। এ-রাতেও ঘাটোয়ারীবাবু জানালার ধারে বসে রয়েছেন, চেয়ারে বসে কিছু যেন করছেন না—অথচ বসে আছেন। নেলী কুকুর দুটোকে ফের ইসারা করলে! শিব মন্দিরের এবং বাবলার ঘন বন পার হয়ে সে ধীরে ধীরে শ্মশানের চালা ঘরটায় হাজির হল। এখানে সারারাত লণ্ঠন জ্বলে। ঘাটোয়ারীবাবু জ্বালিয়ে দেন। বৃষ্টি-বাদলার রাতে আলো নিভে যায়। শীতের রাতে হাওয়া খুব না থাকলে নিবু-নিবু করে সারারাত জ্বলে। শ্মশানকে আরো ভয়াবহ করে তোলে। নেলী সেই হ্যারিকেনটা খুলে নিল এবং পলতেটা বাড়িয়ে গঙ্গার ঢালে নেমে গেল।

দুখিয়ার বৌ ঘরে ধড়ফড় করে উঠে বসল। ওর ঘরটা চটানের শেষ মাথায়। শিব মন্দিরের পথে নামতে সে দেখল যেন, স্পষ্ট দেখল যেন নেলী চটান থেকে নেমে গেল। নেলীর কুকুর দুটোও। মংলী তাড়াতাড়ি দুখিয়াকে ঠেলে তুলে দিল। বলল, দ্যাখ, দ্যাখ, ডাইনী মাগী আঁধার রাতে পালাচ্ছে।

দুখিয়া উঠে প্রথমেই হ্যারিকেনের আলোটা উসকে দিল। হ্যারিকেনটা নিয়ে ধীরে ধীরে বাইরে এসে দাঁড়াল। হ্যারিকেনটা উপরে তুলে নেলী কাছে কোথাও আছে কিনা দেখল। না দেখে সে হাজির হল গোমানীর ঘরে। গোমানী নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে—বেটা হাড় হাভাতে! দুখিয়া গাল দিল মনে মনে।—

বেটা ইসপিরিট খোর। প্রথমে সে মাচানের কাছে গিয়ে নাড়া দিল—গোমানী, গোমানী, অঃ গোমানী! হারে উঠ। উঠে তামাসা দেখে লে। যোয়ান বেটির তামাসা। বেটি ত তুর ভাগলবারে। তুর বেটির ঘাড়ে ভূত সোয়ার হো গিয়ারে গোমানী! বেটি তুর ডাইনী বন গিয়া।

গোমানী কাঁথা-কাপড় ঠেলে উঠে বসল। কিন্তু ব্যাপারটা ধরতে পারছে না। মাথাটা এখনও ঝিমঝিম করছে। এখনও শরীরটা ক্লান্ত, ভারী-ভারী। এখনও সে কথা ঠিক মত পারছেনা—বুঝতে পারছেনা। সুতরাং সে ফ্যালফ্যাল করে ঢুখিয়ার দিকে চেয়ে থাকল।

—খ্যাঁরে দেখে তুর হবেটা কি! নেলী আঁধার রাতে কাঁহা গ্যাল দ্যাখ। দ চার ঠো আখেরের কাজ কাম কর।

—কাঁহা গ্যাল!

—কাঁহা ভি গ্যাল।

—তু না জানিস?

—হাম না জানে।

—চটানের কৈ না জানে?

ঢুখিয়া ঠোঁট উল্টে বিদ্রূপ করল, কোন জানে!

গোমানী এবার মরিয়া হয়ে ডাকতে থাকল, হরিতকী, হরিতকী!

হরিতকী শুয়েছিল। ঘুমিয়েছিল। গোমানীর চীৎকারে সে জাগল। বসল এবং দুয়ার খুলে বের হয়ে দেখল ঢুখিয়া, ওর বৌ মংলী এবং গোমানী চটানে হৈ চৈ বাধিয়ে দিয়েছে। হরিতকীকে দেখে গোমানী ওর কাছে ছুটে গেল। বলল, তু জানে নেলী এ-আঁধার রাতে কাঁহা গ্যাল? জানে তু?

—হাম না জানে গোমানী।

—তু না জানে, ঢুখিয়া না জানে, কৈ না জানে, তব কোন জানে? কোন!

গোমানীর মাথায় এখন আর তেমন ঘোড়দৌড় হচ্ছে না। এতক্ষণে শরীরটা হাল্কা বোধ হচ্ছে যেন। তবু সে জোরে কথা বলতে পারল না। শরীর দুর্বল। সে বুঝতে পারল—সে এত অসহায়। এইজন্য দুখিয়া, হরিতকীর দিকে চেয়ে নেলীর অনুসন্ধানের প্রত্যাশা করল। যদি ওরা কিছু বলতে পারে, অথবা ঢুঁড়ে এসে খবর দেয় নেলীকে পাওয়া গেছে, নেলী মালসা করে ডাল, ভাত, মাছ, মাংস আনতে যায়নি। যদি ওরা বলে নেলীর ভিতর ডাইনী হওয়ার মত লক্ষণ আপাতত প্রকাশ হচ্ছে না। যদি বলে নেলীকে পাওয়া গেছে—তু চিন্তা না করে গোমানী। কিন্তু ওরা নড়ল না, কিছু বলল না। ওরা দাঁড়িয়ে থেকে গোমানীর অথর্ব শরীরটা দেখল শুধু।

এতটা অথর্ব বুঝেই দুখিয়া বলতে বুঝি সাহস করল, হামি ত তুর বেটির জন্য পাহারাদার না আছে। তুর বেটি কাঁহা গ্যাল ও হামাদের বুলতেই হবে। বেটি তুর আচ্ছা লয় গোমানী। ওকে থোড়া সমজে রাখ।

উঠোনের অন্য পাশ থেকে মংলী বলল, তু দুখি, চলে আয়। গোমানীর বেটি আঁধার রেতে কাঁহা গেছে ও গোমানী বুঝবে। তু ওকে ভালাই করিসত ও বুঝবে মন্দ। লয়ত ওয়ার বেটি রাতে কাঁহাসে ভাত দাল মাছ মাংস লিয়ে আসে।—এক দফে ও বুলবেনা ওয়াকে। হাপুস হাপুস শুধু গিলবে।

—ও বাত ঠিক লয় বৌ, গোমানীর বেটি মন্দ কাজ করে বেড়াবে, পহর রাতে ডাইনী সেজে ঘোরাঘোরি করবে, ও কথা ঠিক লয়। চটানে ঝাড়ো ডোম আছে, সর্দার আছে, ঘাটোয়ারীবাবু আছে, পাঁচজনার পাশ জরুর নালিশ দিতে হবে। হয় গোমানী থাকবে চটানে, লয় তো হামি থাকবে। চটানে দিন দিন বেজাত অজাত হয়ে উঠছে। বহুত বেইমানী আচ্ছা লয় গোমানী।

গোমানীর মন পাথরের মত ভারী হয়ে উঠছে। হাসপাতালে খুনের লাস কাটার সময় যেমন সে ক্রমশ নিষ্ঠুর হয়ে উঠত,

সে এখন সেরকম নৃসংশ। চোখ দুটো ফের চিংড়ি মাছের মত ঝুলে পড়তে চাইল মুখ থেকে। সে দুখিয়ার মুখের উপর গিয়ে ফেটে পড়ল, বেইমানী কোন কিয়া? হাম!

—না, তেরে বেটি। হারামী আছে ও। হামার বেটি হোত তু।

—জবাই করতি।

—জরুর।

—হাম ভি করে জবাই। যেন নেলীকে জবাই করে চটানে সসম্মানে বেঁচে থাকা গোমানীর একমাত্র পথ। নেলীর জন্যই যেন সে এত ছোট হয়ে গেছে। এত দুর্বল হোয়ে আছে চটানে। এবং নেলীকে জবাই করলে চটানের সকলে যদি খুশী হয়—তবে আজ সে তাই করবে। তাই করে সকলকে খুশী করবে। এই ধরনের কিছু ভাব গোমানীর মনে বার বার চাপ দিচ্ছে। সে মাচানের নীচে থেকে দা-টা খুঁজে বের করল এবং দুখিয়ার সামনে গিয়ে জবাই-এর কসরত দেখাল। তারপর চীৎকার করে উঠল—নেলীরে, তু আজ চটানে জবাই হ যাবি।

ঘাটোয়ারীবাবুর ঘুম আসছিল না। তিনি ঘুমুতে পারছিলেন না শরীরে কম্বল ঢেকে চেয়ারে বসে ছিলেন। বসে থাকতে থাকতে কখন একটু ঘুম লেগে এসেছিল টের পান নি। গোমানীর উৎকট চীৎকারে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি ঘুমুলেন না। তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। গঙ্গাপুত্তুরের দল ঘোর হামলা বাধিয়েছে। ফের চটানে খুনোখুনি আরম্ভ হয়েছে। তিনি জানেন এইসব লোকেরা সমস্ত রাত আর তাকে ঘুমুতে দেবে না। গালমন্দ, খিস্তি, হামলা, মারধোর তিনি না গেলে সারারাত ধরে চলতে থাকবে। সেজন্য কম্বল গায়ে খড়ম পায়ে তিনি চটানে নেমে গেলেন।

ঘাটোয়ারীবাবু চটানে ঢুকেই ধমকে উঠলেন গোমানীকে, এই শূয়োরের বাচ্চা হারামজাদা গঙ্গাপুত্তুরের দল, তোদের জন্যে রাতে ঘুম যেতে পারবনা পর্যন্ত। তোদের দিনরাত খুনোখুনি

লেগেই আছে। এ কিরে বাবা! এ যেন হনুমানের রাজত্ব। বেটারা সব হনুমানের দালাল দেখছি। কি হচ্ছে এ-সব। হৈ-হল্লা চীৎকার! এই শূয়োরের বাচ্চা গোমানী, কাকে খুন করবি—তোর কোন শত্রুকে?

ঘাটোয়ারীবাবুকে দেখেই গোমানী কেমন নিস্তেজ হয়ে পড়ল। খুন হো যাবি, জবাই হো যাবি বলে আর চীৎকার করলনা। এখন সে যথেষ্ট ভালমানুষ। এখন সে চটানের কোনো ঘটনারই সাক্ষী হিসাবে থাকতে যেন নারাজ। কিছু ঘটেছে যেন এও মিথ্যা। কিন্তু ঘাটোয়ারীবাবু ঘরে উঠে এলে খুব বিষণ্ণ গলায় বলল, বাবু, নেলী চটানসে ভেগে গেল আঁধার রাতে। বাবু, হামি কি করব? মেয়েটা হামাকে ফাঁকি দিল বাবু!

গোমানীর শরীরটার দিকে চেয়ে ঘাটোয়ারীবাবুর মনটা ভিজে উঠল। তিনি বললেন, ও তো প্রায় রাতেই যায় রে! আজ প্রথম গেল ভাবছিস!

গোমানী দা-টা মাচানের নীচে রেখে দিল।—লেকিন কাঁহা যায় হাম ত না জানে বাবু!

ঘাটোয়ারীবাবু এখন উপদেশ দেওয়ার মত করে কথা বলছেন।—তবে চুপ করে থাক। চুপ করে শুয়ে থাক। খুনোখুনি করবি কাকে? খুন ত বেটা তুই নিজেই হয়ে আছিস। মদ খেয়ে দিনরাত পড়ে থাকবি, মেয়েটাকে খেতে দিবিনে। মা-মরা মেয়েটা সমস্ত দিন রাত খেতে না পেয়ে এ-ঘর ও-ঘর করবে, না-খেতে পেয়ে মেয়েটা কাঁদবে—আর আঁধার রাতে ভেগে গেল ত হুঁস হল—মেয়েটা কাঁহা যায় হাম ত না জানে বাবু। শালা শূয়োর—হারামজাদা গঙ্গাপুত্তুর! শুয়ে থাক হনুমানের দালাল কোথাকার! শেষে তিনি দুখিয়ার দিকে চেয়ে বললেন, এই দুখিয়া, বেটা সুদখোর, তুই আবার এখানে কেন?

ভয়ে ভয়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল মংলী। দুখিয়া আমতা আমতা করতে থাকল প্রথমে, পরে কিছু বলার চেষ্টা করল। কিন্তু ঘাটোয়ারীবাবুর চোখের দিকে চেয়ে কিছু বলতে সাহস করল না। হরিতকী তখন দুখিয়ার দিকে আড়ে ঠারে চাইল। ব্যঙ্গ করল। রসিকতা করতে চাইল—জানে না বাবু উইত উবকার করতে এল নেলীর।

—হো উবকার করতে চেয়েছে। একটা তির্যক গলা ভেসে আসছে দুখিয়ার ঘর থেকে। মংলী ঘরে বসে হরিতকীকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলো বলছে। ঘরে বসে বসেই হাত পা নাড়ছে এবং চোখ মুখ টেনে হরিতকীর জবাব দিচ্ছে।

দুখিয়া ভালমানুষের মত কথা বলল এবার।—শুয়ে পড় গোমানী। কি আর করবি—সব নসিব। কাঁহাতক আর বসে থাকবি বেটির লাগি—শুয়ে পড়। বেটি তুর কামাই করে ফিরতে বহুত রাত হবে। যেন দুখিয়া এখন কত ভালমানুষ হয়ে গেছে, যেন গোমানীর দুঃখে সে খুব কষ্ট পাচ্ছে। গোমানীর মেয়েটার ফিরতে রাত হবে বলে যেন ওরও ঘুমোবার. অসুবিধা। সে এবার ঘাটায়ারীবাবুর দিকে চেয়ে বলল, কি বাবু, হামি ঠিক বুলছি না, ও এখন শুয়ে পড়ুক।

ঘাটোয়ারীবাবু কোনো জবাব দিতে পারলেন না দুখিয়াকে। নেলীর কামাই করে ফিরতে রাত হবে কথাটা দুখিয়ার গলায় নষ্ট নষ্ট ঠেকল। তিনি হরিতকীর দিকে চাইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্য মানুষ হয়ে কি এক অন্য ভাবনার ভিতর ডুবে চটান থেকে উঠে গেলেন। দুখিয়া এ-সব দেখে হাসল। হরিতকীর দিকে চেয়ে চোখ টানল। তারপর বেশ বড় বড় পা ফেলে নিজের ঘরের দিকে যাওয়ার সময় বলল—তুর মেয়েটা চটানে দিন দিন ডাইনী বনে যাচ্ছে। ও কি হরিতকীর লাখান একটা বাচ্চা দিয়ে লিবে চটানে। গোমানীকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলো বলল দুখিয়া। গোমানী শুনল। চোখ তুলে হরিতকীকে দেখে

বড় বড় পা ফেলে সেই ঘরে ঢুকে গেল। যেন হরিতকীকেই ওরা সকলে শাসন করে গেল—নেলীকে নয়।

হরিতকীর তখন ইচ্ছে হল বলতে, হে দিয়েছি ত, হে দে লিছি বাচ্চা। তেরে বহুকা মাফিক হামি কি পোড়াকাঠ যে আগুন দিলে ভি জ্বলবে না। তাজা কাঠ আছি—আগুন গিলেছি, বাচ্চা দে লিছি। এ-লাজ না খোঁটার কথা আছে। হরিতকী, মংলীকে উদ্দেশ্য করে তুখিয়াকে উদ্দেশ্য করে সারারাত ধরে গালমন্দ দেওয়ার কথা ভাবল। কিন্তু কিছু বলল না। এই নিশুতি রাতে চিল্লাতে স্বুরু করলে ফের ঘাটোয়ারীবাবু ছুটে আসবেন এবং তিনি তুখিয়া-মংলীর এমন সব ইসারাতে সরম পাবেন। সেইজন্যই আঁধার রাতে কোনো গরল না ঢেলে হরিতকী নিজের ঘরে গিয়ে বাচ্চাটাকে চেপে ধরল এবং সমস্ত তুঃখ ভুলে আদর করল, শনিয়া, তু মেরে লাল।

কাঁথা-কাপড়ে শরীর ঢেকে গোমানী বেশীক্ষণ মাচানে বসে থাকতে পারল না। লম্ফটা তুবার দপ দপ করে জ্বলে শেষে নিভে গেল। ঘরটা অন্ধকার হয়ে উঠল। গলা বেয়ে ফের কাশি উঠছে। খক খক করে কবার কেশে সে উপুড় হয়ে শুল। হেপোঁ রুগীর মত কিছু কাঁথা বালিস এনে বুকের নীচে ঠেসে দিল। কাশি দম বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করল। মাঝে মাঝে কোনো শব্দ হলেই কাঁথা-কাপড় থেকে মুখ বের করে দেখল—নেলী এসেছে কি না! এল না। নীচে বাচ্চা শূয়োর ছুটোর শব্দ। ফের মুখ বের করল—নেলী আসেনি। নীচে অথবা টং-এ কবুতরের শব্দ। এ-আঁধার রাতে নেলী কোথায় গেল! কাঁহা গেল মেয়েটা! ওর কষ্ট হতে থাকল। এ-সময় ওর ফুলনের উপর রাগ হল। ফুলনের মৃত্যুর উপর। ফুলন মরে খুব অপরাধ করেছে এমন একটা ভাব কাজ করছে ওর মনে। ফুলন বেঁচে থাকলে এ-সব হাঙ্গামা ওকে পোয়াতে হত না। এইজন্য সে মাঝে মাঝে মেয়ে এবং মার উপর খুব রেগে উঠছিল।

তখন গোমানীর চোখে মুখে কেমন বেপরোয়া ভাব। চোখ দুটো আঁধারেও কেমন ঘোলা ঘোলা। নেলী ফিরছে না—বড় কষ্ট হচ্ছে ওর। চটানে নিশুতি রাত নেমেছে। বরফের মত ঠাণ্ডা নেমেছে। নেলী এই ঠাণ্ডায়, এই শীতে কি না জানি করছে! চটানে এখন আর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। শ্যাওড়া গাছে ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকছে। ঘাটে মড়া নেই। দূরে কয়েকটা কুকুর আর্তনাদ করছে। সে অনেকগুলো শেয়ালের ডাক শুনল বাবলার ঘন বনে। শীতের ঠাণ্ডায় মুরগীগুলো ডিমে তা দিতে দিতে চীৎকার করছে কৈলাশের ঘরে। কৈলাশের ঘরে ওর তৃতীয় পক্ষের বৌটা একা। বৌটা মদ খেয়ে পেট ঢাক করে চিত হয়ে ঘুমুচ্ছে। শুয়ে শুয়ে এটা সে আন্দাজ করল। এ-সময়ই উঠে পড়ে নেলীকে ঢুঁড়তে যাওয়ার ইচ্ছা হল গোমানীর। এক ফাঁকে একটা নজর দিয়ে আসবে কৈলাশের ঘরে এই ওর বাসনা। অথচ উঠতে গিয়ে দেখছে শরীরটা ওর যেন পাথর হয়ে আছে।

ঘাটোয়ারীবাবু যখন চটানে নেমেছিলেন, নেলী তখন গঙ্গার ঢালু বেয়ে নামছিল। গঙ্গা যমুনা আগে আগে যাচ্ছিল। ওরা ঘেউ ঘেউ করছে। বাবলার ঘন বনে কটা শেয়াল ডাকছে সে জন্য। গঙ্গা যমুনা মাটির গন্ধ নিতে নিতে নীচে গিয়ে নামল। নেলী সেই তাজা চিতাটাকে খুঁজছে। খুঁজে বের করবার চেষ্টা করছে। এখানে ইতস্তত কাঠ, কয়লা, ভাঙ্গা কলসী, ছেঁড়া তোষক বালিশের তুলো মাটির সঙ্গে মিলে মিশে আছে। নেলী এদের ওপর দিয়েই হেঁটে গেল। হ্যারিকেনের আলোয় সে ঠিক ধরতে পারছে না কোথায় তাজা চিতাটাকে সে রেখে এল। সে খুঁজছে। খুঁজছে। নদীর বালিয়াড়িতে সে এসে নামল। একটা কাঁচা বাঁশ দেখল। নদীর চরে বাঁশটা এখনও পোঁতা আছে। সে বুঝল কচ্ছপেরা এখনও এসে এখানে ভেড়েনি। সে তাড়াতাড়ি বাঁশটা তুলে আনল জল

থেকে এবং বাঁশের ডগায় মাংসপিণ্ডটাকে দু ভাগ করে গঙ্গা যমুনাকে খাওয়াল। তারপর ফের গঙ্গার ঢালু বেয়ে উপরে উঠে সেই তাজা চিতাটাকে খোঁজা—যেখানে দুখিয়ার নসিব খুলেছে। এই ভর নিশুতি রাতে প্রেতের মত দুটো কুকুরকে নিয়ে নেলী তাজা চিতাটা খুঁজছে। নেলীর মনে হল তখন কে যেন দূরে শহরের দিকে ছুটছে। নেলী এখন হাসছে। নেলী তাজা চিতাটা এ-সময় খুঁজে পেল। এ-সময় নেলীর মনটা এক আকাশ নক্ষত্রের মত আলো দিল। ভয়ানক আনন্দে সে আলোকিত হল। আঁধার রাতে আকাশটায় কত নক্ষত্র, আর এই নীচের পৃথিবীতে কত সুখ-দুঃখ। কত বেদনা। নেলী এমন করে ভাবতে জানে না—কিন্তু মনের ভিতর গহনা পাওয়ার আশা এবং এই সুখানুভূতি ওর অনুভবে ঘা দিচ্ছে এবং তারই প্রকাশ যেন আকাশটায় অনেক নক্ষত্রের নীচে পৃথিবীর অনেক সুখ-দুঃখের মত। সে আশার ডিমে তা দিচ্ছে। আহা কাল সে খাবে, কাল সে পেট ভরে ভাত দিয়ে লিবে বাপকে। আহা গঙ্গা যমুনারে! নেলী এখন এই 'আ হা'র জগত ধরে দুখিয়ার ধোওয়া কয়লাগুলো হাঁড়িতে ভরছে, জলে ধুয়ে নিচ্ছে—এই 'আহা'র জগত ধরে জল ফেলে দিয়ে কয়লার তলানি খুঁজছে। হাতের লণ্ঠনের আলোয় তলানি দেখার আগে উত্তেজনায় অধীর হচ্ছে। চোখে মুখে কত সুখের উত্তেজনা। গহনা পেলে কাল গেরুকে খেতে বলবে। গহনা বেচে চাল, ডাল, একটু মাছ নেবে। বাপ মাছ খেতে ভালবাসে। গেরুর জন্য একটু শূয়োরের মাংস অথবা চর্বি। গেরু শূয়োরের চর্বি খেতে ভালবাসে। নেলী তলানি খুঁজল। একটা আঙ্গুল দিয়ে তলানির ছোট ছোট অনুর মত টুকরোগুলোকে ঘসল। সব জলের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। কিছু শক্ত ঠেকছেনা। পিতল কাঁসা কিংবা লোহার মত সোনার মত ঠেকছেনা। অণুর মত ঠেকছেনা। দুখিয়া কয়লা ধুয়ে ধুয়ে কালি পর্যন্ত তুলে

নিয়ে গেছে। নেলী সব কয়লাগুলো জলে ধুলো এবং মালসাতে জলের তলানি খুঁজল—কিচ্ছু নেই। সে নিরাশ হচ্ছে। ওর চোখ দুটোতে ফের দুঃসহ যন্ত্রণা। ফের সে ইচ্ছে করে মাতাল হয়ে উঠছে। সে ডাক দিল—দোহাই ডাক ঠাকুর, দোহাই তুর। সে এবার কয়লা ফেলে শ্মশানের ভিজা মাটিগুলো তুলল হাঁড়িতে। যদি কিছু গয়না গলে মাটির সঙ্গে মিশে থাকে।

নেলী আবার আশার ডিমে তা দিতে দিতে জলে মাটি গুলল। জল ফেলে তলানি ঢাকল মালসাতে। দু মালসায় তলানি জল ঢেলে জলটা আরও কমালো।

তারপর! এগুলো সে কি দেখছে—এত গহনা! এত টুকরো গহনা! চোখ ওর উজ্বল হয়ে উঠল। চোখ ওর আনন্দে জলে ভরে উঠল। এত! এত সোনার সব টুকরো! সব অণু। নেলী হ্যারিকেনটা আরও কাছে নিয়ে গেল। টুকরোগুলো সব ঝিকমিক করছে। মালসাটি বুকের কাছে চেপে ধরল। —দোহাই ডাক ঠাকুর, দোহাই তুর। হামারে থোড়া শক্তি দে! সে একটা আঙ্গুল দিয়ে নেড়ে নেড়ে দেখতে চাইল। আঙ্গুলটা পর্যন্ত কাঁপছে। তবু যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করে একটা অণুর স্পর্শ আঙ্গুলে পেতে গিয়ে দেখল সেগুলো জলের সঙ্গে গুলে যেতে চাইছে। নেলী আর পারছে না। সে আঙ্গুল দিয়ে ফের চাপ দিল। ওরা ভেঙ্গে যাচ্ছে। জলের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। নেলী আর পারছে না। আর পারছে না। ডাক ঠাকুর তু হামার সাথ বেইমানী মত্ কর্। পেটের দুঃসহ যন্ত্রণা, শরীরটার দুঃসহ যন্ত্রণা, এই সব যুবতী মেয়ের পোড়া অণুবৎ হাড়ের টুকরো ওকে পাগল করে দিচ্ছে।

নেলী পাগলের মত প্রেতের মত সমস্ত রাত এইখানে পড়ে থাকল। এবং ভোর রাতের দিকে নেলী পাগলের মতই অর্থাৎ ডাইনীর মত হয়ে—চোখ দুটো ফোলা ফোলা, চুলগুলো

খাড়া খাড়া করে চটানে উঠে গেল। গোমানী রাগে দুঃখে ওর কোমরে কয়েকটা লাথি মেরেছিল—অথচ নেলী কিছু বলেনি, চুপ চাপ মাচানে গিয়ে হাত পা ছড়িয়ে চোখ দুটো স্থির করে—কাঁথা বালিশের নীচে আশ্রয় খুঁজেছিল এবং ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

॥ দুই ॥

তখন সূর্য পাটে বসছিল। তখন খেয়াঘাটের মাঝিদেব সঙ্গে গোমানী ডোম ঢক ঢক করে স্পিরিট গিলছিল এবং তখনই নদীর পার ধরে নামছিল কৈলাশ এবং সঙ্গে ওর মরদ বাচ্চা গেরু ডোম। ওরা অনেক খানা-খন্দ পার হয়ে, অনেক ডহর-ডোবা পার হয়ে নদীর পাড় ধরে চলছিল।

ওরা এ-মশ উত্তরের দিকে নেমে যাচ্ছে। গেরু মাঝে মাঝে পিছন ফিরে তাকাচ্ছিল—শ্মশান পেছনে, শ্মশানটা হারিয়ে যাচ্ছে। চটানটা আর দেখা যাচ্ছে না। সুতরাং সামনে ফরাসডাঙা, সুতরাং সামনের দিকে ওরা চলতে থাকল। ফরাসডাঙার জঙ্গলে মৃত মানুষের কবরে, অথবা সে ভাবল নতুন কবরে, যত তন্তর-মন্তর শিখল বাপের কাছে সব উগরে দেবে। তারপর তন্তর-মন্তরের গুণাগুণ দেখে সাহস সঞ্চয় ক'রে নেবে।

গেরুর শরীর মজবুত এবং কষ্টিপাথরের মত রঙ। একহাতে মদেব ভাঁড় এবং অন্যহাতে বল্লম। সঙ্গে একটা হ্যারিকেন আছে। গায়ে জড়ানো শ্মশানের কাঁথাকাপড়। কোমরে গামছা বেঁধেছে শক্ত করে। গেরুর শীত শীত করছে। উত্তুরে বাতাসে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। এই ঠাণ্ডায় ওর মুর্দা তোলার সখ অথবা খোঁজার সখ এখন আর থাকছে না। সে ভাবল, এই শীতে বরং শুয়ে থাকা ভাল, বরং চটানে মদ টেনে নেলার সঙ্গে মাতলাম করা ভাল। সুতরাং সে বিরক্ত সুতরাং সে বুল্লম দিয়ে একটা গাছকে ফুঁড়ে দিল।

কৈলাশ তখন শীতে পোকা হয়ে বেশ গুটিগুটি চলেছে।

বেশ এক-পা দু'পা করে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। অনেক দূর চলে যেতেই ওর হুঁশ হল—গেরুর কথা মনে হল, মরদ বাচ্চা আর কতদূরে। মরদ বাচ্চা এ-কাজ করে খেতে পারবে কি পারবে না—সব কিছু মরদের চলার ঢং দেখে বুঝে নেবার চেষ্টা করল। কৈলাশ এই অন্ধকারে, এই নদীর পারে পারে যেন বলতে চাইছে—হামার শরীরটা কঙ্কাল আছে, হামার কঙ্কাল দোসরা কঙ্কাল খুঁজতে যাচ্ছে। সে এইসব ভেবে হাত-পা শক্ত করার ভঙ্গীতে শরীর টানা দিল, তারপর চোখ দুটোকে জোনাকি পোকার মত ছোট করে সে আঁধারে গেরুর পায়ের শব্দ শোনার চেষ্টা করল। গেরু আসছে এবং ওর পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। সে ফের হাঁটতে থাকল। আঁধারে চলতে কষ্ট—তবু সে হাঁটছে। সে হ্যারিকেনের আলো ধরালে না। তেল-খরচের কথা ভেবে সে অন্তত বাবুঘাটের ডহর পর্যন্ত এই আঁধারে চলার জন্য মরিয়া হয়ে উঠল। সে আলো জ্বালল না অথবা গেরুকে আলো জ্বালতে বলল না।

সে হাঁটল। সে হাঁটছে। গেরু পিছনে—গেরু ওর ইচ্ছামত আসুক এই ভাবনা এখন কৈলাশের অন্তরে।

কৈলাশ যেতে যেতে কোঁচড়ের চালভাজাগুলো আঙুলে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখল এবং টিপে টিপে দেখল। কোঁচড়ের ভিতরে ইতস্তত কাঁচা লঙ্কার টুকরো ছড়ানো—কিছু কাঁচা পেঁয়াজের কুচি। একটা মাটির ভাঁড় কোমরের অন্য পাশটায় ঝুলছে। হাঁটবার সময় ভাঁড়টা দুলছে।

কৈলাশ এই আঁধারে ধুকুস ধুকুস করে চলছিল। জোনাকির চোখ নিয়ে সে এ-আঁধারেও চলতে পারে। অন্তত চলার চেষ্টা করে। এ-সময় ওরা বাবুঘাটের পারে এসে দাঁড়িয়েছে। চটানের আলো এখান থেকে আর দেখা যাচ্ছে না। শ্মশানের হ্যারিকনের আলোটা ওরা দেখতে পাচ্ছে না। বাঁকের মুখে মাঝিদের পুরোনো আস্তানা হারিয়ে গেছে। নদী এখানে বাঁক নিয়েছে। নদী

এখানে বাঁক নিয়ে প্রচণ্ড গতিতে পদ্মার দিকে উজান উঠে গেছে। দুপাশে সেই ঘন ঝোপ—সেই বনকুলের অন্ধকার, সেই সোনা ব্যাঙের ঢিবি, খরগোশের গর্ত। ওরা আঁধারের ভিতর সব টের করতে পারছে। ওরা এখানে মুহূর্তের জন্য দাঁড়াল। প্রকাণ্ড ডহরটা ওরা পার হবে। আঁধারে পার হতে গেলে হুমড়ি খেয়ে পড়ার ভয় থাকে। সেজন্য বাপের কথামত গেরু মদের ভাঁড় মাটিতে রাখল। বল্লমটা নীচে রাখল। এবং হ্যারিকেনটা নীচে রেখে দেশলাই জ্বেলে আলো জ্বালল। কাঠিটা খস করে জ্বললে গেরু বাপের মুখ দেখল। বাপ গেরুর মুখ। গেরু বাপকে এখন চিনতে পারছে না। মুখটা ওর কেমন ভয়ানক হয়ে উঠেছে। কেমন ভয়াবহ। সে বাপের দুটো বেড়ালের মত চোখে শিকারের এক ভয়ঙ্কর ইচ্ছাকে দেখতে পেল। সে ডাকল, বাপ! চল বাপ! সে কেমন ভয়ে ভয়ে বাপকে কথাগুলো বলল।

কৈলাশ গেরুর কথা শুনল না অথবা শোনার ইচ্ছে ছিল না। গেরু হ্যারিকেন জ্বাললে হ্যারিকেনটা সে তুলে নিল এবং হ্যারিকেনটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল। সেই পুরোনো জং-ধরা ঢাকনা. সেই ফাটা চিমনি—কোনো পরিবর্তন নেই, অথচ ওর দেখার অভ্যাস। রোজ জ্বেলে একবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখবে হ্যারিকেনটা। অনেক কালের এবং অনেক পুরোনো বলে কৈলাশের মমতা হ্যারিকেনটার উপর খুব বেশী। এখনও সে ওর শরীরের মত এটাকে কোনোরকমে জিইয়ে রেখেছে। জিইয়ে রেখে পুরোনো স্মৃতির ঘরে সে অনেকক্ষণ কদম দিতে পারে। কৈলাশ তখন হেকিমী করত শহরের ফৌজদারী আর দেওয়ানী কোর্টে। দাওয়াই বিক্রির সময় চেঁচাত, পুন্ন-পদের মাদুলি! এ ঝাড়ফুঁক নয়. এ যাদুমন্তর নয়—এ আছে জুড়িবুটির কারবার—দবাগুণ। ডানপুকুসে টান মারে, তোষক করে, পীর-পরীতে নজর দেয়, বাণ মারে, এ-মাদুলি দেহে লিয়ে লিলে আসান পাবেন বাবুলোক—বহুত সামান্য দাম,

নিয়ে যান, বিবি-বুঢ্‌ঢার লাগি নিয়ে যান। এইসব বলে মাতুলি বিক্রি করে সে যখন চটানে ফিরত তখন রাত হত গভীর। কৈলাশ সাপখোপের ভয়ের জন্য বিপদে পড়ে এই হ্যারিকেনটা কিনেছিল। আর হ্যারিকেনটা যত পুরোনো হল, যত দিন গেল চটানে, যত সে অক্ষম হয়ে পড়ছে, তত হ্যারিকেনটার উপর ওর মমতা বাড়ছে।

এ-সময় গেরু ছুটো বিড়ি বের করে বাপকে একটা দিল, নিজে ধরাল একটা। ওরা দুজন বিড়ি খেতে খেতে ফের পথ চলতে থাকল।

অনেকগুলো পরিচিত ঝোপ পার হয়ে কৈলাশ অন্য একটা ডহরের পারে এসে থামল। শহরের নালা নর্দমার জল এই ডহর ধরে গঙ্গায় গিয়ে নামে। কৈলাশ ডহরের পারে অন্য দিনের মত আজও উকি মারল। লাফ দিয়ে পার হতে পারবে কিনা দেখল। শেষে গেরুর হাতে হ্যারিকেন দিয়ে ব্যাঙের মত হাতে-পায়ে লাফ দিয়ে ওপারে পড়তে চাইল। পড়ল, হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ভিজে ঘাসের জলে ওর শরীর ভিজে উঠল। শীত-শীত রাতে শীতের ভারে সে তখন কুঁকড়ে উঠেছে। সে যেন নড়তে পারছে না। শীতের কুকুরের মত সে আর্তনাদ করতে চাইছে। বাপের এইসব ভাব দেখে গেরু হেসে বাঁচে না। রাগে দুঃখে কৈলাশ গালমন্দ দিল গেরুকে। নীরস এই মাটিকেও সে ছেড়ে কথা বলল না। খিস্তি করল। সব আক্রোশ ওর এই মাটির উপর, এই ডহরের উপর।—শালী হামার! শালীর বুক-পিঠ গেন-গম্যি না হল। বুড়া জান—ছুট করে পড়লে খুট করে মরবে। মরা কৈলাশ বিচে খালাস পাবে গেরু। গেরুর দিকে কৈলাশ কড়া নজরে চাইল—যেন গেরুকে সে এখন বিশ্বাস করতে পারছে না, যেন গেরু এখুনি কৈলাশের কঙ্কাল নিয়ে জগুবাজারে হিল্টন কোম্পানির বড়বাবুর কাছে ছুটবে। সে ফের গাল দিল—শালা হামার বাচ্চা কোন বলিছে! বেতমী শালার মুখে দানা খামোকা দিলাম।

ততক্ষণে গেরু লাফ দিয়ে ডহর পার হয়েছে। বাপকে মাটি থেকে তুলেছে এবং বলেছে. তু গিরে গেলি তো হাম কিয়া করে! হামার হাসি ভি পেল, লেকিন হাম কিয়া করে! হামার কি কসুর আছে তু বুল।

নদীর পাড় ধরে চলার সময় গেরু বলল, চোট লাগল না তো রে বাপ!

কৈলাশ উত্তর না করে হাঁটছে। সে যেন অন্যমনস্কভাবে হাঁটল। কিন্তু কিছু দূর এসে কি ভেবে বলল, লাগেনি। লাগবে ক্যানে! ঝাড়ফুঁক জুড়িবুটির পুন্নপদের মাছুলি হামার দেহে কতকাল ধরিয়ে বেঁইধে দিয়েছি। দশকুড়ি দশটা দব্যগুণ আছে ওয়াতে। তুরে ভি বেঁইধে দিয়েছি। পীর-পরীর নজর, ভূত-পেঁতের শ্বাসে তুরে ভি খাবে না। এইসব কথা বলতে গিয়ে ওর গলা শুকিয়ে উঠছে! সে ঢোঁক গিলল। সে এই শীতে পারলে জল খেত। সে এই শীতে পারলে এখুনি বসে ভাঁড়ের সবটুকু মদ টেনে নেয়। সে কোঁচড়টা টিপে টিপে দেখল। আছাড় পড়ে সব আবার পড়ে গেছে কিনা দেখল। কোমরের ভাঁড়টা ভেঙেছে কিনা দেখল। ভাঁড়, কোঁচেড়র চালভাজা, কাঁচালঙ্কা, পেঁয়াজকুচি সব ঠিক আছে দেখে সে খুশী হল। এই সব ভাবতে গিয়ে দেখল কৈলাশের গলাটা নিজে থেকেই ভিজে উঠছে। জিভে লালা জমছে। সে তার ডানহাতের শড়কিটা বাঁ হাতে নিয়ে বলল, এ বছরে জাড় যেয়েও যেছে না রে!

চলতে চলতে কৈলাশ ভাবল—কঙ্কাল টেনে তুলতে আরো কিছুদিন বাকি। সে ভাবল—ফরাসডাঙার কোন জঙ্গলে মড়াটা পুঁতল! বেওয়ারিশ মড়ার হদিস নিতে কত সময় নেবে, কত সময় ওরা সেখানে পৌছবে এই চিন্তায় কৈলাশকে খুব বিষন্ন দেখাচ্ছে।

সহসা আঙুলের উপর কৈলাশ কড় গুনল। সে খুশী হল। গেরুকে হাত নাচিয়ে বলল, বাঁচোয়া। দু দফে পানি ঢাললে জায়দা লাগে তো দশ রোজ।

গেরু সকল কথায় কান দিতে পারছে না। ভয়ে কিছুটা সে আড়ষ্ট। সে এখন আগে আগে চলছে। জীবনে প্রথম কঙ্কাল খুঁজতে এসে ওর ভয় ধরেছে। ভয়ের কথা বাপকে বলতে পারছে না। বাপ এখুনি তবে গোসা করবে, গালমন্দ দেবে। এতদিন বাপ একা এসেছে। আজ ওরা দুজন। এতদিন বাপ কঙ্কাল কুড়িয়ে চটানে শুধু গেরুকে গল্প করেছে, ওর ভয়-ডর ভাঙানোর চেষ্টা করেছে—আজ ওরা দুজন। এতদিন বাপ কসরত দেখিয়েছে তাবিজের, শরীরের—আজ ওরা দুজন। সুতরাং ভয়-বিস্ময়ের কিছু নেই। এখন কিছু বললেই বাপ চেঁচিয়ে জঙ্গল মাথায় করবে—বলবে, বেইমান, গোলামের বাচ্চা, তু ভাগ হিঁয়াসে!

কৈলাশ বলল, তুকে লিয়ে এলাম গেরু! বলা তো যায় না বাপজী ঠাকুরের কখন কি মরজি! হামি মরে গেলে তুকে কোন দেখবে। সে যেন এই বলে গেরুকে অজুহাত দেখাল।

গেরু আগে আগে হাঁটছে। বাপকে ভূতের মত মনে হচ্ছে। এখন মদের ভাঁড়ের ভিতর শড়কি—কাঁধের উপর ভাঁড়। ওরা আঁধার ভেঙে, ঝোপ-ঝাড় ভেঙে চলছে তো চলছেই। রাতে এ পথ গেরুর ভয়ানক দীর্ঘ মনে হচ্ছে। পথ দীর্ঘ বলে এবং ভয়াবহ বলে সে নেলীকে ভাববার চেষ্টা করছে। নেলীকে ভেবে ভয়ের কথা ভুলতে চাইছে, অথবা নেলীকে গভীরভাবে ভালবাসতে চাইছে।

কৈলাশ আর গেরুর ব্যবধান এখন বেশ ফারাক। গেরু রয়েছে সামনের পিঠুলি গাছের নীচে, আর বুড়োটা রয়েছে নিজের হ্যারিকেনের আলোয়—শিরীষ গাছের নীচে। বাচ্চাটা এখন বড় হয়েছে, যোয়ান হয়েছে। বড় বড় পা ফেলে সে এখন হাঁটে। বুড়ো কৈলাশের যোয়ানকি গেছে, হেকিমী জীবনের জয়-জয়কার গেছে, সুতরাং সে হাঁটে আস্তে। যত সে বুড়ো হয়েছে—পা দুটো, কোমরটা, বুকটা তত সরু হয়েছে। তত সে চলতে পারছে না, তত ওর নিজের উপর, শরীরের উপর, কবচ-ওবচের উপর বিশ্বাস ভাঙছে। তত সে গেরুকে কাছে টানতে চাইছে এবং ব্যবসা

শেখাবার সব রকমের ফন্দি-ফিকির আঁটছে। এইজন্যই সে বেওয়ারিশ মড়াটার জন্য এতটা পথ ছুটে এসেছে। সে যেন আর এই শরীরের উপর ভরসা পাচ্ছে না।

শরীরের দিকে চাইলে এখন ওর নিজেরই কেমন সরম আসে। ভাঙা আরশিতে মুখ দেখার স্বভাব কৈলাশের এখনও আছে। যখন শেষ পক্ষের বৌটা বেশী উতলা হয়, বেশী ঘর-বার হয়, তখন কৈলাশ আরশি নিয়ে দাওয়ায় বসে, আর গোফঁ টেনে টেনে বড় করে। তখন সে তার হাজা-মজা মুখটার দিকে তাকিয়ে ভেংচি কাটে। বলে, বাহবাঃ, বাহবাঃ, কৈলাশ তুর, যোয়ানকি তবে গিল রে! তোর বহু এখন ঘর-বার হল রে। বাহবাঃ, বাহবাঃ, কৈলাশ! আরশির মুখটা তখন ওকেও ভেংচি কাটে, যেন বলতে চায়—মর, মর, মরে চটান খালাস কর।

কৈলাশ বড় করে মাথায় পাগড়ি বেঁধেছে। মাথার টাক ঢেকেছে। তবু চলতে চলতে ওর মনে হচ্ছিল পাগড়ির ভিতর দিয়ে টাকে ঠাণ্ডা হাওয়া ধাওয়া করছে। সে মাথার পাগড়িটা কষে বেঁধে নিল কতকাল আগের মত। তখনও সে কোর্টে হেকিমী করত। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাতের সরু লাঠিটা চটের উপর পড়ে থাকা জুড়িবুটির উপর ছুঁইয়ে দিয়ে বলত, রাজধনেশের ঠোঁট, কাকধনেশের পালক, আওর ময়নাধনেশের তেল শিরমে তুদফে দিয়ে লিন বাবুলোক—মাথার রোঁয়া একগাছা উঠে তো হামার ওস্তাদের কসম। তখন কৈলাশ মাথায় টুপি দিয়ে টাকটা ঢেকে রাখত।

কিছু সাহস সঞ্চয় করে দূরে গেরু হাতের উপর বল্লম উচিয়ে হাঁকরাল, কি রে বাপ, তু হাঁটতে লারছিস?

কৈলাশ ধমকে উঠল, লারছি, লারছি। লারছি তো তুর বাপ এত পথ চলিছে কি করে! রোজল জঙ্গলে গিল কি করে?

গেরু আরও এক কদম হেঁটে পথের মোড়ে এসে দাঁড়াল।

বাপ এগিয়ে আসছে। আলোটা তুলছে হাতে। বাপ জমি ভেঙে উপরে উঠল। যে পথ নদীর পাড়ে পাড়ে নবাবের রাজধানী পার হয়ে আরও উত্তরে গিয়ে পদ্মায় মিশেছে, সে পথ না ধরে ফরাসডাঙার পথে পড়ল। অন্য পথটা ডানদিকের জল-কল ঘেঁষে প্রাচীন ইংরেজ-কুঠির দিকে রওনা হয়েছে। গেরু এই পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে বাপকে উঠে আসতে দেখল, জল-কলের আলো দেখল, দূরের ফরাসডাঙ্গার ছায়া-ছায়া অস্পষ্ট জঙ্গল দেখল।

কচ্ছপের মত কৈলাশ গুড়ি গুড়ি হাঁটছে। সে হ্যারিকেনের আলো এবং তেল বাঁচিয়ে হাঁটছে। জোরে সে হাঁটতে পারে না। ইচ্ছা করলেও না। অথচ গেরুকে বলবে, জলদি হাঁটলে হ্যারিকেনের তেল উপরে উঠে আসবে। আলো নিভবে। অন্ধকার পথে চলতে কষ্ট হবে অথবা আর একটা দেশলাইর কাঠি জ্বালতে হবে।

বাবুঘাট থেকে এই পথের মোড় পর্যন্ত রাঁস্তা অত্যন্ত খারাপ। পথ উঁচু-নীচু, ভাঙা। গরুর গাড়ির চাকার দাগগুলো রাতে সাপের খোলসের মত মনে হয়। মনে হচ্ছে। যত আঁধার হয়, যত আলোর জোর কমে, তত সাপের খোলস গুলো স্পষ্ট হয়ে উঠে। তত কৈলাশ হোঁচট খায় বেশী, তত ওর খিস্তি করার সখ বাড়ে। সুতরাং এই পথটুকুই কৈলাশ অত্যন্ত সন্তর্পণে হাঁটে। কারণ অধিকাংশ সময় সে বেসামাল হয়ে পড়ে।

এবার ওরা পূবদিকে চলল। এই পথও গেছে নবাবের রাজধানীতে। এ-পথ যেমন উঁচু, তেমনি কুমীরের পিঠের মত অমসৃণ। জল-কল ডাইনে ফেলে পথ কেবল জাফরীকাটা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ছুটেছে। পথের দুপাশে রয়েছে রাজ্যের অনাবাদী জমি। ছোট ছোট বাচ্চা ছেলের কবর। নারকেল গাছ, হিজলির বন, কাশফুলের জঙ্গল। নীলকুঠি সাহেবদের ভাঙা

বাড়ী। জায়গায় জায়গায় পথ ভেঙে গেছে, ধ্বসে গেছে। ওরা এই পথ ধরে হাঁটছে। রাত ঘন বলে কোনো জনপ্রাণীর সাড়া ওরা পাচ্ছে না। শুধু জল-কলে ইতস্তত দুটো-একটা আলো জ্বলছে। ভট্‌ ভট্‌ শব্দ হচ্ছে এঞ্জিনের। সদর দরজায় দারোয়ান কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। ভস ভস করে তার নাক ডাকছে।

এ-সময় কৈলাশ কাশল। জল-কলে শব্দ হচ্ছে। কাশির আওয়াজে জল-কলের দালানগুলো যেন নড়ছে। এত নিঃশব্দ, নিঃসঙ্গ এইসব মাঠ, ঝোপ, জঙ্গল যে, কৈলাশ জোরে কাশতে পারল না পর্যন্ত। সে যতটা পারল কাশিকে প্রশমিত করে ঢোঁক গিলে হাঁটতে থাকল।

ওদের এখন সামান্য পথ হাঁটতে হবে। এই সামান্য পথটুকুই খুব ভয়াবহ। এখানে ঝোপ-জঙ্গলগুলো পথের উপর হুমড়ি খেয়ে আছে। সাপখোপের এক্তিয়ার এটা। দক্ষিণে প্রকাণ্ড ঝিল, জগৎশেঠের বিখ্যাত সিঁড়ি। শেঠ পরিবারের ভাঙা পুরোনো পাঁচিল। ঝিলের ভিতর সব পুরোনো কেউটে সাপ। কেউ বলে জগৎশেঠের আমলের ওরা। ক্ষের ধন আগলাচ্ছে ফরাসডাঙায়। উত্তরে প্রকাণ্ড খাল। খালে জলো ঘাস দেখে চটান বলে মনে হয়। আঁধারে সাপখোপ, শেয়াল-খটাশ জলো ঘাসের ভিতর দিয়ে শেঠদের ভাঙা পাঁচিলের অন্য পাশে উঠে রাতের কান্না কাঁদে। হঠাৎ শুনলে মনে হবে অনেকগুলো পুরোনো আমলের প্রেতাত্মা হাল আমলের নসিব দেখে কেঁদে তামাসা দেখাচ্ছে। অথবা কেঁদে-কেটে অস্থির হচ্ছে।

খালের পাড় ধরে পায়ে-চলা সঙ্কীর্ণ পথ। ফণীমনসার কাঁটা পথের দুপাশে। রাতের শিশিরে ওরা ভিজছে। এবং এটাই ফরাসডাঙার পশ্চিম সীমানা। দক্ষিণে শহর, উত্তরপ্রান্তে ঝিল। পুবে রেল লাইন। ইতস্তত আম-কাঁঠালের গাছ সব -অন্ধকারে তারা আচ্ছন্ন, ঝিমুচ্ছে।

নীচে নামার আগে হ্যারিকেনের পলতেটা একটু উস্‌কে দিল। এখানে হ্যারিকেনের আলোটা যত জোরেই জ্বলুক না কেন—কৈলাশ পরিতৃপ্ত হয় না। সে যতটা পারল আলোটা বাড়িয়ে দিল। এখানে ওর কেবলই মনে হয়—সে কালকেউটে কিংবা পদ্মনাগিনীর উপর এই বুঝি পা-টা চাপা দিল। মনে হয় এই বুঝি ওরা কামড়ে দিল।

দূরে জল-কলের আলোটা ঝোপের আড়ালে এখনও যেন দাঁত বের করে হাসছে। ঝোপঝাড়ের ভিতর থেকে ভাঙা কাঁসরের শব্দ উঠছে ঝিঁঝিঁ-পোকার। ঝোপে-জঙ্গলে জোনাকি উড়ছে। ওরা ঝোপ থেকে অন্য ঝোপে ছিটকে পড়ছে এবং এই ফরাসডাঙার জঙ্গলকে যেন চিতার ফসল করে রেখেছে। কৈলাশ সেই সময় হেঁকে উঠল, ওস্তাদ গুরুর দোহাই, মা মনসার দোহাই, শিবরাজের দোহাই—দোহাই ধন্বন্তরী ওঝার!

পিছনে গেরু হাতের বল্লম উচিয়ে বলল, কি হল রে বাপ?

গেরুর মুখের কাছে হ্যারিকেন তুলে বলল কৈলাশ, মা মনসার বাহন। গন্ধ পেইছিস না? ঢেঁকুর তুলে গন্ধ দিল। ঝোপে-ঝাড়ে কোথাও লুকিয়ে রইল নিশ্চয়।

ওরা দুধারে নজর রেখে চলেছে তখন। ঝোপ-ঝাড়ের নীচে বল্লম ঢুকিয়ে খুঁজে খুঁজে দেখছে—মরা মানুষটাকে কোথায় মাটি-চাপা দিয়েছে। মাঝে মাঝে কৈলাশ শ্বাস টানছে জোরে। গন্ধ নিচ্ছে এবং পরীক্ষা করছে শরীরটা মাটির নীচে পচে কোনো গন্ধ তুলছে কিনা!

—শালারা! কৈলাশ বিড় বিড় করে খিস্তি করল। —কোথায় রেখে গেল মড়াটা! পুঁতল কোন মাটির নীচে? ক্যাবলারা!

গেরু কাঁধের ভাঁড় হাতে নামাল। তারপর সে-ও বাপের অনুকরণ করে হাতের বল্লমটা জঙ্গলে ঢুকিয়ে দিল। দেখলে বেওয়ারিশ মড়াটাকে কোথায় কোন জঙ্গলে ফেলে গেছে।

রেল লাইনের ওপাশ থেকে কতক জাফরানী রঙের আলো পাতার অন্ধকার চিরে ওদের শরীরের ওপর পড়ছে সেই সময়। চাঁদের মরা মুখটা দেখার জন্য কৈলাশ ঝোপের ভিতর থেকে উঁকি মারল। গেরু তখন বলল, কি দেখছিস বাপ? কৈলাশ গেরুর কথার জবাব দিল না। সে ঘন ঝোপের ভিতর দিয়ে উঁকি মারছে আর ফোঁস ফোঁস করে উঠছে। বলছে—শালারা! কোন তেপান্তরে পুঁতে গেলি রে শালারা! খটাশ-শেয়ালের খাবার করে দিলি।

রেল-সীমানার শেষে আকাশ, চাঁদ এবং গ্রহ-নক্ষত্রের ছবিটা সহসা ভাল লাগল গেরুর। বুঝি নেলীর মুখ মনে পড়ল। নেলীর মুখটা দেখতে দেখতে পাঁশুটে হয়ে গেল। মরা মানুষের মুখের রঙের মত। সুতরাং গোমানী ডোমের মেয়েটাও মরবে একদিন। তখন পুঁতে পচাবে কি ঘাটে আগুন জ্বালাবে, আজ যেন ঠিক করতে পারছে না। মেয়েটা হয়ত বাপের সঙ্গে এখন মাচানে ঘুমুচ্ছে। অথবা ভাঙা চালের ফাঁকে আকাশ দেখছে। নেলীর এ সময় এ মুখ বড় অদ্ভুত। ভয়ানক বিস্ময়ের। গেরুর মনে এ-সময় সুখ জাগে। নেলীকে নিয়ে ঘাটের আঁধারে নামার সখ হয় তখন। বেয়াড়া রকমের একটা ইচ্ছা ওকে কেবল তাড়না করে মারে।

কৈলাশ তখন হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে বেঁচে গেল। সে শুনল—সে শুনতে পাচ্ছে। শেয়াল-খটাশের শব্দ সে শুনতে পাচ্ছে। ওরা কোথাও যেন মড়ার শরীরটা চষে খাওয়ার জন্য নিজেরা ফাটাফাটি করছে। কৈলাশ ছুটল। সে পাগলের মত ছুটছে। ওর ভয়ে দুটো শেয়াল ঝোপ থেকে নেমে অন্য ঝোপে চলে গেল। গেরু বাপের পিছনে ধাওয়া করছে। কিন্তু খালে নামতে গিয়ে গেরু আর নামতে পারছে না। কারা যেন ওর আশেপাশে গোঙাচ্ছে। কারা যেন ওর আশেপাশে ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলছে। শেঠদের ভাঙা পাঁচিলের ওপাশে কারা যেন দৌড়ে

পালিয়ে যাচ্ছে। অথবা দূরে ভাঙা কুঠি-বাড়িতে কেউ যেন গলা টিপে মানুষ হত্যা করছে। গেরুর চুলগুলো ভয়ে শক্ত হয়ে গেল। সে থামল। সে দাঁড়াল। সে চলতে পারছে না। আর সেই দেখে কৈলাশ খিস্তি করল ·হ্যাঁ রে বেটা, তুরে তো হাম বহুত দফে বলিয়েছে, জীনপরী, সাপখোপ, ভূত-পেঁত কেহো তুর গা ছুঁতে লারবে। তুর দেহবন্ধন করে দিছি যে গ। তারপর কাছে গিয়ে ওর শরীর ঝাঁকিয়ে বলল, ওগুলো মানুষের ডাক লয়, ভূত লয়, ওগুলো পেঁচার, শেয়াল-খটাশের জাত। তু হেঁটে আয়। জলদি আয়।

গেরু কিছু বললে না। বাপ যেন ওর উপর তন্তর-মন্তর করল। বাপ যেন ওকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সে সামনে এগিয়ে যেতে থাকল। হ্যারিকেনের ফ্যাকাশে আলোতে শেঠদের ভাঙা পাঁচিল, ভাঙা কুঠি সব এখান থেকে সে দেখতে পাচ্ছে। সে ভয়ে ভয়ে কৈলাশকে বলল, লক্ষ্মীপেঁচা না কালপেঁচা বাপ?

—হবে একটা। তু চল। পথ চল। শেষে কি ভেবে সে নিজেই হ্যারিকেনটা নিয়ে ছুটতে থাকল এবং বলতে থাকল, গেরু ছুটে আয় বাপ, জলদি আয়। জলদি পা চালা। সব্বনাশ করে লিল রে, সব্বনাশ করে লিল।—শালারা! ভয়ে গেরুর হাত থেকে বল্লমটা খসে পড়ল। কোনোরকমে গোঙাতে গোঙাতে সে বলল, কি হল রে বাপ! কিছু দেখে লিলি রে? জীনপরী, সাপখোপ কিছু? হায়, হায়, কিছু দেখে লিলি রে? কিন্তু কৈলাশকে দূরে চলে যেতে দেখে ওর ভয় আরও বাড়ল। বাপের কোনো জবাব না পেয়ে ওর পা দুটো যেন খালের কাদায় ডুবে যাচ্ছে। সে যেন ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছে। সে চীৎকার করে বলল, বাপ, হামার পা চলতে লারছে।

—না চলুক্ত। মর শালা। বেটা কেবল ভয়ে মরে গ। কৈলাশ এই সব কথা বলতে বলতে পোড়োবাড়িটার দিকে ছুটছে। হাতে ওর হ্যারিকেনটা তেমনি দুলছে। মদের ভাঁড়টা টলছে। বল্লমটা

ঢেউ খেলিয়ে চলছে বাতাসের ভেতর। একটা ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে বলল, হে-রে, শুনতে লারছিস, শেয়াল-খটাশগুলো বনকাঁঠালের ঝোপে কেমন দুশমনি করছে। লিশ্চয় মানুষটাকে ওখানে পুঁতল। তু আয়, পা চালিয়ে আয়, লয়তো শেয়াল-খটাশ ভাগ বসাবে।

শেয়াল-খটাশ ভাগ বসাক এ ঠিক নয় গেরু বোঝে। আর এও বুঝতে শিখেছে কঙ্কালটা ঘরে অক্ষত নিতে পারলে দাম ওর অনেক হবে। সে তাই মাটি থেকে বল্লমটা কুড়িয়ে পোড়োবাড়িটার দিকে ছুটছে। খালের মাটি ওর আর পা টেনে ধরছে না। সে পোড়োবাড়ির পাঁচিল ঘেঁষে চলছে। জাফরীকাটা সব বন-লতার জঙ্গল ডিঙিয়ে কৈলাশকে অনুসরণ করছে। কিন্তু পোড়োবাড়িটার কাছে আসতেই এবং কবরের নীচে মরা মানুষটার ছবি ভাবতেই শরীরটা শিউরে উঠল। মাথার চুলগুলো সজারু-কাঁটার মত আকাশমুখো হয়ে দাঁড়াল। ভয়ে বিস্ময়ে হাতের বল্লমটা বাতাসে উঁচিয়ে চীৎকার করে বাপের মত বলে উঠল, ওস্তাদ গুরুর দোহাই! এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে হল সব ভয়টা ওর কেটে গেছে। সে এই জঙ্গলের মানুষ হয়ে গেছে। অথবা মড়া খোঁজার মানুষ হয়ে গেছে। সে নির্ভয় হতে পেরে বলে উঠল, বাপ হাম তো তুর মত হ গেলাম। কোনো ভয়-ডর আওর না থাকল।

শেয়াল-খটাশগুলো মানুষের শব্দ পেয়ে সরে গেছে। এইবার গেরু আর কৈলাশ কবরের ঝুরঝুরে মাটির বুকে উপুড় হয়ে পড়ল। এবং অনেকগুলো আঁচড় দেখল। শেয়াল-খটাশের এইমাত্র দুশমনি করে সরে যাওয়ার চিহ্ন দেখল। কিছু সময় মাটি সরাতে পারলে মরা মানুষটার দু'টো পা উপরে উঠে আসতে পারত। তার আগেই চটানের মানুষ দুটো বাতাসের গন্ধ নিয়ে বুঝতে পেরেছে মড়াটা পচতে আর কত দিন, কত সময়।

বনকাঁঠালের ঝোপে দাঁড়িয়ে সুখী কৈলাশ হি হি করে হেসেছিল। হাসবার সময় দুটো দাঁতের ফাঁক দিয়ে লালা ঝরল।

সে ঢুলতে ঢুলতে বলল, শেয়াল-খটাশ লাগাল পেল না রে মড়াটার। মড়ার খবর ওরা জানতি না জানতি হামি তু দো শেয়াল হাজির হ গেলাম। সে হাসতে হাসতে কথাগুলো বলল। যখন সে কথা বন্ধ করল তখন শুনল গেরু, পোড়োবাড়িটাতেও কারা যেন কৈলাশের মত হি হি করে হাসছে। হেসে তামাশা করছে ওদের সঙ্গে। কৈলাশ ব্যাপারটা বুঝতে পেরে গেরুকে বুকের কাছে টেনে আনল। এবং বলল, ডর কিসের রে বাপ! তু আর হামি আছে, বাপ-বেটে আছে, তবে আর ডর কিসের? ভূত-পেঁত, পীর-পরার নজর, মড়ার হজমী সব আছে তোর বাপের কাছে। তারপর গেরুকে আরও বুকের কাছে চেপে বলল, তুর কোনো ডর থাকার কথা লয়।

কৈলাশ গেরুকে কবরের পাশে বসিয়ে বলল, এ কাম করে খেতে পারলে চটানে তুকে ভুখা থাকতে হবে না। জগুবাজারের হিল্টন কোম্পানির বাবু থাকলেন, আর থাকল মুর্দার হদিস। এমন কি বাপ তুর মর যায় তো বাপের কঙ্কাল ভি বিচতে পারবি। বিচে পয়সা কামাতে পারবি।

কোমর থেকে পুঁটলি খুলে কবরের পাশে রাখল কৈলাশ। মদ খাওয়ার ছোট ভাঁড়টা পাশে রাখল। মুখ ঘুরিয়ে গেরুকে দেখে নিজের চোখ দুটোকে ফের টান টান করল।

গেরু মদের ভাঁড়টা বাপের কাছে এগিয়ে দিল। কৈলাশ দু গেলাস মদ ঢেলে প্রথমে নিজে খেল, পরে গেরুকে এক গেলাস মদ ঢেলে দিল। পুঁটলিটা খুলে কিছু চালভাজা খেল, কিছু কাঁচা-পেঁয়াজের কুচি, কিছু কাঁচা লঙ্কার কুচি খেল। ফের মদ খেল। মদ খেয়ে শরীরে রস জমাতে চাইল। শরীরে আসক আনতে চাইল মুর্দা পাহারা দেওয়ার জন্য। দুহাতের ওপর শরীরে ভর দিয়ে কৈলাশ বলল, খুদে দেখবি লাকি রে তু, লাসটার বত্তিসটা দাঁত থাকল কি থাকল না। খুদে একবার দেখলে চলত।

কৈলাশ বল্লমটা হাতে নিয়ে তিনবার পাক খেল কবরটার চারপাশে। সে মড়াটাকে মন্তর-তন্তর দিয়ে বাঁধল। মড়াটার

ভিতর আর শয়তান ঢুকতে পারবে না। সে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়তে থাকল এবং থুথু ছিটাতে থাকল কবরটার ওপর। শেষে নিজের বুকের ওপর একদলা থুথু দিয়ে বুকটা মালিশ করে দিল। গেরুর বুকেও মালিস দিয়ে সে বল্লমটা নিয়ে মাটি খুঁড়তে বসল। কবর খুঁড়ে মড়ার মুখ দেখার ইচ্ছে। মড়ার বশত্রিটা দাঁত দেখার ইচ্ছে।

এই আঁধারে, ঝোপ-জঙ্গলের নিঃসঙ্গতায়, হ্যারিকেনের অস্বচ্ছ আলোয় কৈলাশকে পৃথিবীর মানুষ বলে মনে হচ্ছে না। বাপের শয়তানের মত মুখটা দেখে গেরুর ফের ভয় ধরেছে। শয়তানটা মড়ার ওপর ভর না করে বাপের ওপর যেন ভর করেছে। কিংবা এতক্ষণ তন্ত্র-মন্ত্র পড়ে বাপ শয়তানকে নিজের কাঁধেই ভর করিয়েছে যেন।

গেরুর এ-সময় ইচ্ছে ঝোপ-জঙ্গল ভেঙে চটানের দিকে ছুটতে। ইচ্ছে হচ্ছে বাপকে একা ফেলে সে অন্য কোথাও চলে যায়। সে এতদিন শুনে-শুনে ভেবেছিল খুব সহজ, ভেবেছিল বাপের মত সে-ও মরদের বাচ্চা, তখন ভয় থাকার কথা নয়। কিন্তু এইসব দেখে ওর মনে হল, সে শয়তানের রাজত্বে চলে এসেছে। বাপ এখানে শয়তানের বান্দা সেজেছে। যেন বাপ ষড়যন্ত্র করে ওকেও খুন করতে এনেছে এ জঙ্গলে। সে উঠে ছুটতে যাবে এমন সময় দেখল কৈলাশ পিছন থেকে ওকে ধরে রেখেছে।—ভয় না পাস বাপ, ভয় না মান। কৈলাশ গেরুকে টেনে বসাল। গেরু বাপের হাতে কলে-পড়া ইঁদুরের মত হয়ে বাপের পাশে বসে পড়ল।

কবরের ওপর মাটির ডেলা ডেলা চাঙড়। সুতরাং আপাতত সেগুলো না খুঁড়লেও চলে। গেরু একটা একটা করে মাটির ডেলা তুলতে থাকল। কৈলাশের ধমকে গেরুর হুঁশ হল।—হে রে বেটা, বুকের মাটি ফেলছিস ক্যানে ? তু কি লাশটার বুক দেখবি ?

অনেকক্ষণ পর কৈলাশ হাত দুই নীচে মড়ার মাথাটা পেল। কৈলাশ নীচে হাত বাড়িয়ে দিল। এবং বলল, শালার সময় অসময় লাইক ! ঢুকুস ঢুকুস কেবল মদ গিলছে।

ঘাড় কাত করে গেরু জবাব দিল, খবরদার বাপ, তু হামারে শালা শালা বুলবি না। শড়কির ঘায় তর পেট ফুঁসে দেব।

অন্য সময় হলে দক্ষযজ্ঞ শুরু হয়ে যেত—কিন্তু এখন কৈলাশের সে সব হচ্ছে না। এখন কৈলাশের দক্ষযজ্ঞ করার মত ফুরসত কম—হে রে বেটা দেখ, আলোটা লিয়ে এসে দেখ, মানুষটা মেয়েমানুষ রে। লাকে ওয়ার লাক-ছাঁবি আছে।

গর্তের ভিতর কৈলাশের হাতটা তখনও ঢোকানোই আছে। তখনও কৈলাশ আন্দাজে ভারী ভারী ঠোঁটের ভিতর দাঁত গুণছে। দাঁত বত্রিশটা থাকল কি থাকল না দেখছে। যখন দেখল বত্রিশটা দাঁতই আছে তখন খুশী-খুশী হয়ে বলল, দাঁতগুলো সবই ঠিক আছে রে বেটা।

কৈলাশ হাতটা তুলে আনলে গেরু হ্যারিকেনের আলো গর্তের ভিতর নামিয়ে দিল। অনেকক্ষণ ধরে মড়াটা দেখল। দেখে গম্ভীর হয়ে গেল। মেয়েমানুষটার মুখে মাটি পড়ে ঠোঁট দুটোর রঙ ধূসর। ঠোঁটগুলো পটলের মত ফুলে উঠেছে। ডাইনে নাকটা ঝুলে আছে। চোখ দুটো ফেটে গেছে। দাঁতগুলো অত্যন্ত উঁচু উঁচু দেখাচ্ছে। যেন জীবন্ত কঙ্কাল হয়ে আছে মেয়েমানুষটা। গেরু ভয়ে শেষ পর্যন্ত মুখটা তুলে আনলে। সেই সঙ্গে একটা মুখের রঙও উঠে এল। সে মুখ নেলীর। গেরুর ভয়ানক কষ্ট হতে থাকল।

মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে গেরুর। ওর ভাল লাগছে না, ভাল লাগছে না এসব। বাপ দু হাতের ওপর ভর দিয়ে দুলছে তো দুলছেই। একটা রাতের পোকা কৈলাশের ঠোঁট বেয়ে ক্রমশ ওপরে উঠছে। সে মুখের ওপর হাত লপ্‌টাচ্ছে অথচ পোকাটাকে ধরতে পারছে না। পোকাটা ছুটছে। কৈলাশের হাত কাঁপছে। সে তবু ধরতে পারল না। পোকাটা কানের পাশ দিয়ে পিঠে নেমে যাচ্ছে। সে এঁবার উঠে দাঁড়াল। ধেই ধেই করে ঘুরপাক খাচ্ছে। পিঠের পোকা তাড়াতে চাইছে। তখন চোখের ওপর আকাশের তারাগুলো নাচছে মনে হল, অথবা নাচের আগে তাল ঠুকছে মনে

হল। নেশায় বুঁদ হয়ে বললে, হে রে, অমন না হলে তেমন হয়। বঙ্গালী বাবুরা কেমন কথা বুলে দেখতে লারিস? তবে হা, মেয়েমানুষটা কম বয়েসের হলে কেমন হত রে গরু বেটা শালা হামার। কৈলাশ এইসব বলে উপুড় হয়ে পড়ল কবরটার ওপর। দুহাতে পাশের মাটিগুলো টেনে কবরের মুখটা ভরে দিয়ে চালভাজার পুঁটলিটা টেনে নিল। হাঁফ ছাড়ল আবার। হাঁপের টান তুলল আগের মত। এবং কিছুক্ষণ দু ঠ্যাংয়ের ভিতর মুখ গুঁজে পড়ে থেকে বললে, খা, খেয়ে লে। খেয়ে খেয়ে পেট ভার কর শালা! আরাসে ঘুমিয়ে লে। ততক্ষণ তুর বাপ কৈলাশ পাহারায় থাক।

প্রায় বেশি রাতটুকু পাহারা দেবে কৈলাশ। শেষরাতে গেরু। বনকাঁঠালের শেকড়ে মাথাটা এলিয়ে দিল গেরু। ঘুমোতে চাইল, জোনাকিরা জ্বলছে। মশার কামড়ে ঘুম আসছে না। পাশে কবরটা। মেয়েমানুষটা সেখানে পচছে। মুখটা মনে পড়ছে গেরুর। যত মনে পড়ছে তত বিরক্তি বাড়ছে ওর। এককালে মেয়েমানুষটা বেঁচে ছিল। এক কালে নেলীর মত হয়তো বা খুবসুরত ছিল। সব ছিল, সব ছিল মেয়েটার। নেলীর মত লাফিয়ে লাফিয়ে চলত, কাপড় খসে পড়ত বুক থেকে—পাড়া-পড়শীরা দেখত টিক টিক করে। যেমন করে রামকান্ত নেলীকে দেখে বেড়াচ্ছে।

গেরু চটানের কথা ভাবল বনকাঁঠালের শেকড়ে মাথা রেখে। ঘাটোয়ারীবাবুর কথা মনে হল। সেই যে কবে কালো বার্নিস চেয়ারে বসেছেন, আজও বসে আছেন। মড়ার হিসাব রাখছেন কেবল—রসিদ দিচ্ছেন মরা মানুষের। দুখিয়া আর ওর বৌ চিরদিন ঘাটের ডাক নিয়ে কেবল মারধোর করেই গেল।

বে-ইজ্জতি লোক রামকান্ত। ব— বে-সরম। সুদে টাকা দেয় চটানে। বদলে সে চটান থেকে সুদ সহ অনেক কিছু নেয়। সে ইজ্জত নিয়ে টানাটানি করছে চটানের। সর্দার একবার চোখ খুলে পর্যন্ত দেখে না। সর্দার পর্যন্ত বে-এক্তিয়ার হয়ে পড়ল। একমাত্র নেলীকেই বুঝি এতদিন পাহারা দিয়ে

সে ঠিক রাখতে পেরেছে। এ-ব্যাপারে গোমানী খুব হুঁশিয়ার —কিন্তু লোকটা মদ গিলে যে ভাবে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকে, আর—ঘরে খাবার না রেখে মেয়েটার ওপর যে অত্যাচার করে, তাতে মনে হয় নেলীকেও বুঝি চটানের বে-ইজ্জতি জীবনটা ধীরে ধীরে নীচে টানবে।

গেরু ভাল করে চোখ বুজল। ঘুমনোর জন্য চোখ বুজল। কবরের নীচে মেয়েমানুষটার মত শক্ত হয়ে শুলো না, একটু ঘাড় কাত করে, কিছুটা ডানপাশ হয়ে ঘুমিয়ে পড়তে চাইল; কিন্তু সেই চোখে নেলী কেবল উঁকি মারছে। নেলীর মাচান, ওর ভাঙা ঘর, এ শয়তানের রাজত্বেও ওকে বিব্রত করে রেছে।

কৈলাশও শুয়ে আছে। গোসাপের মত হাত-পায়ের ওপর ভর করে শুয়ে আছে। মাঝে মাঝে গোসাপের মত মাথাটাকে একবার পূব, একবার পশ্চিম করছে। মাঝে মাঝে পচাই ঢেলে পচাই খাচ্ছে। কতকগুলো রাতের পোকা উড়ছে ওর মুখের চারধারে। ভাঁড় থেকে কিছু পচাই গড়িয়ে কবর ভিজছে। কৈলাশ ভাবল মাটির নীচে মেয়েটার পচাই খেতে সখ জাগছে, সেজন্য এক গেলাস মদ মাটির ওপর সে ঢেলে দিল। এবং এক সময় যখন বুঝতে পারল শরীরটা মদের নেশায় খুবই টলছে, খুবই অসহায় হয়ে উঠেছে, তখন বল্লমটা সে আরও শক্ত করে ধরল। দু আঙুলে একটা চোখ ফাঁক করে রেখে জেগে থাকার চেষ্টা করল, জেগে থেকে শেয়াল-খটাশ পাহারা দিল।

রাত যত বাড়ছে, হ্যারিকেনের আলো তত কমে আসছে। শেষ পর্যন্ত হ্যারিকেনটা নিভে গেল। অন্ধকারে কৈলাশ চোখ পরিষ্কার করল। চোখ-মুখ ঘষল। অন্ধকারকে ভাল করে দেখার ইচ্ছা। এবং শয়তানের রাজত্বে এই অন্ধকারটাকেই কৈলাশের যত অবিশ্বাস। বাধ্য হয়েই চোখ দুটো এ সময় যেন স্বচ্ছ হয়ে

ওঠে। অন্ধকারে সে ঠিক চিনতে পারে—কোন ঝোপে কোন শেয়াল উঁকি মেরে আছে।

কিছু দূরে কৈলাশ কোনো জন্তুর আওয়াজ শুনতে পেল। গোসাপের মত শরীরটাকে তুলে দিল কৈলাশ। কিছু দূরে পাতা খস খস করছে। গোসাপের মত শরীরটা টেনে টেনে চলতে চাইল সে। সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে কিসের আওয়াজ, কোনদিক থেকে আওয়াজটা আসছে, কতদূর পর্যন্ত যাবে।

আওয়াজটা ক্রমশ এগিয়ে আসছে। বনবেড়ালটা শুকনো পাতার ওপর পা ফেলে ক্রমশ কবরটার দিকে এগিয়ে আসছে। ঝোপের আড়ালে কৈলাশের চোখ দুটো জ্বলছে। বল্লমটা হাতে শক্ত হয়ে উঠছে। সে বল্লম টেনে বলল, আ যাও মিঞা, আ যাও। আ যাও বেটা, খুশিসে আ যাও। তুমকো হাম তো পিয়ার করেঙ্গে দোস্ত, জরুর করেঙ্গে। তারপর এক সময় বল্লমটা ছুঁড়ে দিয়ে খিস্তি করল—শালাসকল! কৈলাশ জন্মেছে ডোমের চটানে, তুই বেটা বনবাদাড়ে—তফাৎ কত বুঝলি না! আঁধার রাতে চুপি-চুপি হাতসাফাই চালাতে এলি!

মাটিতে বুক হেঁচড়ে দু কদম সামনে এগিয়ে গেল কৈলাশ। বলল, সামনের ঝোপটাকে উদ্দেশ্য করে, হে রে বেটা থামলি কেনে? কৈলাশকে ডরে ধরেছে? ও কিছু লয়, কিছু লয়। ওয়ার বুড়া জান, লুট করে পড়লে খুট করে মরবে। ওয়ার ডর কিসের! আ যাও মিঞা!

এই সব বলতে বলতে নেশার ঘোরে কিছুক্ষণ কাঁদল কৈলাশ। চটানের যত শোকের কথা মনে করে সে কাঁদতে থাকল। আবার নেশার ঘোরে সে খিল খিল করে হাসল। তখন চটানের যত সুখের কথা ওর মনে হল। জঙ্গলের জানোয়ারগুলো তখন পোড়োবাড়িটার পাঁচিল ঘেঁষে শিমুল গাছটার নীচে এসে থেমে গেছে। কৈলাশ যতই শোক করুক

কিংবা আনন্দ করুক, ওর চোখ সেখানে। সেজন্য অনেকগুলো চোখ শয়তানের রাজত্বে পরস্পর জ্বলছে।

হাঁটুর উপর হামাগুড়ি দিয়ে সে সামনের ঝোপটায় ঢুকে পড়ল। সে বল্লমটা খুঁজছে। বল্লমটা খুঁজতে গিয়ে সে ঝোপের আরও ভিতরে ঢুকে গেল। সে অনেকক্ষণ খুঁজে, হাতড়িয়ে বল্লমটা বের করল। তারপর শিমুলের নীচে সেই সব চোখকে উদ্দেশ্য করে বলতে থাকল, রাজবালা পাহাড়ে রাত কাটালাম, মুনমুন কাঠের লাগি ঘুরে মরেছি গারো পাহাড়ে, তুলোর পাহাড় দেখে লিয়েছি শ্বেত-শিমুলের গাছ, আর তু হামাকে কি ভয় দেখাবি রে বেটা! লক্ষ্মীর মত চুপ চুপ চলে যা। সরমকা বাত কি আছে এতে? গেরু কি দেখতে পেল—না তুদের দশটা জাতভাই দেখে ফেলেছে? ·

—তা যাবি না, না যাস ভাল। তুকে হাম কিছু বুলবে না, তু ভি হামারে কিছু বুলবি না। বেশ তুজনে ভাব করে লিব। তুর সীমানায় তু, হামার সীমানায় হামি আছে, কোনো হামলা-মামলার কারবার নেই। লেকিন জায়দা বাত হবে তো হেকড় খাবি শড়কির। এই সব বলতে বলতে ক-কদম পিছনে সরে বসল। সে এই সব বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে কিছুটা। সে ঘুমে ঢুলছে। তবু কবরের উপর জেগে বসে থাকল। কবরের উপর জেগে পাহারা দিচ্ছে। শেয়াল-খটাশের সঙ্গে টানাটানি করতে হবে মড়া নিয়ে। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়লে তো সব গেল। তখন মড়ার সঙ্গে ওর পা ধরেও টানবে বনবাদাড়ের জানোয়ারগুলো। সেজন্য কেবল সে বকছে। বকে বকে জেগে থাকছে। সে তার অতীত জীবনকে এখন মনে করতে পারছে আর তাকে কেন্দ্র করেই বকে চলেছে। সে বকল—ডিহিবড়া সাপের চেয়ালগা। সুন্দরবইনা বাঘ—বাবুরা বুলেন রুয়েল বেঙ্গল টাইগার, নীলবানরের মাথা, বুনমানুষের হাড়, কুলকুহলীর গাছ, মরদরাজের মূল—এ ছ-দফের রেণু মিলে কবচ দিলে তার নাম মহাশক্তি কবচবান। গুণ আছে

বহুত পেকারের—যে আদমী বিছানা খারাপ করে; যার গিটা বাত আছে, আস্বপ্ন-কুস্বপ্ন দেখে, যার বাদী-দুশমন-শত্রু আছে—বাণ মারে, বন্ধন করে, তার লাগি এই কবচবান। বড় সামান্য দাম আছে—মাত্তর স পাঁচ আনা দাম। খুব বেশি দাম লয়, ঘাটে-পথে, দোকানে দুশমনে কত পয়সা যায়—মাত্তর স পাঁচ আনা। এর আক্রম শক্তি বাবুলোকদের সব আপদ-বিপদ আসান দেবে। কিন্তু তবু ঘুম পায় কৈলাশের। শড়কির উপর ভর করে দাঁড়াল। সে জঙ্গলের ভিতর শব্দ শুনতে পাচ্ছে আবার। জঙ্গলের ভিতর জানোয়ারগুলো ঝগড়া বাঁধিয়েছে। কৈলাশ পোড়োবাড়িটার দিকে পা বাড়াল। হাতের উপর বল্লমটা উঁচু করে বলল, খবরদার! মুর্দার পানে তুগো এমন খটাশের মত নজর ক্যানে? যা ভাগ, জঙ্গলের ছা জঙ্গলে পালা। কৈলাশ এ-সময় শুনল কারা যেন ছুটে যাচ্ছে। কারা যেন ছুটে গিয়ে পোড়োবাড়িটাতে উঠেছে। কারা যেন ছুটে গিয়ে পোড়োবাড়িটার চারপাশে নৃত্য আরম্ভ করেছে। এই সব শুনে এবং ভেবে কৈলাশ খুব অসহায় ভেবেছে নিজেকে। এই সব শব্দ এবং চীৎকার যেন সে প্রথম শুনছে। অথচ কৈলাশের এমন হয় না। কৈলাশ তো কোনো দিন এমনভাবে ভেঙে পড়েনি। সে এই ফরাসডাঙায় একা এসেছে, একা মুর্দা পাহারা দিচ্ছে, জল ঢেলেছে এবং একা লাসটার বত্রিশটা দাঁত গুনে গুনে কঙ্কালের সঙ্গে গামছায় তুলে বেঁধেছে, অথচ সে ওর কবচ-ওবচের জন্য, দ্রব্যগুণের জন্য এই সব পীর-পরীদের জীনদের এতটুকু পাত্তা দেয়নি। ওরা পোড়োবাড়িটাতে একবার হাসলে সে হাসত দুবার। সে ওদের ব্যঙ্গ করত। বিদ্রূপ করত। সে কৈলাশ এখন ডাকছে—গেরু, ঘুমিয়ে গেলি?

ঘুমে অবশ গেরু কোনো রকমে উত্তর করল, হামারে ডাকছিস, বাপ?

—শুনে লে তো কারা যেন হাসি-মসকরা করছে।

—কৈ, শুনতে লারছি। কেবল তো শিয়াল ডাকছে।

—থাক, তু ঘুম যা। শালা কানটাই হামার কম শোনে।

খুঁজে খুঁজে এক সময় বল্লমটা তুলে আনল পাশের জঙ্গল থেকে। কিছুক্ষণ চুপ হয়ে বসে থাকল কবরটার পাশে। কোনো আওয়াজ শুনেই সে আর উঠল না। সে আর উঠবে না, যতক্ষণ না ভোর হয়, যতক্ষণ না জানোয়ারগুলো ফের হামলা করতে আসে। সে বসে থাকল এবং বসে বসেই চীৎকার করল, হে-ই-উ, হে-ই-উ! কবরটার উপর বল্লমটা দিয়ে জোরে জোরে বাড়ি মারল। ভয়ে জানোয়ারগুলো এদিকে আর আসছে না।

শেষরাতের দিকে গেরুকে ডেকে বলল তু এবার উঠে বস। হামি পানি লিয়ে আসি ক হাঁড়ি। পানি ঢালতে হবে কবরে।

ক হাঁড়ি জল এনে কবরে ঢালল কৈলাশ। জলে মাটিটা এবং মাটির নীচে লাসটাকে পর্যন্ত ভিজিয়ে দিল। জল পেয়ে এবার লাসটা জলদি ফুলে ফেঁপে উঠবে। যত জলদি ফুলে ফেঁপে উঠবে, তত জলদি সে কঙ্কালটা ঘরে নিয়ে তুলতে পারবে। সে জল ঢেলে বলল, এবার হামি ঘুম যাই, তু জেগে পাহারায় থাক।

গেরুকে পাহারা রাখার সময় কৈলাশ স্মরণ করিয়ে দিল, ভুনিয়ায় ভয়-বিস্ময়ের কিছু নাই।—তু তো রাজা রে, রাজার বেটা রাজা। কেউ তুর সঙ্গে বাদী দুশমনি করতে লারবে। তুর বাপ তুকে তিনটে কবচ দিল কত তন্ত্র করে। এ মন্ত্রের কারবার লয়। এ গাছ-গাছালীর গুণ, জড়িবুটির কারবার। আমি মরলে তুকে একলা ফরাসডাঙায় আসতে হবে, তখন তু কেবল তিনটে কবচের স্মরণ লিবি। ভয়-বিস্ময় তুর কিছু থাকতে লারবে।

কৈলাশ কয়েকটা শিমুলের ডাল কেটে এনে কবরটা ভাল করে ঢেকে দিল। শেয়াল-খটাশের দুশমনি থেকে দিনের আলোয় কবরটাকে রক্ষা করল।

কৈলাশ এক সময় রাস্তায় বলল গেরুকে, কি রে ভয় ধরেছিল রাতে?

গেরু ভোরের দুনিয়ায় রঙ মেখে বলল, না, ডরে ধরেনি। ওরা দুজন তখন চটানের দিকে যাচ্ছে।

শীতের উত্তুরে হাওয়া আজ আর নেই। তাজা চিতাটার পাশে একদল লোক একটা মড়া নিয়ে অপেক্ষা করছে। ঘন কুয়াশার ভিতর ওদের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে দুখিয়া। ঘাটোয়ারীবাবু গঙ্গায় স্নান সেরে জপ-তপ করতে করতে ফিরছেন। কতকগুলো কুকুর চালাঘরটার পাশে পড়ে থেকে রোদের উত্তাপ নিচ্ছে। অন্য পারে যুবতী মেয়েরা ঘাটে কাপড় কাচছে, কাপড় কাচার শব্দ ওপারে ঠক ঠক করে প্রতিশব্দ তুলছে। দূরে শীতের গঙ্গায় পুল উঠছে। ওপারে ট্রেনের শব্দ। রিক্সার ভিড়। যাত্রীরা সব নেমে আসছে। সে-সময় গেরু অনর্থক বল্লমটা চালাঘরটায় ছুঁড়ে দিল। কুকুরগুলো ভয়ে চীৎকার করে উঠল। ওরা ভয়ে ছুটছে! বল্লমের তাড়া খেয়ে ওরা নদীর পাড় ধরে ছুটল। অথচ বেশি দূর যেতে পারছে না। তখন গেরু দেখল কিছু দূরে কুকুরগুলো যে-পথ ধরে উঠে গেল—সেখানে নেলী চুপচাপ বসে আছে। নেলীর কাছে গিয়ে বলল গেরু, দেব শালা কুকুরকে আর একটা হেঁকড়।

নেলী উত্তর করছে না। কোনো জবাব দিচ্ছে না। অথবা গেরুর দিকে একবার মুখ তুলে তাকাল না।

তখন ঝাড়ো ডোম ঘাটে এসে শ্মশানের কাঁচাবাঁশ সংগ্রহ করছে। গেরু হাতে বল্লম দুলিয়ে এখানে হেঁকড়, সেখানে হেঁকড় দিতে দিতে নেলীর চারপাশটায় ঘুরছে। লখি, টুনুয়া ঘাটে নেমে এসেছে। ওরা মড়াটাকে উঁকি মেরে দেখছে। মড়ার তোষক-চাদর দেখছে। ওরা তারপর উঠে গেল। নেলীও উঠল। ওদের সঙ্গে সে-ও কাঠ বইবে। গেরু হাতে বল্লম দুলিয়ে এখানে হেঁকড়, সেখানে হেঁকড় মারতে মারতে নেলীর পিছু পিছু হাঁটছে। নেলীর

সঙ্গে সে-ও কাঠ বইবে। যে দু-চার পয়সা হবে—নেলীকে সবটা দিয়ে দেবে এমনও ভাবল গেরু। চটানে ওঠার আগে নেলীর কানে কানে বলল, ভয়-ডরকে জিতে লিচ্ছি। এই মুহূর্তে নেলীকে ফরাসডাঙ্গার ঘটনার কথা বলে নেলীর যুগ্যি মরদ হওয়ার ইচ্ছা। নেলী শুনে যেন ভাবে—মরদ আছে বটে। মরদের মত মরদ। কিন্তু নেলীর বিষণ্ণ মুখ দেখে এবং দুদিনের অভুক্ত শরীরটার দিকে চেয়ে সে কিছু বলতে পারল না। ওরা দুজন চুপচাপ একসঙ্গে চটানে উঠে এল। ঘাটোয়ারীবাবুর অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে থাকল। কখন বাবু ডাকবে. ওরে বাপ, ওরে আমার চোদ্দপুরুষের মনিব, গঙ্গাপুত্তুরের দল, একবার একটু ইদিকে আয়। মড়ার দায়টা আমার খালাস কর। ওরা সকলে অপেক্ষা করছে। বাবু ডাকবেন—ওরা যাবে। কাঠ মাপবে, কাঠ নিয়ে ঘাটে নামবে।

ঘাটোয়ারীবাবু এক সময় ডাকলেন, কৈ রে তোরা ?

—এই যে বাবু আমরা। নেলী জানালার নীচে থেকে উত্তর করল।

—কে রে ? নেলী ?

—জি বাবু।

—কাল গহনা পেলি ?

নেলী উত্তর করছে না।

—ভেবেছিস আমি কিছু টের করতে পারি না!

নেলী তখনও কোনো উত্তর করল না।

—এই মাগী, কথা বলছিস না কেন ? গহনা পেলি ?

নেলীর ইচ্ছা হল সহসা চীৎকার করে ওঠে—না, না।

—চালাঘর থেকে হ্যারিকেন খুলে নিয়ে রাতে তাজা চিতায় পড়ে থাকলি। কিছু হল ?

—না বাবু, কিচ্ছু হয়নি।

—ফের মিথ্যা কথা বলছিস ?

—না বাবু, কিচ্ছু হয়নি। মায়ীকি কসম।

—ঘাটের কাঠ বয়ে পেট ভরবে ?

নেলী এবারেও কোনো জবাব দিল না।

ঘাটোয়ারীবাবু রেগে উঠলেন,—ভেবে রেখেছিস আজও চটানে উপোস দিবি ? ও-সব হবে না। এ-চটানে ও-সব হবে না। জিয়াগঞ্জ চলে যেতে বলবি তোর বাপকে। সেখানে গিয়ে যত খুশী উপোস করগে। কেউ কিচ্ছু বলবে না। যাবি। কাল নির্ঘাত চলে যাবি।

নেলী জানালার নীচে দাঁড়িয়ে হাসল। ঘাটোয়ারীবাবু ফের কষ্ট পেতে শুরু করেছেন। এবং এই উপযুক্ত সময় ভেবে সে বলল, বাবু—

—বল।

—বাবু, একটা টাকা ধার দিবি ?

—আমি তো একটা টাকার গাছ—ঝাড়া দিলেই পড়বে।

নেলী সাহস করে আর বলতে পারল না কিছু। যেখানে কাঠ মাপা হচ্ছে সেখানে চলে গেল। গেরুও নেলীর সঙ্গে চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতেই বাবু ডাকলেন—তোর বাপ ফরাসডাঙা থেকে ফিরল ?

—জি ফিরেছে।

—ওকে ডেকে দে। কথা আছে।

গেরু ডাকল, বাপ, তু আয়। তুকে ডাকছে বাপ।

দূর থেকে কৈলাশ বলল, হামাকে কিছু বুলছেন বাবু ?

—জি হুজুর, আপনাকে কিছু বুলছি। ঘাটোয়ারীবাবু রাগে এখন বসে বসে হাত কচলাচ্ছেন। তিনি কৈলাশকে বড় বড় চোখে দেখছেন এখন।

জানালার পাশে এসে কৈলাশ দাঁড়াল। রাত জেগে ওর চোখ দুটো লাল। চোখ দুটো খুব বসে গেছে। দাঁড়িয়ে থাকতে ওর কষ্ট হচ্ছে। জানালার উপর যতটা পারল ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। বলল, বুলেন বাবু।

—ভিতরে আয় হারামজাদা, ভিতরে আয়।

ভিতরে গিয়ে কৈলাশ একই কথা বলল, বুলেন বাবু।

—বুলেন বাবু! ব্যঙ্গ করলেন তিনি। কি বলব রে বেটা ডোম! তোকে বলবটা কি শুনি? তোকে বললে ব্যবস্থা করতে পারবি? সামলাতে পারবি সব?

—কি সামলাব বাবু?

—বৌকে সামলাবি। বৌকে সাবধান করে দিবি। সাবধান না করিস তো পুলিসে খবর দেব।

এতক্ষণে কৈলাশের যেন হুঁশ হল। এতক্ষণে কৈলাশ খুব ভাবনায় পড়ল। মুখটা ভয়ে খুব শুকিয়ে গেল।

—কি হয়েছে মেহেরবাণী করে বুলেন বাবু। না বুললে যে কিছুই বুঝতে লারছি।

—পারবি, পারবি। সব পারবি। ঠেকায় পড়লে পারবি।

কৈলাশ ঘাটোয়ারীবাবুর পা দুটো জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করল। পুলিসকে ওর ভীষণ ভয়। ঘাটোয়ারীবাবু ইচ্ছে করলে যে-কেনো সময় ওকে জেলে ভরে দিতে পারেন! তাই সে কেনা গোলামের মত বলল, আপনি কিছু করে লিবেন না বাবু! যা করে লিবেন এখানে করে লেন। পুলিসকে খবর দিবেন না বাবু! চটানের মা-বাপ তু আছে।

—তোর বৌর জন্য রাতে ঘুমুতে পারিনি রে বেটা ডোম! গোটা রাত দরজায় এসে হামলা করেছে।

কৈলাশ এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হল। জবাব দিল খুশী হয়ে—ওঃ, তার লাগি? তা দেব। ওয়াকে সাবধান করে জরুর দেব। ও বেটি হারামী আছে বাবু। কথায় বুলে—পুরুষমানুষের ছ গুণ মেয়েমানুষের ল গুণ। বুড়া হাড়ে হামার আর রস নাই বাবু। শালি হামার কেবল রস চিবাতে চায় গ। পায় না তাই এখানে সেখানে ঢুঁড়ে বেড়ায়।

কিন্তু তিনি আর এক ধমক দিলে কৈলাশ সুড় সুড় করে চটানে

নেমে গেল। কৈলাশের এ-বৌ শেষ বয়সের। তৃতীয় পক্ষের।
গেরুর মা নেই সে অনেক কাল। সে স্ত্রী দ্বিতীয় পক্ষের। কৈলাশ
তার হেকিমী জীবনে বৌটাকে নিকা করেছিল। গেরু তখন মাত্র
তিন মাসের। কিন্তু বড় দুর্ভাগ্য, দু-বছরও গেল না, বৌটা পালাল।
তারপর অনেক কাল কেটেছে কৈলাশের। তখন স্ত্রী ছিল না, ঘর
খালি ছিল। গেরু ছিল একা। পরের বাচ্চাটা নিজের বাচ্চার
মত হয়ে যাচ্ছে। সে বাচ্চাকে সে পুষে পুষে এতদিন বড় করেছে।
এবং এ-বৌটা এসেছে কিছুদিন। ইদানীং কৈলাশ যোগাড় করেছে
কোত্থেকে। কেমন করে যোগাড় করেছে চটানের মানুষগুলো তার
খবর রাখে না। শুধু ওরা এক সন্ধ্যায় দেখেছে, কৈলাশ কাটোয়া
গিয়েছে। তারপর আর এক সন্ধ্যায় দেখেছে, কৈলাশ চটানে
ফিরেছে। নেশায় বুঁদ হয়ে আছে মানুষটা। একটি মেয়ে ওকে
টানতে টানতে ঘরে নিয়ে তুলল। কৈলাশের ঘরে ঢুকল
মেয়েটা এবং শেষ পর্যন্ত সেই কৈলাশের বৌ হয়ে চটানে
থেকে গেল।

পরদিন ভোরে সকলের দরজায় দরজায় বৌকে নিয়ে ঘুরল
কৈলাশ। নতুন নিকে-করা বৌ, সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে
দিল। ঘাটোয়ারীবাবুর পায়ে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল এবং
বলেছিল—চটানের মা-বাপ আছে। পেরণাম কর বাবুকে।

অফিস-ঘরের নীচে নেমে দেখল কৈলাশ ডানদিকের চালাঘরটায়
ঝাড়ো কতকগুলো বাঁশ নিয়ে ঢুকছে। দুখিয়ার ঘরে মংলী তোষক-
লেপ থেকে টেনে টেনে তুলা বের করছে। কাটোয়া থেকে লোক
আসার কথা। তোষক-লেপের তুলা, বালিশের তুলা, লোকটা
মাথায় করে নিয়ে যাবে। নতুন লেপ হলে কাঁচা টাকায় বিক্রি।
মংলী এখন যেন সেই লোকটার অপেক্ষাতেই আছে। কৈলাশকে
দেখে মুখটা ফিরিয়ে নিল মংলী। তখন ঝাড়ো বলছে, কি রে
কৈলাশ, কিছু মিলল?

কৈলাশ জবাব দিল না। জবাব দিতে ভাল লাগছে না।

সারারাত জেগে শরীর দিচ্ছে না। ইচ্ছা হচ্ছে এ-মাটির উপরই শুয়ে পড়তে। তবু সে যতটা পারল হেঁটে হেঁটে গেল। যাচ্ছে নিজের ঘরটার দিকে। পাশে শূয়োরের খাটাল। বাবুচাঁদ শূয়োর নিয়ে বের হয়ে পড়েছে। গোমানীর ঘরে গোমানী উঠেছে। সে বসে বসে খিস্তি করছে। মাচানের নীচে বসে নসিবকে গাল দিচ্ছে। কিন্তু কি বলছে বোঝা যাচ্ছে না। কৈলাশ বাবুদের বাড়ীর রেডিওর বাজনা শুনল। পাঁচিল টপকালেই বাবুদের পাড়া। সব কাক উড়ে গেছে বাবুদের পাড়ায়, শুধু দুটো কাক এখনও চটানে পড়ে খুদকুঁড়ো খাচ্ছে। ঘাটের কাপড় শরীরে পেঁচিয়ে মংলী তখন ভাঙা আরশিতে রূপ দেখছিল আর কাক তাড়াচ্ছিল উঠোনে। কাটোয়া থেকে সে লোকটার আসার কথা। আরশিতে মুখ দেখার সময় সে লোকটার পুষ্ট গোঁফ সে আরশিতে দেখল। দুবিয়ার গোঁফ-দাড়িবিহীন মুখটা মংলীর মুখকে কুঁচকে দিয়েছে। মাঝে মাঝে সেজন্য মংলী এ-চটান ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে চায়। লোকটা কি যেন ইশারা দেয়, আর মংলী তখন আরশিতে কেবল মুখ দেখে।

কৈলাশ ঘরে ঢুকে দেখল বৌটা প্রায় উলঙ্গ। মেঝের উপর বৌটা পড়ে ঘুমুচ্ছে। সে বৌটার পাশে দাঁড়াল। ঘরটার আনাচে কানাচে চোখ বুলাল একবার। ঘরে সব কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। হাঁড়ির মুখে ঢাকনা নেই। হাঁড়িতে পান্তাভাত। মালসাটা নীচে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। মাছিরা হাঁড়ির মুখে উড়ছে বসছে। এ-শীতেও ওরা ভন ভন করছে। ঘরের চারি-দিকটা কদর্য কুৎসিত হয়ে আছে। নোংরা কাঁথা-কাপড়গুলো মাটিতে পড়ে আছে ; কিছু বৌর বুকের কাছে উঠে এসেছে। এমন কি পরনের কাপড়টা পর্যন্ত। এইসব দেখে পিঠে লাথি মারার শখ হল। দাঁত ভেঙে দেওয়ার ইচ্ছা কৈলাশের। সে গেরুর মা-র দাঁত ভেঙেছিল লাথি মেরে। এ-বৌর দাঁত কোমর দুই-ই। তবে ঘাটোয়ারীবাবুর দরজায় হামলা করতে পারবে না। রসের জন্য

দরজায় দরজায় ভিখ মাংতে হবে না। ঘরে পড়ে থেকে কেবল গোঙাবে। এবং পানি খেতে চাইবে সকলের কাছে।

এই পিঠে লাথি মারতে যতটুকু শক্তির দরকার, কৈলাশের এখন যেন তাও নেই। সে ডাকল, উঠ হারামী, উঠ। পা দিয়ে কৈলাশ শরীরটাকে ঠেলতে থাকল। উঠলি না, উঠলি না তু! গোটারাত ঘাটোরীবাবুকে জ্বালিয়ে এখন ঘুম দিয়ে লিচ্ছিস! আচ্ছা মানুষের সাথ তু কারবার করতে গেলি! সরম আসে না তুর! মুখে তু হামার চুন দিলি!

কৈলাশ ঘরের কোণায় ঠেস দিয়ে রাখল হাতের শড়কিটা। মদের ভাঁড়টা মাচানের নীচে রেখে দিল। হ্যারিকেনটাও। মাচানে বসে সে বিড়ি ধরাল। বৌটা আড়মোড়া ভেঙে উঠছে। অপমানে ফেটে পড়ছে চোখ তুটো। গরল ওঠার আশঙ্কা। গরলে যেন এখুনি ফেটে পড়বে। কিন্তু কৈলাশ শক্ত নজরে চাইতেই ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেছে সে। সেজন্য গা ঝাড়া দিয়ে উঠল, অথচ কিছু বললে না। এক কোণায় সে সরে দাঁড়াল।

কৈলাশ মাচানে তু ঠ্যাং ছড়িয়ে দিয়ে বলল, তু-ঘটি জল লিয়ে আয় লদী থেকে। হামি চান করে লিব।

মেটে কলসিটা কাঁকে নিয়ে বৌ ফের তাকাল কৈলাশের দিকে। চোখ তুটো দেখে এখন খুব নিরীহ মনে হচ্ছে। মায়া মাখানো মনে হচ্ছে। কে বলবে এ-চোখ তুটোই মাঝে মাঝে আগুন হয়ে ওঠে, সাপের মত হয়ে ওঠে, কখন ছোবল মারবে কৈলাশকে! তখন কৈলাশকে পর্যন্ত চটান ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয়। অথচ সেই বৌ কথার জবাব না দিয়ে ঘাটে জল আনতে চলে গেল। এই সব দেখে কৈলাশের খুব মায়া হল বৌটার জন্য। সে ভাবল, ও ঠিকই করেছে। ওয়ার তো ল গুণ। ওয়ার কোন দোষ আছে? মহাশক্তি কোমরবান হিম্মত ওয়ার নেই। সে আর কবচের কথা ভাবল। সবই ধাপ্পাবাজী। কৈলাশ কিছুকাল থেকে ওর কবচের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে এই ধরনের কথা বলতে শিখেছে। সে

একটু কাত হয়ে শুলো। যতক্ষণ বৌটা ঘাট থেকে না ফিরছে, ততক্ষণ শুয়ে থাকা, ততক্ষণ এইসব ভেবে সুখী হওয়া যাক। অথবা দুঃখ থেকে আসান পাওয়ার জন্য যেন সে চোখ বুজল।

কৈলাশের ইচ্ছা নয় গেরু জানুক মহাশক্তি কবচবান, মহাশক্তি কোমরবান, পুন্নপদের মাদুলিতে কোনো দ্রব্যগুণ নেই। ইচ্ছা নয় এইসব মাদুলির উপর গেরুর বিশ্বাস ভেঙে যাক। কারণ এ-চটান বড় বেইমান। সহজে সে দু মুঠো কাউকে খেতে দেয় না। কৈলাশ মরে গেলে গেরুকেও দেবে না। গেরু না খেতে পেয়ে ফের চটানে ভুখা থাকতে শুরু করবে। গোমানীর বেটির মত এ-ঘর সে-ঘর করবে। তাই সে মড়ার হাড় খুঁজতে যাওয়ার সময় ওকে সঙ্গে নিয়েছে, দ্রব্যগুণের কথা বলেছে। বলেছে, এ-মাদুলি দেহে ধারণ করলে, পীর-পরী, সাপখোপ, জীন-দৈত্য কিছুতে নাকাল করতে পারবে না। বলেছে, ডানপুকুসে টান মারতে পারবে না। কবচের প্রতি গেরুর বিশ্বাসকে অক্ষয় অমর করার জন্য, চটানে দ্বিতীয় পক্ষের বৌটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এমন অনেক মিথ্যা বলেছে, যা সে একদা ওস্তাদ গুরু হারুন রসিদের কাছ থেকে শিখে ভেবেছিল, দুনিয়ার ঈশ্বর যদি সত্য হয়, তবে আল্লার কসম খেয়ে সে বলতে পারে এ জুড়িবুটির মাদুলিও অক্ষয় সত্য। সেই অক্ষয় সত্যের উপর নির্ভর করেই সে ফরাসডাঙার ঝুমঝুমখালিতে বসন্ত-কলেরার এবং যত বেওয়ারিশ মড়ার কঙ্কাল সংগ্রহ করে বেড়িয়েছে। কোনো দিন যদি আঁধার রাতে সে হেলে পড়ত ভয়ে, দুহাত উপরে তুলে, আকাশে বল্লম ছুঁড়ে চীৎকার করে উঠত, ওস্তাদ হারুন রসিদের দোহাই! গেরুকেও বার বার সেই দোহাই দিয়ে শক্তি সঞ্চয় করতে বলেছে। কারণ, কৈলাশ জানে গেরুকে কঙ্কালের পয়সাতেই চটানে টিকে থাকতে হবে, চটানে বেঁচে থাকতে হবে।

হারুন রসিদ ওর ওস্তাদ গুরু—মাচানে শুয়ে শুয়ে সে তার হেকিমী জীবনের কথা ভাবল। মানুষটা কালীর সাধনা করত—

অদ্ভুত মানুষ। ভোরে ঠিক সূর্য ওঠার আগে তিনি গুহায় ঢুকতেন। গুহার মুখে পাথর চাপা দিয়ে রাখতেন এবং ভিতরে পড়ে ঘুমুতেন। সূর্য অস্ত যাওয়ার পর পাথর ঠেলে বাইরে আসতেন এবং পাঁচ ওক্তের নামাজ পড়তেন। তখন সব সাকরেদরা আসতে শুরু করত পাহাড়ের ঢালু ধরে। ওরা এসে একে একে জমা হত। সেই জনহীন পাহাড়ঘেরা দরগার ময়দানে এ-চটানের মত নাচন-কোঁদন হত তখন। ঝাড়ফুক, তন্ত্র-মন্ত্র জুড়িবুটীর কারবার হত সেখানে। কোথায় শ্বেত-শিমুলের ছাল মিলবে, কোথায় তুই সতীনা গাছ পাওয়া যাবে, কোন গুহায় নীলবানরের মাথা মিলবে—সব কিছুর হদিস দিতেন ওস্তাদ গুরু হারুন রসিদ। আর কৈলাশকে বলতেন, রাহুচণ্ডালের হাড় যোগাড় কর। দানরী-ফানরী বলিস আর হেকিমী বলিস, রাহুচণ্ডালের হাড় না হলে কোনো কবচ-ওবচে কাজ দেবে না। তুই তো ডোমের বাচ্চা রে মরদ, রাহুচণ্ডালের হাড় যোগাড় করতে কত আর সময়! যোগাড় কর—মা চণ্ডীর থানে স্পর্শ পাইয়ে দি হাড়টায়, গাছ-গাছালীর নাম করে দিচ্ছি, সব মিলিয়ে পুন্নপদের মাদুলি দে, মহাশক্তি কবচ দে—পারিস তো মহাশক্তির কোমরবানও দিবি।

কাছাড়ের সেই রসিদের দরগা, সেই পাহাড়ঘেরা দরগার ময়দান, সেই গুহার ভেতর মা চণ্ডীর থান, সেবাইত রসিদ, সাকরেদ মিঞাচাঁদ, বুনো ঠাকুর, হরিশ চণ্ডাল—সব এক এক করে ওর চোখের ওপর এসে ভাসতে থাকল। সে এক জীবন গেছে কৈলাশের। মাইলের পর মাইল হেঁটে গিয়ে গঞ্জের হাট করেছে, ব্যাখ্যা করেছে গুরুর দ্রব্যগুণের কথা, জুড়িবুটির কথা। তখন কত তন্ত্র-মন্ত্র করে ভুত-প্রেত ছাড়িয়েছে মানুষের শরীর থেকে। আঁধার রাতে হেঁটে হেঁটে কৈলাশ দরগায় ফিরেছে। ওঝা কৈলাশ তখন সওদা এনেছে কত। গুরুর পায়ের নীচে বসে মহাশক্তি কোমরবানের ব্যাখ্যা শুনেছে মন দিয়ে। সেই ব্যাখ্যা বসে বসে মুখস্থ করেছে। এখন সে তার হেকিমী জীবনে ওস্তাদের সেই

কথাগুলো টেনে টেনে ভেঙে ভেঙে বলেছে—এ বার পেকারের তন্ত্র আছে। হাতে সরু একটা ছিপের মত লাঠি থাকত তখন। গঞ্জের হাটে চাদরের উপর বিছিয়ে রাখত বনরুইমাছের ছাল, হরিণের সিং, হেমতাল কাঠ, গোঁড়ের বাঁশ, কালি ঝাপ, নরসিং ঝাপ, দুর্গা ঝাপ। তলায় রাখত কালনাগিনীর গাছ, শ্বেত-শিমুলের ফল, ময়রুন বিবির ফুল। ময়রুন বিবির ফুলের কাছে এসে ছিপের ডগাটা থামত। চোখ দুটো ওর টাটাত। চোখ দুটো রগড়ে বলত, এ ফুল আরব থেকে লিয়ে আসতে হয়। হজের মানুষ হজে যান, লিয়ে আসেন এ ফুল। পসূতির বাচ্চা হয় না, ব্যথাবেদনায় হুম হুম করছে, কথাবার্তা বেমালুম গণ্ডগোল, জল লেন, ময়রুন বিবিরে ডুবায়ে দ্যান - সাদা জলটারে মিঠাই দিয়ে খাওয়ান, বিবি আপনার আসন পাবে জরুর। পোয়াতির বাচ্চা হতে জেরা সময় লেবে।

গঞ্জের হাটে এই সব বলে হেকিমী ব্যবসা করত কৈলাশ। ওস্তাদ গুরুর জীয়নহাড়টা সঙ্গে নিত। সোয়া পাঁচ আনা দাম চাইত তাবিজের জন্য। তাবিজটা দেওয়ার আগে রাহুচণ্ডালের হাড়ে ঠেকিয়ে দিত। বলত, লেন—পোয়াতির কোমরে বেঁইধে দ্যান।

কাছাড় দরগা থেকে পালিয়ে এসে একদা কোর্ট-কাছারীতে এই ব্যবসাই করত কৈলাশ। কোর্ট-কাছারীর কোনো পুরোনো অশ্বত্থের ছায়ায় সে দাঁড়াত। একটা চাদর বিছিয়ে রাখত নীচে। গাছ-গাছালীগুলো সারি সারি সাজানো থাকত। একটা হ্যারিকেন থাকত। আর থাকত ডোমন সা। সাকরেদ ডোমন সা। সারাদিন চেঁচাত কৈলাশ। মুখে থুথু উঠত থুথু ছিটাত চারপাশে এবং দরগার মতই ব্যাখ্যা করত বিশল্যকরণী গাছের, দুই সতীনা গাছের। তখন কত লোক জমত চারপাশে। কোর্টের লোক, মামলা-মোকদ্দমায় হার-জিতের লোক। ওরা কৈলাশকে দেখত, কৈলাশের খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটা দেখত।

কোনো কোনো সময় ছিপের ডগা ছুঁইয়ে হাঁ? হুটো সামনে এনে কাঁপাত। সরু কোমরটা ভেঙে দিয়ে চোখে-মুখে অমানুষিক ভাব ফুটিয়ে তুলত। বলত, এ হল গিয়া কুম্ভীরের লিঙ্গ। তারপর খুদে খুদে হুটো চোখ নিয়ে সকলের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকত। মানুষগুলোর মনে তন্ত্রের নেশা ধরানোর চেষ্টা করত, এবং যখন দেখত নেশা বেশ ধরে এসেছে তখন সে এক ঝলক হেসে বলত, এবার বেমাফিক দু-চারঠো কথা বলে লিব, নিজ দয়াগুণে বাবুলোগ মাপ করে লিবেন। এই যে ছোট সাদা তন্ত্র দেখলেন, মালোম লিশ্চয়ই আসছে—এ হল গিয়া কুম্ভীরের লিঙ্গ। এ চীজ বহুত লাখোটিয়া চীজ, বহুত দাম। যখন তখন পাবেন না, যেখানে সেখানে মিলবে না। বেনাতি মণিহারী দোকানে যান, কাম কারবার করেন, লেকিন চীজ আপকো নাহি মিলছে। হে আছে, লাখোটিয়া চীজ ভি আছে। লেকিন কাঁহা পাবেন, কাঁহা আছে? বড় বড় পুরানা কবরাজবাবু আছে, উসকা পাশ যান—পাবেন। দাম ভি বহুত আছে, দু কুড়িতে ভরি হবে।

এ সময়ে একটু থামত কৈলাশ। জোরে জোরে শ্বাস নিত, হাঁপের টানের মত শব্দ উঠত গলায়। কৈলাশ চাদরটার চারপাশে এক পাক হাঁটত। সরু ছিপটা হাতে থাকত—তখন চেঁচাত না, ছিপটার হুটো ডগা দু-হাতের মুঠোতে রেখে একটু বাঁকিয়ে সকলের চোখের সামনে তুলে ধরে বলত, দেখে লেন বাবুলোগ! খুব ধীরে ধীরে বলত। পাবলে ইশারায়। তারপর কৈলাশ পা তুলে নাচতে আরম্ভ করত। চাদরটার চারপাশে সে ঘুরপাক খেত হেঁটে হেঁটে যেন নেচে নেচে সে হাঁটছে। ওর মুখের কথার সঙ্গে পা দুটোর মাত্রা ঠিক থাকত। সে বলত, আমার দেহ, আপনার দেহ এ ছিপের লাখান। খাওয়ান-দাওয়ান বেশ আছে, কিন্তুক ঘুণে ধরলে বোঝবার জোটি লাই। কবে ঘুণে ধরল সেটি টের পাবেন না। তবে বাত আছে এক, ভাঙেন

মচকান তখন টের করতে পারবেন অন্দরে ঘুণ ঘুইসে গেছিল। বাবুভাই, আপনারা ফিটফাট থাকেন বাইরে, মাস্তানের মত চলেন ফেরেন, টের পাওয়া যায় না অন্দরে ঘুণ আছে কি না আছে। তবে বিটির কাছে গেলে সব নজর আসে। তার লাগি বলি বাবু মহাশক্তি কোমরবান। সকলের চোখের সামনে কৈলাশ তাবিজটা তুলে বলত, দাম মাত্র স পাঁচ আনা।

কোর্ট-কাছারীর ময়দানে অশ্বত্থের ছায়ায় অনেকক্ষণ ধরে মহাশক্তি কোমরবানের উপর অশ্লীল আলোচনা করত কৈলাশ। পাঁচ-সাত টাকার বিক্রী তুলতে সাঁজ নেমে আসত ময়দানে। সাকরেদ ডোমন সা পাশের একটা কাঠের বাক্সে সব গাছ-গাছালী তুলে সাজিয়ে রাখত। সন্ধ্যার ঘন আঁধারে হ্যারিকেন জ্বালিয়ে চটানের পথ ধরত তারা। শহরের পথ ধরে এলে ঘুরতে হবে ভেবে সে গঙ্গায় নেমে সোজা এসে চটানে উঠত, এবং ঝোপ-জঙ্গল ভেঙ্গে চটানে ফিরতে বেশ রাত হত তার।

গেরুর মা তখন চটানে এসেছে। তিন মাসের বাচ্চাটাকে নিয়ে জিয়াগঞ্জের চটান থেকে কৈলাশের সঙ্গে এ চটানে উঠে এল। হেকিমী-দানরীর পয়সায় কৈলাশ বৌয়ের মন ভুলাল। বৌটা নতুন শাড়ি পেল, নাকের নথ পেল, সোনার পাতের চুড়ি পরল হাতে। খুব খুশি খুশি মন। জিয়াগঞ্জের চটানে যে না খেতে পেয়ে শুকনো কাঠের মত রঙ ধরেছিল, এ চটানে এসে সেই বৌ লাউডগার মত রূপ খুলে ধরল। আহা কি রূপ! কি রূপ! চটানে ফেরার সময় কৈলাশ সারাক্ষণ গেরুর মা-র রূপ নিয়ে মনে মনে কোন্দল করত। মনে মনে নিজের বয়েসটার কথা ভেবে খুব মুষড়ে পড়ত। উত্তর-চল্লিশের কৈলাশকে গেরুর মা-র কাঁচা বয়স সহ্য করবে কিনা ভেবে সারা পথ অন্যমনস্ক হত। তাই প্রথম যৌবনটাকে ফিরে পাবার জন্য অনেক বাছ-বিচার করে, অনেক তন্ত্র-মন্ত্র পড়ে, দেহে ধারণ করেছিল মহাশক্তি কোমরবান। বেটি মানুষের ন গুণ পুরুষমানুষের ছ গুণ। তার

উপর ভাঙা বয়সটা ওকে কেবল বিরক্ত করে মেরেছে। সারাক্ষণ এই সব ভেবে নিজের দেওয়া তাবিজ নিজেই ধারণ করল এবং ভাবল তাবিজের দৌলতে ওর জীবনীশক্তি অনন্ত। ভেবেছিল দেহের আর অপচয় নেই। দেহে ঘুণ ধরবে না, ভাঙবে না, মচকাবে না। মেয়েমানুষের ন গুণকে সে পুষিয়ে নিতে পারবে।

চটানে ফিরতে রাত হত কোনোদিন। গভীর রাত। গেরুর মা তখনও ঘুমিয়ে পড়ত না! ঘাটের কাঁথাকাপড় গায়ে জড়িয়ে শীতের রাতে কৈলাশের অপেক্ষায় মাচানে বসে থাকত। বসে ওর জন্য অপেক্ষা করত কখন খাবে, কখন শোবে, কখন ঘুমোবে সেই আশায়। খেতে বসে কৈলাশ গেরুর মা-র ভারী ভারী চোখ দুটো দেখে ভেতরের উত্তেজনা বোধ করত। তারপর বৌটাকে নিয়ে যেত মাচানে। গেরু যদি কেঁদে উঠত এ-সময়, কৈলাশের মেজাজ বিগড়ে যেত! বলত সময়-অসময় কি লাই বেটার! নেমকহারাম শালা হামার! ভোর-রাতে যদি কৈলাশ কোনোদিন জাগত, যদি দেখত বৌটা একটু উচ্ছৃঙ্খল ভাব নিয়ে শুয়ে আছে, তখন ফের গেরুর মাকে কাছে টানার চেষ্টা করত। ফের উত্তাপ জমা হত মাচানে। ফের মাচানে গোঙানির শব্দ উঠত। এবং এ-ভাবে গেরুর মাকে কেন্দ্র করে কৈলাশ তার অনন্ত জীবনীশক্তির পরীক্ষা দু-দুটো বছর ধরে চালিয়েছিল। দু বছর একসঙ্গে থেকেছে, বসেছে, উঠেছে। একসঙ্গে সাঁঝের আঁধারে মদ খেয়ে হৈ-হল্লা করেছে চটানে, আর রাতের পর রাত তাবিজের দৌলত পরীক্ষা করেছে গেরুর মা-র উপর।

সাকরেদ ডোমন সা বারান্দার এক কোণায় পড়ে থাকত। ওস্তাদের নিকা-করা বৌর কান্না শুনতে পেত মাঝরাতে। ভোরবেলায় ওস্তাদের বৌকে বলত, লিব নাকি কিছু? সে কাঠের বাক্সটা কাঁধে নেওয়ার সময় ডাগর দুটো চোখের দিকে চেয়ে বলত, ওস্তাদের সব ভুলভাল হয়ে যাবে। হামি লিব নাকি কিছু? আপ বুলিয়ে দিন। হামি ঠিক ওস্তাদকে স্মরণ করিয়ে দেবে। হামি লোক ঠিক আছে, আপনি বুলেন।

সাকরেদ ডোমন সা-ই তখন মোটঘাট বইত। চাদর বিছাত।
জুড়িবুটিগুলো সাজিয়ে রাখত চাদরে। কোনোদিন সে তন্তর-মন্তর
শিখত কৈলাশের কাছে।

কৈলাশ বলত, শিখ্‌লে শালা! তোর ওস্তাদ হামি, হামার
ওস্তাদ রসিদ। সব ওস্তাদের জয়-জয়কার দিয়ে বুলে ফ্যাল
হেকিমী-দানরী দশ-পঁচিশ দফে বেইমান মানুষের কাজে লাগে।
আওর এক দফে শুনে রাখ শালা, বেম্ম চণ্ডালের হাড় লাগবে।
জীয়ন হাড় যাকে বলিস। সেই রাহুচণ্ডালের হাড় না হলে
আর তুর চলছে না। গাছ-গাছালীর গুণ, জুড়িবুটির জেরাসে
কারবার। দুরোজনে বাত আছে ও।

কৈলাশের তৃতীয় পক্ষের বৌ শূয়োরের খাটাল পার হয়ে
তখন এক-কলসি জল রাখল উঠোনে। কিন্তু কৈলাশ তখনও
ঝিম মেরে সামনে শুয়েছিল। সে তার চটানের অতীত কথা-
গুলো ভাবতে ভাবতে শেষ বয়সের বৌটার দিকে ভাল করে
নজর দিয়ে দেখল। এ বৌটাও হয়তো এক রাত্রে চটানের
কোন মরদের সঙ্গে উধাও হয়ে যাবে। তার চেয়ে বরং ভাল
এখন যদি ওর সব ক'টি দাঁত ভেঙে দেওয়া যায়। আর
কিছু না হোক, চটানের উঠোনে সারাজীবন তবে পড়ে থেকে
গরল তুলতে পারবে। চটান থেকে উধাও হবার ভয় থাকবেনা।

কৈলাশ উঠে দাঁড়াল। চালার বাইরে এসে খেঁকিয়ে উঠল।
খুব জোরে চেঁচালে চোয়ালের লম্বা দাঁত দুটো বাইরে ঝুলতে
থাকে। এখন দাঁত দুটো ঝুলছে। সে বলছে, পানি দিয়েই
তুর কাম খালাস হল রে ডোমনী! আওর কুচ দিবিনে?

বৌ নাকের নথ দুলিয়ে ঘরে ঢুকল। বিড় বিড় করে কি
সব বকল। কিছুক্ষণ পর একটা পিঁড়ি বের করে দিল বাইরে।
পিঁড়িটার উপর বসে কৈলাশ স্নান করবে। পিঁড়ি বের করে
নীচু গলায় গাল দিল, খেঁকিয়ে উঠছিস ক্যানে? দুদিন বাদ
তো চটান খালাস করবি, খেঁকিয়ে উঠছিস ক্যানে?

সে মাথায় জল ঢালল শুধু। কোনো জবাব দিল না। কারণ, এখন যদি সে ফের জবাব দেয়, তবে বৌটার জিদ বাড়বে। নাচন-কোঁদন শুরু হবে। দয়া করে যদি নাচন-কোঁদন একবার এই তৃতীয় পক্ষের বৌর শুরু হয়, তবে সাধ্য কি সমস্ত দিনমানে সে এ নাচন-কোঁদন থামাতে পারে।

স্নান-শেষে কৈলাশ ঘরে ঢুকলে একথালা পান্তাভাত বেড়ে দিল বৌটা। তেল-চিটচিটে গামছা দিয়ে কৈলাশ শরীর মুছল। তারপর ছু ঠ্যাং বিছিয়ে এক কোণায় খেতে বসে গেল। দুটো শুকনো লঙ্কা পাশের পোড়া কাঠে পোড়াবার সময় ডাকল, গেরু, তু কাঁহা রে? খানা-পিনা তু করবি না? এ-সময় কৈলাশ একটা কাঁচা পেঁয়াজ চাইল বৌটার কাছে। বৌ কাঁচা পেঁয়াজ দিল। তারপর বলল, খানিক পচাই লিবি? গত রাতে গেরুর সৎমা সবটুকু পচাই শেষ করতে পারেনি বলে এই ধরনের সুখের কথা বলতে পারল। কৈলাশ এতক্ষণ পর খুব খুশী-খুশী হয়ে উঠল। বলল, তা আছে লাকি? থাকলে দে ছুটো ঢেলে। ভাতের সঙ্গে পচাই খেতে পেয়ে কৈলাশ এত খুশী যে বৌটার কানের কাছে মুখ না দিয়ে আর পারল না। ফিস্ ফিস্ করে বলল, মড়াটা যে মেয়েমানুষ লা। ভারী ঠোঁট দুটো বলতে গিয়ে নীচে ঝুলে পড়ল। মাগীটা মায়ের দয়াতে পার পেল।

এ চটানে খবর দেওয়ার মত আর একটা খবর আছে কৈলাশের। খবর—মেয়েমানুষটার দাঁত একটাও পড়েনি। খুলিটার দাম জগুবাজার হিল্টন কোম্পানির বড়বাবু পুরো এক কুড়ি আঠারো টাকা দেবেনই, সমস্ত দাঁতগুলো ঠিক থাকলে তিনি খুলির জন্য পুরো আটত্রিশ টাকাই দেন। দাঁত যদি দুটো-একটা না থাকে তবে দাম কমবে ফাটকা বাজারের মত। চড় চড় করে দাম কমে দশ-পাঁচ হতে পারে। সেজন্য কৈলাশ ফরাসডাঙার জঙ্গলে মড়া পেলে কবর খুঁড়ে প্রথম দাঁতগুলো দেখে। দাঁত ক'টা থাকল, ক'টা উঠল দেখে। দাঁত কম থাকলে

নিজের দাঁতে হাত বুলোয় কৈলাশ। বলে, এ-মুর্দা হামার মত পাপী-তাপী কিছু একটা হয়ে লিবে।

থালায় যখন পচাই ঢালছিল বৌ, তখন সে খবরটা না দিয়ে থাকতে পারল না। এতক্ষণ ধরে এই খবরটা দেওয়ার জন্য ছটফট করছিল সে। মুখের ভেতর এক ঢোঁক পচাই নিয়ে বলল, মড়াব বত্তিসটা দাঁত আছে রে বৌ! ঘরে পয়সা এ টাইমসে জায়দা উঠবে। গেরুটাকে একটু সামলে চলতে বুলবি। ডাইনি মাগীটার সঙ্গে মিশতে বারণ করবি। তাহলে আগামী সালে একটা সাদি-সমন্ধ করে লিব। তু কি বলিছে?

—তা লিবি। কিন্তুক ওয়ার গতিক-বিতিক ভাল লয়। বলে উঠে দাঁড়াল সে। সরু কোমরটা নেচে উঠছে। বেশী পয়সার কথা শুনে চোখ দুটো ওর চক চক করে উঠছে। দু-কদম সে পা বাড়াল সামনে, কোণ থেকে মতুরটা টেনে এনে সে মাচানে বিছিয়ে দিল।

কৈলাশ নতুন মাহুর দেখে ফিস্ ফিস্ করে বলল, কাহার মন ভুলালি রে বৌ?. দুখিয়ার লয় তো? মরঘাটিব ডাক তো এ-সালে ওয়ার।

বৌটার গলায় এবার সোহাগ উথলে উঠছে. তু যে কি বলিছে!

কৈলাশ মাচানে গড়াগড়ি দেওয়ার সময় বলল, দেখে লিবি, এবার মড়ক লিশ্চয়ই একটা লাগবে। ঠাণ্ডা আভিতক পুরোদমে থাকল, লেকিন মায়ের দয়া আরম্ভ হয়ে গেল। লিশ্চয় মড়ক লাগবে। লিশ্চয় লাগবে। বাপজী ঠাকুরের মানত করে লিলুম। সে দুহাত তুলে বাপজী ঠাকুরকে মানসা দিল। কৈলাশের খাপছাড়া বেঢঙের শরীরটার দিকে নজর দিতে দিতে বৌটা যেন আঁতকে উঠল। বলল, তবে!

সে হাসল চোয়ালের সেই নোংরা দাঁত দুটো বের করে। হাসতে হাসতেই বলল, ও কিছু লয়, ও কিছু লয়। লেকিন

এ সালে জরুর তুর গায়ে গহনা উঠবে। হামি কৈলাশ ডোম এ-কথা বলিছে। ঝুমঝুমখালি আর ফরাসডাঙার জঙ্গলে মড়া পোঁতার হিড়িক লাগবে, ঠিক গেল চার সালের আগের মত।

সে মৃত্যুকে কেন্দ্র করে আজ অনেক টাকার স্বপ্ন দেখল। বৌ পাশে বসে রয়েছে। সে বসে বসে কৈলাশের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা শুনছে। শুনতে শুনতে এক সময় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তারপর দুটো হাত নিজে চোখের সামনে তুলে কেমন কুঁকড়ে গেল মেয়েটা।

আকাশ এবং মাটি লাল এবং এই মাটির কস খেয়ে পাশের নদীটা পর্যন্ত লাল হয়ে উঠেছে। শ্মশানে একসঙ্গে তিনটা চিতা জ্বলছিল। চটানের মেয়ে-মরদেরা শ্মশানের কাঠ বয়ে কিছু পয়সা পেয়েছে। ঘাটোয়ারী বাবু সকলকে পয়সা দিয়েছেন। নেলীও হাত পেতেছে এবং পয়সা পেয়েছে। তারপর নেলী সন্তর্পণে বের হয়ে যাবার উপক্রম করতেই ঘাটোয়ারী বাবু ডেকেছেন, বলেছেন, এই ধর, টাকা দিলাম যত জলদি পারিস টাকা শোধ করবি। না করিস ত খাতায় নাম লিখব। হিসাব রাখব।

নেলী জবাব দিল, তা দেব বাবু। জলদি দিয়ে দিব।

এবং তখন দেখলে মনে হবে না যে সে দীর্ঘ সময় ধরে না খেয়ে আছে চটানে। মনে হবে না—সে কিছুক্ষণ আগেও ভুখা থাকার দরুণ পাগল বনে যাচ্ছিল। মনে হবে না—ভুখা থাকার জন্য সে কিছুক্ষণ আগেও গেরুকে গালমন্দ দিচ্ছিল। গেরু বলেছিল ওকে, তু নিশুতি রেতে একলা ঘাটে গেলি, গহনা খুঁজলি, তু ডাইনি বনে যাবি। তুব ভয় না করল! তখন নেলী গেরুকে গালমন্দ দিচ্ছিল. গেরু তু হামার খবরদারী মত্ কর। রেতে ঘাটে একা নেমে গিয়েছি ত হয়েছেটা কি! ঘাটে মড়া ছিল না, লেকিন হামার গঙ্গা-যমুনা ত ছিল। তু রামকান্তর ভয় দেখাচ্ছিস,

থোড়াই ভয় আছে ওয়ার। বে-সরমের কথা বুলে ত গঙ্গা-যমুনাকে দিয়ে ওয়ার চোখ তুলে লেবনা! লেকিন তু মরদ না আছে গেরু। কিছুক্ষণ আগে ঘাটে কাঠ নিয়ে যাবার সময় নেলী গেরুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে বলেছিল, তু মরদ না আছে গেরু। তু ভেড়ী আছে, তু পাঁঠা আছে। তুর বিবিকে লিয়ে ভিন আদমী রঙ্গরস করতে চাইবে, আর তু তখন দু চোখ মেলে ভেড়ীর মত তাকিয়ে থাকবি। মরদ থাকে ত নিয়ে চল অন্য চটানে। দুজনে ঘর বাঁধবি। তখন খবরদারী কর। বেমাফিক চলেছি ত মার-ধোর কর। লেকিন আভি তেরে এক বাত ভি হাম না শোনে। হাম ভুখা আছে। রঙ্গরসের বদলে পয়সা মিলে ত ও ভি হাম লেবে। ভালমানুষ হয়ে চটানে ভুখা না থাকবে। ডাইনী বনে যাবে ত সে ভি আচ্ছা।

নেলী সিঁড়ি ধরে নীচে নামল। মনে মনে সে এখন গেরুকেই খুঁজছে। হাতে ওর একটা টাকা—অনেক সম্পদ। অনেক আকাঙ্ক্ষা এখন নেলীর মনে। এক টাকায় কি কিনবে! কত কিনবে! এক সের চাল, এক পো ডাল, এক পয়সার পেঁয়াজ। দু পয়সার তেল। একটু নুন। সে খাবে, বাপ খাবে। গেরু খাবে কিনা তাও ভাবল। কাঠ বইবার সময় গেরুকে সে অনেক গালমন্দ দিয়েছে। গেরুকে বকে নিজেই কষ্ট পাচ্ছে এখন। চোখ তুলে এ-ঘর সে-ঘর দেখল। চটান দেখল। কোথাও নেই, কোনো ঘরে কেউ নেই। গেরু কোথাও নেমে গেছে, রেগে গেছে।

নেলী এবার শিবমন্দিরের পথে পড়ল। রামকান্তর দোকানে গিয়ে দাঁড়াল! এ-দোকানে সে দুটো পেঁয়াজ, একমুঠো চাল, একটু নুন বেশী পাবে। সেজন্য সে অন্য দোকানে গেল না, অন্য পথ ধরল না। রামকান্তর দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে হাঁকল, আট আনার চাল দে বাবু। দু আনার ডাল দে বাবু। দু পয়সার তেল, এক পয়সার নুন। এক এক করে নেলী সওদার নাম করে গেল, এক এক করে রামকান্ত সব বেঁধে দিল। তারপর নেলীর দিকে চেয়ে বলল, ভোর রাতে তোর বাপ চিল্লাচ্ছিল কেনরে?

জবাব দেবার আগে নেলী চটানের অন্য পাশে হল্লার শব্দ শুনল। ক্রমশঃ এদিকেই যেন আওয়াজটা এগিয়ে আসছে। সে দেখল ঢুখিয়া ছুটে ওর দিকে এগিয়ে আসছে। পিছনে গেরু ছুটছে। গেরুর হাতে বল্লম। ঢুখিয়া নেলীর সামনে এসে থেমে গেল। তু হামারে বাঁচা। গেরু হামারে বল্লমের হেকড় দিতে চাইছে।

নেলী দেখল, ঢুখিয়া ভয়ে কাতরাচ্ছে। ঢুখিয়ার মুখ দেখে নেলীর কষ্ট হল। নেলী তাড়াতাড়ি ঢুখিয়ার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর গেরুর দিকে চেয়ে বলল, আঃ যা তু। গেরুকে সে ডাকতে থাকল।

—আঃ আ, দেখি তুর কত মুরদ।

—মুরদ আছে, জরুর মুরদ আছে। বলে গেরু নেলীর পিছনে ছুটে গেল এবং ঢুখিয়ার গলাটা টিপে ধরতে চাইল। বলল, শালে কুত্তা! শালে বেইমান! নেলীকে তু বেশ্যা পেলিরে!

—গেরু তু চুপ কব। চুপ কর। কি করেছে বুল! নেলী গেরুর হাত ধরল এবার। চটানের দিকে টেনে নিয়ে যেতে চাইল।
—কি হয়েছে বুল?

গেরু কোনো উত্তর করতে পারল না। শুধু হাঁপাতে থাকল। শুধু এদিক ওদিক তাকিয়ে গজরাতে থাকল। সে নেলীর চোখ দেখল, মুখ দেখল। ওর দুঃখ বাড়ছে। অথচ কিছু বলতে পারছে না। বলতে পারল না—ও শালে বুলে কি নেলী, তু বেশ্যা। রামকান্তকে এ-সব কথা বুলেছে, আর মাগনা চপ ভাজা খাচ্ছে। বলতে পারল না, ও শালাকে হাম জরুর খুন করবে। জরুর হেকড় দেব বল্লমের। শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে নেলীর দিকে চেয়ে থাকল। গেরুর আফশোষ বাড়ছে—সে বলতে পারছে না, ঢুখিয়া দিন দিন বাবু হয়ে উঠছে। দিন দিন জায়দা পয়সা কামিয়ে টেরি কাটতে শিখেছে। কোঁচা মারতে শিখেছে। রামকান্তর দলে ভিড়ে নেলীকে অসৎ বানাতে চাইছে। কিছু বলতে না পেরে গেরু

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কঠোর উত্তেজনায় ভুগল। চটানের মেয়ে-মরদেরা এইসব দেখে হাসল আর হাসল। কারণ নেলী তখন গেরুকে শক্ত করে ধরে রেখেছে। গঙ্গা-যমুনার মত গেরু নেলীর বশ মেনেছে।

চটানে মেয়ে-মরদেরা সব ফিরে এল। উঠোনে মাদুর বিছিয়ে বিকেলের রোদ শরীরে মাখাল। লাস-কাটা ঘরে গোমানী আজ যায়নি। হাসপাতাল থেকে পুলিশ আসেনি। সে মাচানে পড়ে পড়ে সারাদিন গালমন্দ দিয়েছে। এখন নেলী দুটো বেঁধে খাওয়াবে জেনে নিশ্চিন্ত মনে চটানে ল্যাং খাচ্ছে। শীতের আমেজ আকাশ দেখে চিনতে পারছে। না খেতে পেয়ে মনটা এতক্ষণ কঠোব হয়ে ছিল, ওর দুঃখ হচ্ছিল হাসপাতালে আজ যেতে পাবল না, লাস-কাটা ঘরে পেট চিরতে পারল না মানুষের এবং চুবি করে ইস্‌পিরিট খেতে পারল না। বিকেলের মেজাজটা সে পাচ্ছিল না। ওব দুঃখ সেজন্যও। কিন্তু ঝাড়ো ডোমের ঘরে চর্বির গন্ধ। কিছুদিন থেকেই চর্বি খাওয়ার সখ হয়েছে গোমানীর। কিছুদিন থেকেই বলবে ভাবছিল নেলীকে, শূয়োরের চর্বি দিয়ে ভাত দে নেলী। চর্বির গন্ধটা বার বার পেটের যন্ত্রণাকে প্রকট করে তুলছে। নেলী ফিরছেনা এখনও, নেলী ঝগড়া করছে গেরুর সঙ্গে। কখন ফিরবে, কখন রান্না চড়াবে? কখন দুটো ভাত, একটু নুন, এক টুকরো পেঁয়াজ ওর পাশে রাখবে! সে এইসব ভাবতে ভাবতে একটু এগিয়ে গেল।

তখন ঘাটোয়ারী বাবু তাঁর নিজের চেয়ারে—সেই চোখ, সেই মুখ নিয়ে বসে আছেন। জানালার গরাদে চোখ রেখেছেন। গরাদের ফাঁক দিয়ে কত আগুন দেখলেন, কত শকুন উড়ল আকাশে, কত জল এই নদী ধরে সমুদ্রে নেমে গেল—অথচ তিনি তাঁর নিজের চেয়ারে। কত ধনী এল, কত গরীব এল ঘাটে, অথচ তিনি তাঁর নিজের চেয়ারে। এইসব দেখে এবং ভেবে তিনি স্থির করেছিলেন—মৃত্যু, মৃত্যুই সব. মৃত্যুই শেষ। মৃত্যুর জন্য দুঃখ, অথবা

মৃত্যুকে কেন্দ্র করে দুঃখ—উভয়ই পরিহাস-জনক। উভয়কেই তিনি ঘৃণা করে এসেছেন এতদিন। উভয়ের জন্যই তিনি গরাদের ফাঁকে কঠোর দৃষ্টি হেনেছেন। শিবের মত ত্রিনয়ন খুলে বলেছেন—পরম ব্রহ্ম নারায়ণ। ব্রহ্মই সত্য, জগত মিথ্যা। বলেছেন, কেঁদে কেটে কি হবে, জীবনে এটাইত নির্দিষ্ট ছিল। তবে কান্না কেন? আনন্দ করো, আনন্দ করো। অথচ তিনি যত মৃত্যুর মুখোমুখী হাজির হচ্ছেন, যত বয়স বাড়ছে, ততই বিষণ্ণ হয়ে পড়ছেন। ততই তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠছেন না। ততই তিনি কম কথা বলছেন। ততই তিনি যেন জগতের এই মিথ্যা মায়ায় জড়িয়ে পড়ছেন। তিনি চোখ ফিরিয়ে দেখলেন চটানে কৈলাশ মাচানে ঘুম যাচ্ছে, আর ওর বৌটা মনু ডোমের সঙ্গে এক খিলি পান খাওয়ার জন্য বায়না ধরেছে। মনু ডোমের সঙ্গে বৌটা পান খেতে চলে গেল। অশ্বত্থের ডালে সব কাকেরা ফিরে আসছে। ভোরে যে মরা কাকের বাচ্চাটার জন্য ওরা কেঁদেছিল এখন আর কাঁদছেনা। ডালে বসে ওরা বিশ্রাম নিচ্ছে। ঘাটোয়ারী বাবুর মনে হল তিনি যেন সারা জীবন বিশ্রামই করে এসেছেন। তিনি যেন মরে বেঁচে ছিলেন। তিনি দেখলেন এখন চটানে ঘরে ঘরে পোড়াকাঠের আগুন জ্বলে উঠছে। হাঁড়ি হাঁড়ি পচাই জড়ো হয়েছে চটানে। দুখিয়ার বউ মংলী পাঁঠার নাড়িভুঁড়ি দিয়ে চাট বানাচ্ছে। ঝাঁঝালো গন্ধ চটানে। চাটের ঝাঁঝ, মদের ঝাঁঝ। বাবুদের বাড়ীতে রেডিও বাজছে। তখন নেলী চটানে ফিরছে। গঙ্গা-যমুনা এধার ওধার খেয়ে ঢেকুর তুলছে। গেরু ঘরে ঢুকে বাপের পাশে শুয়ে পড়ল। বুঝি ঘুমোল। বুঝি রাতে ফের পাহারা দেবে। ঘাটোয়ারীবাবু অফিস ঘরে বসে সব দেখে এ-সব ভাবলেন।

নেলীর ঘরেও পোড়া কাঠ জ্বলে উঠছে। নেলী রান্না চড়াল, অন্য দশটা ডোমের মতই ওর রান্না। ঘাটের পোড়া কাঠে পুরোনো হাঁড়িতে ভাত হবে। ফ্যানটুকু গেলে প্রথমেই নেলী চুমুক দিয়ে খেয়ে নেবে। একটু নুন দেবে মুখে।

নেলীর ফ্যান খাওয়া গোমানী মাচানে বসে দেখল। ওর ইচ্ছা এ-সময় নুন মিশিয়ে সেও একটু ফ্যান খায়। তা নেলী যখন দিল না, গোমানী তখন বায়না ধরতে থাকল—হামারে এটা দে, ওটা দে। হামি ফ্যান খাব। হামারে আর ভুখা রাখিস না। পেট হামার হারমাদ হয়ে উঠল।

নেলী একটু ডাল সিদ্ধ করে নিল মালসায়। অন্য একটা মালসাতে বাপের জন্য ভাত বাড়ল। তারপর বাপকে খেতে দিল। নিজেও খেল এক সময়। ওরা জল খেয়ে দুজনই বড় রকমের ঢেকুর তুলল।

এখন ইচ্ছা করছে গোমানীর নেলীর সঙ্গে দু চারটা ভালমন্দ কথা বলে। ইচ্ছা হচ্ছে নেলীকে পাশে বসিয়ে আদর করতে। কিন্তু এ-সময়ে কেন জানি ফুলনের স্মৃতি ওকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। বাপ বঙ্গালী ডোমের কথা মনে হল। বাপ বঙ্গালী ডোমকে স্মরণ করে সে হাতজোড় করল। বাপের জন্যই হাসপাতালের চাকরী। বাপের জন্যই সে মাস গেলে আশিটা টাকা পায়। কিন্তু মাসের পনের দিন যেতে না যেতেই টাকাগুলো নিঃশেষ হয়—এজন্য ওর এখন খুব দুঃখ। নেলীর কথা ভেবে দুঃখ আরো গভীর। সে ভাবল, তারপর ধার-দেনা, তারপর সুদ গোনা। মাসের প্রথম তারিখে কিছু দেনা শোধ করা। মাসের শেষ দিকে নেলীকে খুন জখম করা। আর এও নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে মাসের শেষ দিকে দু তিনটে রোজ উপোস দেওয়া। চুপচাপ পড়ে থাকা মাচানে এবং নসিবকে গালমন্দ দিয়ে নিজে খুশী হওয়া। এ-সময়ে চটানটা ওর কাছে হারাম। মানুষগুলো সব অজাত-কুজাত। দুনিয়াটা রসাতলে যাচ্ছে।

বাপ বঙ্গালী ডোমও এ-কথা বলত ঘরে ফিরে—দুনিয়াটা রসাতলে যাচ্ছে। তখন গোমানী চটানে পড়ে থাকত না। সদর জেলের পাশে একটা কুঠরী ছিল—বাপ বঙ্গালী ডোম, মা সিঁদুরী সেখানে থাকত। গোমানী থাকত মা-বাপের সেই

কুঠরীটায়। বাপ সদর জেলে গলায় দড়ি পরাত। ফাঁসি দিত হারমাদ লোকদের। এবং ঘরে ফিরে মা সিঁতুরীকে বলত, তুনিয়াটা ডুবে গেল রে বুড়ি। বাপ বঙ্গালী ডোমের মত গোমানীও আজকাল এসব কথা বলতে শিখেছে। মেয়েটা দিন দিন ডাইনী বনে যাচ্ছে—এ-কথা ভাবতেও ওর কষ্ট হয়। রাতের আঁধারে মেয়েটা কখন যে বের হয়, আর কখন যে ফিরে আসে! রাতের আঁধার থেকে কি করে যে মালসা-মালসা ভাত নিয়ে আসে! কি করে যে মাঝে মাঝে এত সব খাবার যোগাড় করে নেলী! আশ্চর্য! আশ্চর্য! সব নসিব, নসিবের খেলা, নসিবের ভাঁওতা। নেলী ডাইনী বনে যাচ্ছে। যাক! যাবে। গোমানীর নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছা হল। ...র কামড়াতে ইচ্ছা হল গোমানীর, ভাল লাগে না এ সব। ভাল লাগে না। রাতে এমন সজাগ পহরা রেখেও মেয়েটাকে ধরে রাখতে পারছে না। মেয়েটা ভোর রাতে ভাত আনে, ডাল, তরকারী ভাজা আনে, মিষ্টি আনে—কিছু বলতে গেলে খেঁকিয়ে ওঠে! কিছু বলতে গেলে খটাশের মত মুখ করে কামড়াতে আসে। ঘাটে মড়া এলে নেলী অফিসে ঘুর ঘুর করবে। মড়ার নাম ধাম, মড়ার হদিস নেবে। শেষে নেলী রাতের আঁধারে গঙ্গা-যমুনাকে নিয়ে বের হয়ে পড়বে। বাড়ীটা খুঁজবে। খুঁজে বের করার পর একাই রাতের জন্য অপেক্ষা করতে থাকবে। কোনোদিন পাবে কিছু, কোনোদিন পাবে না। বাপকে ভালমন্দ খাওয়াবার এবং নিজে ভালমন্দ খাবার লোভ কিছুতেই সামলাতে পারবে না। তখন চটানের কোণে মরদদের চোখ টাটায়। তখন ওরা হাজার রকমের ঠাট্টা-তামাসা করে! তখন গোমানী মাচানে বসে গজরাতে থাকে, মেয়েটার গলাটিপে ধরতে ইচ্ছা হয়, অথচ যখন মালসা থেকে নেলী খাবারগুলো আলগা করে বাপকে দেয়, তখন বাপ খুশী হয়ে বলবে, তুটো রেখে দিস্। অথচ গোমানী খেতে আরম্ভ করলে সে-সব কথা মনে

থাকে না। এতটুকু পেটে মালসা-মালসা খাবার গিলে বলবে, হামি ব্যারামী নাচারী লোক আছি। দুটো জায়দা খেয়েই লিবে।

শীতের রোদ যত চটান থেকে নেমে যেতে থাকবে, তত চটানটা নিজের স্বভাব খুলে ধরবে। তত চটানটা মাতাল হতে সুরু করবে। পচাই খাবার জন্য প্রায় ঘরেই এখন চাট হচ্ছে। গোমানীর ঘরে চাট হচ্ছে না। কিন্তু গোমানী ঝাড়ো ডোমের সঙ্গে এখন কথাবার্তা বলছে। একটু পচাই গিলবার জন্য ভাব জমাচ্ছে। এমন শীতের সন্ধ্যাটা মাটি হোক, সে তা মনে মনে চায় না। ঝাড়োর সঙ্গে ভাব জমুক, দু ঢোক পচাই গিলতে পারুক, তেমনি ইচ্ছা ওর। ল্যাং খেতে খেতে এবার সে ঝাড়োর দাওয়ায় গিয়ে বসল। ঝাড়ো ডোমের বিবিকে ডাকল। দুটো মিঠা বাত বলে বিবির মন ভিজাতে চাইল। তারপর লাস-কাটা ঘরের গল্প জমিয়ে সেই দাওয়ায় জাঁকিয়ে বসল। এখন আর কে আছে তাকে দাওয়া থেকে তোলে। এখন কে আর আছে এ ঘরে, ওকে দু চুমুক না দিয়ে খায়। এখন এমন কার হিম্মত আছে, শীতের সন্ধ্যাটা মাটি করতে পারে। সেজন্য গোমানীর দুনিয়া এখন মজাদার দুনিয়া খুব খুবসুরত দুনিয়া। এ দুনিয়াতেই বেঁচে সুখ। ঘাটে তিন তিনটে চিতা জ্বলছে—আহা এ দুনিয়াতেই বেঁচে সুখ। তিন তিনটে চিতা জ্বলছে, আকাশ লাল হচ্ছে মাটি লাল হচ্ছে। নদীর লাল বড়—চটানের ঘরে ঘরে বিবিরা লাল নীল হচ্ছে। লাল নীল কথা বলছে। জোয়ান মরদেরা শরীর রাখবার জায়গা পাচ্ছে না। জোয়ান বৌ-ঝিরা বেসামাল হয়ে পড়ছে। দুখিয়ার বৌ মংলী দুলতে দুলতে অন্য ঘরে যাচ্ছে। দুখিয়া ওর হাত টেনে রাখতে পারছে না। —ছোড় দে তু, মুঝে ছোড় দে। হাম চল যাও কাহাভি। তুর সাথ আর ঘর না করে। ভোরের আর্শি দেখা, ঘাটের দামী কাপড়টায় রং, এক খিলি পানের রস ঠোঁটে, পচাই খাওয়ার পর উগ্র হয়ে উঠেছে। হে হে করে ঢোল

বাজাচ্ছে মনু ডোম। মংলী দরজায় কার গানের শব্দ পেল। লোকটা এসেছে। মংলী উধাও হতে চাইল।

ঘাটোয়ারীবাবুও দরজায় কার পায়ের শব্দ পেলেন। —কে দরজায়? ঘাটোয়ারীবাবু প্রশ্ন করলেন।

—হামি কৈলাশ আছে বাবু!

—এ-অবেলায় কেন আবার?

—ফরাসডাঙায় যাচ্ছি।

--ফরাসডাঙায় যাচ্ছিস ত এখানে কি?

—একটা কথা বুলতে এলাম বাবু। যদি মেহেরবাণী করে শোনেন। যদি থোড়া দয়া হয়।

—দয়া বুঝিনে। যা বলবার বলে ফেল।

--হামি ত বাবু বেশী দিন বাঁচবে না। গেরুর লাগি বহুত চিন্তায় আছি। হামি মর যানেসে গেরু কি করবে কেনা জানে বাবু। দু চারটো বাত আপনার পাশ বুলে লিব। দু চারঠো আর্জি আপনার পাশে পেশ করব। এই সব বলে কৈলাশ দরজার উপর বসে পড়ল। ফের বলতে থাকল, ওকে একটু দেখে লিবেন বাবু। হামি মর যায় তো ওয়ার কৈ না থাকল। দু চারঠো ঘাটের মড়া দিয়ে গেরুকে বাঁচিয়ে লিবেন। আপ ওয়ার মা-বাপ।

ঘাটোয়ারীবাবু কোনো জবাব দিলেন না। কৈলাশ কোন জবাবের প্রতীক্ষা না করে চলে গেল। অনেকদিন থেকেই সে ভেবেছিল ঘাটোয়ারীবাবুকে গেরুর ভার দিয়ে নিজে খালাস পাবে। নিজের দায় থেকে মুক্তি পাবে, অথবা নিজের মৃত্যুর পর গেরুর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে।

ঘাটোয়ারীবাবু কৈলাশের কথা ভেবে একটু অন্যমনস্ক হলেন। একটু বিচলিত হলেন। লোকটা সারা জীবন মড়ার পিছনে ছুটে শেষ বয়সে অন্য একটা বাচ্চার জন্য হাউ হাউ করে কাঁদতে চাইল। তিনি কৈলাশের চোখ দেখে যেন সব ধরতে পেরেছেন।

কৈলাশ অফিসের বারান্দা থেকে নেমে এল। তারিজের উপর দিন দিন যত বিশ্বাসটা ভেঙ্গে যাচ্ছে, তত সে নিজেকে খুব অসহায় মনে করছে! তত গেরুর জন্য চিন্তা বাড়ছে। ঘুম থেকে উঠে সে দেখল গেরুটা ওর পাশে শুয়ে আছে। বেড়ালের বাচ্চার মত ঘুম যাচ্ছে। ওর কেমন মায়া হল। কেমন করে গেরুর মার কথা মনে পড়ে গেল। সেই সুখের দিনগুলোর কথা এক এক করে মনে করতে পারল। যত মনে হল তত দুঃখ পেল। তত গেরুর জন্য মমতাবোধ বেশী জন্মাল। তত বাচ্চাটার জন্য ওর বেশী চিন্তা হল। ঘাটোয়ারী-বাবুকে বলতে পেরে সে এখন যেন খুব হাল্কা বোধ করছে।

কৈলাশ ঘরে ঢুকে এক ছিলিম তামাক খেল। গেরু ঘুমোচ্ছে —ঘুমোক! আজ আর গেরুকে ফরাসডাঙায় নিয়ে গিয়ে কাজ নেই। পর পর দু রাত জেগে থাকলে শরীরটা ওর খারাপ হয়ে যাবে। সেজন্য কৈলাশ হ্যারিকেন জ্বালিয়ে এক ভাঁড় পচাই হাতে, বল্লম নিয়ে নদীর পথে নেমে পড়ার আগে বৌকে বলল, আজ ফের হামলা ব্যধাবিনা ঘাটোয়ারীবাবুর দরজায়। তবে খুন কম্বব বুলে দিলাম।

ঘাটের তিনটে চিতা তখন নিভে আসছে। কৈলাশ নদীর পথ ধরে ফরাসডাঙ্গায় চলে গেল। খেয়া ঘাটে আলো জ্বলেছে। ওপারে গরুর গাড়ার নীচে হ্যারিকেন দুলছে। দুটো একটা শীতের ব্যাঙ গর্তে মুখ লুকিয়ে ক্লপ ক্লপ করল। নদীর ধারে লোক চলাচল কমে আসছে, শীতের রাত বলে পথ ঘন আঁধার না হতেই নিঃসঙ্গ হয়ে উঠছে। শুধু নদীর ঢালুতে দু চারজন লোক কাঁচা কয়লায় আগুন ধরিয়ে ছইয়ের নীচে তুলসীদাসী রামায়ণ পড়ছে। ছইয়ের নীচে হ্যারিকেন ঝুলছে। লণ্ঠনের আলোয় ওদের মুখ শীতের রাতে গর্তের ভিতর ক্লপ ক্লপ শব্দ করা ব্যাঙের মত। গঙ্গা যমুনা মাটি শুঁকতে শুঁকতে সেদিক দিয়ে গেল। ওরা ব্যাঙের মত মুখগুলো দেখে আর দাঁড়াল না। এখানে খাবার নেই এ-সব মুখ দেখে বুঝতে পারল।

গেরু ঘুম থেকে উঠে দেখল চালাঘরটায় সে একা। ঘরটায় কোন লম্ফ জ্বলছে না। সে উঠে চারপাশের মাচানটা হাঁতড়াল। বাইরে একটা লম্ফ জ্বলছে। সৎ মা ঘরে নেই গেরুর। সে তার শরীরের জড়তা নিয়ে মাচান থেকে নামল। সে বাপকে খুঁজল। বাপ চটানে নেই। ঘরে হ্যারিকেন নেই, বল্লম নেই—বাপ আজ একাই ফরাসডাঙ্গায় গেছে। বাপ ওকে ঘুম থেকে ডেকে তোলেনি। বিরক্ত করেনি তাকে। বরং এক ভাঁড় পচাই মাচানের নীচে পড়ে আছে। সে বুঝল ওটা ওর জন্য রেখে গেছে বাপ। বাপের বৌটা এখন অন্য কোন ঘরে হয়ত চাট দিয়ে পচাই গিলছে। চালাঘরে সে তার নিজের ভাঁড়টা দিয়ে মাংসের চাট খুজতে থাকল। এবং ভাবল নেলীকে ডেকে একটু পাচাই খাওয়াবে। বাপ যখন ঘরে নেই, বাপের বৌটাও যখন নেই, তখন তারা দুজনে নিশ্চিন্তে বসে এ-ঘরে পচাই গিলতে পারবে।

আগুনের পাশে চুপচাপ বসে আছে নেলী। উনুন থেকে আগুনের উত্তাপ নিচ্ছে। দুদিন পর বাপ দুটো অবেলায় খেয়ে, ঝাড়োর ঘরে একটু পচাই টেনে সকাল সকাল মাচানে ঘুমিয়ে পড়েছে। ইচ্ছা করেই নেলী লম্ফ জ্বালল না। আঁধারটা ওর ভাল লাগছে। ওর ইচ্ছে এ-সময় গেরু এসে ওর পাশে বসুক একটু পোড়া কাঠের উত্তাপ নিক। মনু ডোমের ঢোলবাজানোর শব্দ আসছে না আর। ঝাড়ো ডোমের ঘরে সকলে ঝিমিয়ে পড়েছে। হরিতকীর ঘরে আলো জ্বলছে এখনও। বাচ্চাটা দুবার ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদল। বাচ্চার কান্না নেলীর মনে আদর করার সখকে প্রকট করে তুলছে। পোড়া কাঠের উত্তাপে নেলীর মুখ লাল। মনের ভেতর এখন আগুনের রঙ। বুকের ভিতর ইতর সখগুলো গেরুর মত একটা ছোট কাঠের পুতুল বানাতে চাইছে। সেজন্য সমস্ত শরীরে আগুনের রঙটা গলে পড়ছে যেন। নেলী বসে থাকতে পারছে না। গেরু হয়ত ফরাসডাঙ্গায় গেছে। নতুবা সে এখন গেরুর ঘরে গিয়ে আর কিছু না হোক কাঠের পুতুলটার

জন্য রঙ গুলতে পারত। নেলী ছুদিন পর পেট ভরে খেতে পেয়ে চটানটাকে ফের ভালবেসে ফেলল। সেজন্য মুখোমুখী বসে রঙ গুলতে চাইল সারারাত।

গেরু সন্তর্পণে এসে উনুনের উপর মুখ বাড়াল তখন। —হামার ঘরে চল নেলী। গেরু ফিস ফিস করে বলল যেন গোমানী না শুনতে পায়। —এক ভাঁড় পচাই আছে। তু আর হাম খাবে। ঘরে বাপ নেই, মায়ি ভি নেই। তু চল।

নেলী বলল, না যাবে না। তুর পচাই তু খা।

—যাবি না ক্যানে? গেরু নেলীর হাতটা চেপে ধরল।

—হাত ছাড় গেরু। হাত না ছাড়বি ত বাপকে ডাকব।

—তু চল নেলী।

নেলী উঠে পড়ল উনুনের পাশ থেকে। ওখানে বেশী কথাবার্তা বললে বাপ জেগে যাবে। বাপ তবে অনর্থ ঘটাবে। ওরা এসে শূয়োরের খাটালটার পাশে দাঁড়াল। কাঠ গোলা বাঁ দিকে রয়েছে। ওখানে ঘন আঁধার। ওখানে কোনো লোকজনের সাঁড়া পাওয়া যাচ্ছে না। ওখানে বড় নির্জন, বড় নিঃসঙ্গ। সুতরাং নেলী জোরেই কথা বলতে পারল। —তু যে বল্লমের হেকড় দিতে চাইলি ছুঃখিয়াকে যদি তোর জেল হয়, যদি তোর গলাটা যায় তখন কেমন হবে।

—ও তুকে বেশ্যা বানাতে চাইছে।

—বেশ্যা বানাতে চেয়েছে ত হয়েছেটা কি।

—রামকান্ত খুব খুশী হচ্ছিল এ-সব বাতচিত শুনে।

—তুর সাথ গেলে তুভি ত খুশী হবি। তু পচাই খেতে বুলে হামারে লোভ দেখাতে চাস।

গেরু জবাব দিতে পারল না। ওর এমনই যেন একটা ইচ্ছা শরীরে এতক্ষণ ধরে কাজ করছে। আঁধারে সে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল। নিজেকে অপরাধী ভাবল। নেলীও আঁধারে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারছে শরীরের যন্ত্রণায় গেরু কথা বলতে

পারছে না, থর থর করে কাঁপছে। অনেক আশা নিয়ে গেরু উনুনের উপর মুখ বাড়িয়েছিল। অনেক আশা নিয়ে এসেছিল সে দুদণ্ড নেলীকে কাছে পাবে বলে। নেলী হাসল। গেরুর হাত ধরে বলল, চল গেরু, পচাই লিয়ে নদীর ঢালুতে চল। লেকিন তু হামার গায়ে হাত না দিবি কথা থাকল। তু হামারে ঢালুতে বেশ্যা না বানাবি কথা থাকল।

সেই নিঃসঙ্গ আঁধারে গেরু প্রতিজ্ঞা করল যেন মাথা নেড়ে—সে কখনও হবে না। জান যাবে লেকিন বাত ঠিক থাকবে, গেরুর চোখে-মুখে নেলীর জন্য এমনই একটি আশ্বাস। গঙ্গা-যমুনা সঙ্গে থাকল। দরকার হলে গঙ্গা যমুনা-পাহারা দেবে।

সরিসৃপের মত ঘন আঁধারের শরীর ভেঙ্গে গেরু, নেলী মদের ভাঁড় নিয়ে নদীর ঢালুতে নেমে গেল। আঁধারে সাদা বালিয়াড়িটা বাসি দুধের মত পড়ে আছে। ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকছে। বাবলার ঘন বনে জোনাকী জ্বলছে। দূরে সহরের আলোগুলোতে গঙ্গা পূজোর রাত্রির উৎসব বলে মনে হচ্ছে। মানুষের সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। বড় ঘন এ-আঁধার। বড় গভীর এ-আঁধার—অথচ গঙ্গা-যমুনার চোখের মত স্বচ্ছ। উপরে তখন আকাশের তারাগুলো গর্ভবতী হতে চাইছে। গর্ভবতী হওয়ার ইচ্ছা যেন নেলীর।

গাং শালিকের সেই শব্দটা কুন্নুয়া, কুন্নুয়া. কাকের সেই কাঠ কাঠ শব্দ—ক্ক ক্ক আর শালিকের শব্দ খেররো ঘেররো—মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে ভোরের কথা বলছে। ঘাসে ঘাসে শিশিরের জল। নালা ডোবায় মরা ইঁদুরের পচা গন্ধ। ঝোপে জঙ্গলে পাতারা সব শুকোচ্ছে, পাতারা সব পচে, ফসিল হতে চাইছে। বেশ্যা পটিতে মেয়েরা বিছানা ছেড়ে উঠতে পারছে না। হাতে পায়ে

ব্যথা, কোমরে ব্যথা। সমস্ত রাত ওদের শরীরে বড় ধকল গেছে। ওরা আশা করছে বিছানাতেই যদি এক কাপ চা হত।

গঙ্গা থেকে স্নান সেরে ওঠার সময় ঘাটোয়ারীবাবু স্তোত্র পাঠ করেন। তারপর গীতার প্রথম পর্ব থেকে শেষ পর্ব। শিব মন্দিরের পথ ধরে উঠে আসার সময় কেমন চঞ্চল হয়ে ওঠেন মাঝে মাঝে। কারণ একবারে ডানদিকের পথটা ধরে তিনিও সে অঞ্চলে ধাওয়া করতেন। আজ তারা আর নেই। অথচ হাতে সময় নেই যেন। কিন্তু তিনি যখন চেয়ারে বসে থাকেন, অথবা শূন্য দৃষ্টিতে যখন ঘাটটা পর্যন্ত শূন্য ঠেকে, তখন এইসব মুখদের মনে করতে পারেন, তখন তাদের ভালবাসার কথা মনে হয়। এইসব বেশ্যাবৃত্তিকে ভালবাসতে ইচ্ছা হয়। তিনি পথের পাশে সেজন্য রোজ একটু থামেন। যারা একে একে এই পথ ধরে বের হয়ে আসে তাদের তিনি দেখেন। কোনো পরিচিত ভদ্রলোককে দেখলে মুখ টিপে হাসেন। তখন আকন্দ গাছটার নীচে তোলা ছবিগুলোর কথা মনে হয়। আকন্দ গাছটার নীচে যে সব অন্য ছবি উঠবে তাদের ভিতর এ-মুখকে দেখার বাসনা জাগে।

তিনি অফিসঘরে ঢোকার সময় শুনলেন গোমানী ডোম মাচানে পড়ে পড়ে কাশছে। তিনি বিরক্ত হয়ে দেয়ালের ছবিগুলোয় গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিলেন। —বেটা শালা মরবে। কেশে কেশে মরবে। সে জন্য বেটা তুই ভাবিসনে, আকন্দ গাছটার নীচে তোর ছবি উঠবে। ভাবিস না বাবুদের মত তোর ছবিও আমি ঘরে রাখব। গোমানীকে তিনি মনে মনে যতটা পারলেন গালমন্দ দিলেন। তা ভাবিস না বাপু তা ভাবিস না। যারা ইতর, বদমাইস তাদের ছবি আমি রাখি না। তাদের ধূপধুনো আমি দিই না।

ঘাটোয়ারীবাবু ঘরে ঢুকে প্রতিদিন যা করেন, আজও সেইসব কাজগুলো করলেন। ভিজা গামছা দিয়ে দেয়ালের ছবিগুলোকে মুছে দিলেন। সামনের আকন্দ গাছটার নীচে এক ঘটি জল ঢেলে

দিলেন। যতবার এই গাছটার নিচে ছবি উঠেছে, ততবার তিনি একখানা পাবার আশা রেখেছেন। ততবার তিনি সেই ছবির জন্য অপেক্ষা করেছেন। কেউ দিয়েছে, কেউ দেয়নি। যারা দিল তাদেরগুলো তিনি সযত্নে দেয়ালে টানালেন। ধূপধূনো দিলেন। বললেন, হরিবোল। বললেন, পরমব্রহ্ম নারায়ণ। প্রত্যেক কাজগুলো এখনও তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে করেন। তারপর ভিজা কাপড় ছেড়ে শরীরে চাদর জড়িয়ে জানালায় উঁকি দিলেন—কেউ উঠেছে কিনা চটানে, কেউ এদিকে আসছে কিনা দেখলেন। এ সময় একটু মহাদেবকে, বাবা ব্যোম ভোলানাথকে স্মরণ করার দরকার হয়। তার পায়ের তলায় বসে প্রসাদ পেতে ইচ্ছে হয়। এখন কৈলাসের আসার কথা, গোমানীর আসার কথা, শীতের ভেতর ওরা ল্যাং খেতে খেতে আসবে।

সামনের বারান্দায় ঝাড়ো ডোমের বেটারা কাঁথা-কাপড়ের নীচে থেকে উঁকি মারছে। এ ভোরে মনুডোম পায়রা উড়াচ্ছে আকাশে। নেলীর বাঘের মত কুকুর দুটো চোখ মেলে ভোরের আকাশ দেখছে। আর এ-সময়ই ছোট চাকুটার দরকার হয় ঘাটোয়ারীবাবুর। এক ছিলিম গাঁজা, হলদে একটা নেকড়ার দরকার হয়। যত ভোরের সূর্য উপরে উঠবে ততই নেশার জন্য মনটা আকুপাকু করবে। ততই তিনি গোমানী ডোমের প্রতীক্ষায় ঘরময় পায়চারী করবেন। ততই তিনি এই চটানের উপর অধীর হবেন।

তিনি ফের জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে যখন দেখলেন, কেউ উঠছে না, কেউ এদিকে আসছে না, তখন অগত্যা ডাকতেই হল, ওরে শালো গঙ্গা পুত্তুরের দল, ওরে শালা গোমানী, তোরা ঘুম থেকে উঠবিনে।

বাবুর ডাক শুনে গোমানী ডোম চালা ঘরটার মাচানে ধড়ফড় করে উঠে বসল। বাবু ডাক দিয়েছেন।

পড়ি কি মরি করে এখন ছোটার ইচ্ছা ওর। সে এই ডাকের জন্যই মাচানে এতক্ষণ প্রতীক্ষা করছিল। ঘাটোয়ারীবাবু ডাকবেন—

তবে সে উঠবে, তবে সে যাবে। ভোরে দরজায় বসে থাকলে বাবু খেঁকিয়ে উঠেন। —মাগনা গ্যাঁজা টানতে এয়েছেন। ভাগ বেটা ভাগ। গোমানী সে জন্য মাচানে শুয়ে প্রতীক্ষা করছিল এতক্ষণ।

গোমানী ধীরে মাচান থেকে নামল। নেলী টের পাচ্ছে না। সে যাচ্ছে। যাবে। শীতে পা ফেটে গেছে। জায়গায় জায়গায় গোড়ালীটা হাঁ করে আছে। মাটিতে পা ফেলতে বড্ড কষ্ট। মাটিতে পায়ের চাপ যত বাড়ছে মুখটা ততই ভয়ানকভাবে কুৎসিত হয়ে উঠেছে।

ধীরে ধীরে পায়ের চাপ মাটিতে চলার মত করে নিজেকে রপ্ত করে নিল। বাকী আমের আঁঠাটুকু উনুনে তাড়াতাড়ি গরম করে গোড়ালীর ফাঁকে ফাঁকে লাগিয়ে নিল। তারপর অনেক কষ্টে হাঁটতে থাকল এবং কোনোরকমে ঘাটোয়ারীবাবুর ঘরে ঢুকে গেল। বলল, আমি যে বাবু উঠেই আছিগ। কাশিতে আর ঘুম আসে কৈ। গোমানী গায়ের কাঁথাটা শরীরে ভালভাবে জড়িয়ে ফের খক্ খক্ করে কাশল। কাশতে কাশতে নুয়ে পড়ল। কাশির গমক কমে এলে বাবুর দিকে মুখ বাড়িয়ে বলল, মন চিন্তা করল বাবুর কাশি না শুনলে আর উঠছিনে। লেকিন বাবু আজ আপুনিত কাশলেন না।

ঘাটোয়ারীবাবু জবাব দিচ্ছেন—চোখ দুটো লাল। তিনি জবাব দিচ্ছেন—চোখ দুটো গোলকের মত হয়ে উঠছে।—আমার ন্যাজোরের ছাও! আমার কাশি না শুনলে বাবু উঠবেন নি! শালা ডোম আমি কি তোর মত। কাশি আমার লেগেই থাকবে। আমি কি শালা ইস্‌পিরীট খোর! তোর মত কাশি না থাকলে ভোরে আমার ঘুম ভাঙ্গবে না!

গোমানী জানে এ-সময় কোন উত্তর দিতে নেই। ভালো কি মন্দ—যে কোনো জবাবে বাবু চটবেন। বাবু গালমন্দ করবেন। এক ছিলিম গাঁজার জগত থেকে ওকে তাড়িয়ে দেবেন।

সেজন্য গোমানী কোনো জবাব দিল না। ছোট চাকুটা কাঠের উপর শুধু ঘসতে থাকল।

শীতে বাবুর হাত দুটো বরফ হয়ে গেছে। তিনি দুটো হাত চকমকি কাঠের মত ঘসলেন। গোমানী এখন নীচে বসে প্রসাদ তৈরী করছে। গোমানীকে দেখলে গহনীর কথা মনে হয় ঘাটোয়ারীবাবুর। কোন এক বর্ষার কথা মনে হয়, কোন এক বীভৎস মৃত্যুর কথা মনে হয়। মৃত্যুর পর গহনীর মুখটা যেমন বীভৎস ছিল, এখন এই ঘরে গোমানীর মুখ যেন তেমন। যেন সেই গহনীর মৃত্যুর পর ওর মাথার লক্ষ লক্ষ উকুনের গৃহত্যাগের পরিণামের মত। বড় কষ্টে মৃত্যু, বড় শোকে মৃত্যু।

কলকেতে আগুন দিয়ে গোমানী বাবুকে বাড়িয়ে ধরল, —নেন বাবু।

বাবু এ-সময় একটু অন্যরকম হয়ে পড়েন। গাঁজা ফোঁকার আগে তিনি পৃথিবীর পরিণাম ভেবে বড় বিষণ্ণ হয়ে পড়েন। তিনি কলকেতে হলদে নেকড়াটা জড়িয়ে নেবার সময় বললেন, গোমানীরে!—একটা বড় রকমের দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। ফুসফুসের সমস্ত শ্বাসটা খালি করে কলকেটা এবার মুখে চেপে ধরলেন।

গোমানী আসনপিড়ি বসে নন্দীভৃঙ্গি সেজে আছে। বাবু এখন কোন্ কোন্ কথাগুলো বলবেন এবং কি জবাব দিতে হবে সব গোমানীর ঠিক করা আছে।

বাবু ধোঁয়া টেনে ফের ডাকলেন— গোমানীরে!

—বুলেন বাবু!

—লাস-কাটা ঘরে তুই হাজার হাজার মড়া চিরেছিস নারে?

—তা অনেক বাবু। বহুত। লাখ হয়ে যাবে বাবু। যোয়ান মেয়ের পেট চিরেছি হাজার। পেট চিরে বাচ্চা বের করেছি কত।

নেশার জগতে ঘাটোয়ারীবাবু লাস-কাটা ঘরে চলে যান। টেবিলের সেই সব যুবতী মেয়ের শ্বাসে তিনি বিচরণ করতে থাকেন। লাস-কাটা ঘরের গল্প শুনে তিনি মনে মনে বিকৃত হয়ে উঠেন।

সেইসব টেবিলের পাশে বিচরণ করতে করতে মনে হয় তিনি পাগল হয়ে গেছেন অথবা মাতাল। পশুর মত ইচ্ছার বৃত্তিতে সাঁতার কাটার ইচ্ছা। লাস-কাটা ঘরের গল্প, নেশার ঘোরে বড় জমজমাট। তিনি বলবেন—তারপর গোমানী ?

তারপর ওরা কলকেটা আরও দুচারবার হাত বদলাল। কলকেতে যখন কোনো আর অবশিষ্ট থাকবে না, তখন চুপ হয়ে বসবে। কেউ কোনো কথা বলবে না। গোমানী না, বাবু না, কৈলাশ থাকলে সেও না। চুপচাপ বসে নেশা হজম করবে। ওরা দুজন এখন নন্দীভৃঙ্গি হয়ে গেছে—নন্দীভৃঙ্গির মত চোখ মুখ। ওরা দুজন চটানের বুকে সন্ন্যাসী সাজল। বাইরের জানলায় তখন রোদ নামব-নামব করছে। পাশের কলতলায় দুটো একটা ঘটি আসতে সুরু করেছে। চটানের মানুষগুলো এক দুই করে যে যার কাজে নেমে যাচ্ছে। খাটালে শূয়োর নেই। ঝাড়ো ডোম লাঠির দুপাশে ডালা কুলো নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। মনু ডোমের কবুতরগুলো নেমে এসে ঝাউ-গাছটায় বসল। মংলী তোষক-লেপ থেকে তুলা বের করল। হরিতকী জল রোদে দিয়ে বাচ্চা পাহারা দিচ্ছে। কার বাচ্চা, কে জন্ম দিল, সে সব এখন আর হরিতকীর মনে নেই। সে যা হতে পেরেছে ওর কাছে এটাই বিল কুল সত্য।

গত রাতে নেলীও মা হতে চেয়েছিল নদীর ঢালুতে। খুব সখ জন্মেছিল বালিয়াড়িতে গেরুকে নিয়ে পড়ে থাকতে। কিন্তু গেরু তখন বলেছে—তুকে হাম বেশ্যা বানাবে! তু হামারে ও বাত না বলিস। দোহাই তুর ডাকঠাকুরের। কিন্তু নেলী যথেষ্ট পরিমাণে পচাই গিলে মাতাল হয়েছে। শপথের কথা ভুলে গেছে। রাতের আঁধার, বালিয়াড়ির বাসী দুধের মত রঙ ওর মা হওয়ার ইচ্ছাকে প্রকট করে তুলেছিল। সেজন্য প্রথমে গেরুর হাত ধরে টেনেছে নেলী, তারপর গেরুকে জড়িয়ে ধরে পিষে ফেলার উপক্রম করল। নেলী যেন ডাইনী বনে গেল। গেরু ভয় পেল। নেলীর চোখ দুটো কেমন সাপের চোখের মত হয়ে উঠেছে। আর বলেছে, তু হামারে

ছেড়ে দিসনা গেরু। শক্ত করে ধর। তু ছেড়ে দিলে হামি বাঁচবে না। শরীরে আগুন জ্বলছে। হামারে তু থোড়া শান্তি দে, শান্তি দে তু।

তবু যখন গেরু হাত দিয়ে ঠেলে দিচ্ছিল নেলীকে, যখন নিজের কাপড়টা সামলাচ্ছিল, শরীর আড়াল দিচ্ছিল এবং ওর নেশা ভাঙ্গাবার জন্য বার বার বলছিল, ও ঠিক না আছে, তখন নেলী বলছিল, তু গেরু মা হতে দিবিনে। হামারে বাঁচতে দিবিনে চটানে! তারপর বালিয়াড়িতে একটু ধস্তাধ্বস্তি হয়েছিল। গেরু যত জোর করে শরীরটা সরিয়ে নিতে চেয়েছে, তত নেলী গেরুকে দু হাতে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করেছে। শেষ পর্যন্ত গেরু বাধ্য হয়েছিল নেলীকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে এবং চটানে ছুটে আসতে। নেলী সত্যি যেন দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছে—ডাইনী বনে যাচ্ছে। দুখিয়া যেন ঠিক বলেছে। অথবা পাগল হয়ে গেল। নেলী মা হওয়ার জন্য পাগল হয়ে গেল। চটানে উঠে এসে সে হাল্‌কা বোধ করেছিল।

সে নিজেকে বাঁচাবার জন্যই যেন হাঁপাতে হাঁপাতে চটানে এসে উঠেছিল। সেজন্য ভোরে নেলীর মাচানে নেলী পড়ে থাকল, গেরুর মাচানে গেরু। গত রাতের ঘটনার কথা ভেবে দুজনেই দুজনের সঙ্গে দেখা করতে লজ্জা পাচ্ছিল। ওরা উঠছিল না সেজন্য মাচান থেকে। ঘুমের ভান করে মাচানে পড়ে আছে। যেন কত ঘুম চোখে। যেন কতকাল ওরা ঘুমায়নি। অথবা ভোরের এই ঘুমটা ওদের ছাড়তে চাইছে না। ওরা যতটা পারছে ঘুমিয়ে নিচ্ছে।

জানালায় রোদের রঙটা আরও ঘন হয়েছে। মেঝেতে রোদ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে। এখন ঘাটোয়ারীবাবুর শরীরে রোদ, মুখে রোদ। জানালা পার হয়ে একটা লোক নেমে গেল। গিরীশ বুঝি। বাবুচাঁদের বাপ। রেলওয়ের ঘুন্টিম্যান। সে এ-সময় ওপারে যায়। বাবুচাঁদ শূয়োরের ব্যবসা করে।

পাকা ঘর তুলেছে ব্যবসা করে। চটান থেকে দূরে ঘর করেছে। খাটালের জায়গাটুকু এখনও ছাড়ছে না। বাপ পিতামহের জায়গা ছাড়তে নেই।

ঘাটোয়ারীবাবু এখানে বসে খাটাল দেখতে পাচ্ছেন। কাঠগোলা দেখতে পাচ্ছেন। কাঠগোলার পরে বাবুদের পুরোনো দেয়াল। তারপর ভদ্র পল্লী। তিনি জানেন সেখানে যারা বাঁচে, তারা চটানের মত হয়ে বাঁচে না। সেখানে ঘর আছে, গৃহিণী আছে। পুত্র-কন্যা আছে। দৈনন্দিন বাজার-হিসাব আছে। সুখ আছে, দুঃখ আছে, কিন্তু চটানের মত আগুন নেই। নাচন-কোঁদন নেই।

ঘাটোয়ারীবাবুর চোখ দুটো জ্বলছে তখন। গোমানী চোখ বুজে ঝিমোচ্ছিল। তিনি ডাকলেন, এই শালা ঝিমোচ্ছিস্ যে। মাগনা প্রসাদ পাও তার দাম দিতে জান না!

—আজ্ঞে হামিত ঢুলছি। ঝিমোচ্ছি না।

—রক্তের তেজ এখন নেই নারে?

—বাবু ও বাত কেনে বুলছেন?

—বলবনা! তুই ত পেট চিরেছিস, কিন্তু পেট চিরে বাচ্চা বের করেছিস?

—কত! কত!

—কত! কত! ঠোঁট উল্টে বাবু বিদ্রূপ করলেন, কটা করেছিস?

—কত হবে? সে যে অনেক বাবু। লেখাজোখা নাই। তা হাজার হবে বাবু ধরে লেন।

—তুই বললি আর অমনি আমায় ধরে নিতে হবে।

—তবে দহামিত নাচার বাবু। হামারত লেখা যোখা নাই।

—তা থাকবে কেন, শালা মদ খোর। নেশা করে ভাও খেয়ে জীবনটাকে জাহান্নামে দিচ্ছিস। তুইত নিজের মেয়েটাকে দেখিস নারে? ভালবাসিস নারে! রাত্রে কোথায় ভাগে সে খবর তুই নিস।

পাশের দরজায় কে ঠক ঠক আওয়াজ করছে। দরজার কড়াটা কে যেন ঠক ঠক করে নাড়ল। তিনি বিরক্ত হলেন। তবু পা দুটো নামালেন চেয়ার থেকে। অভ্যাসবশত বললেন— কোথেকে মড়া এল। কি নাম মড়ার?

কাউন্টারে একটা মুখ দেখা গেল। কাউন্টারের মুখটি খুব বিনীত। উত্তর আরও বিনীত। লোকটি জবাব দিল,—আমি মিউনিসিপ্যালিটি থেকে এসেছি।

ঘাটোয়ারীবাবুর বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। দুনিয়ায় ঐ একটি জায়গাকেই ওঁর যত ভয়। কোন শমন নেই ত! কোন নালিশ! কোন আর্জি অথবা মেয়াদের কথা। তিনি তাড়াতাড়ি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন।—আসুন, আসুন। কি সৌভাগ্য! বসুন। চেয়ার টেনে দিয়ে কথাগুলো বললেন। ওরে বেটা মুখ্যু কি দেখছিস? যাঃ দরজা খুলে দে। ছাখ কে এসেছেন।

গোমানী ল্যাং খেতে খেতে উঠে দাঁড়াল। দরজা খুলে দিল। শেষে এক কোণায় চুপচাপ বসে বাবুকে দেখতে থাকল।

—আপনাকে ত এর আগে দেখিনি! যদি দয়া করে……।

—আমি নতুন ঘাটোয়ারীবাবু হয়ে এলাম।

ঘাটোয়ারীবাবু ঠিক যেন ধরতে পারছেন না কথাটা। দেয়ালে ছবি টাঙানো। কোণায় গোমানী বসে, দু একটা মোরগ খুটে খুটে পোকামাকড় খাচ্ছে। আকন্দ গাছটার পাতায় প্রজাপতি বসল। নানা রকমের সব রঙ ঝুলছে আশেপাশে। ঘাটোয়ারীবাবু এসব ধরতে পারছেন এবং বুঝতে পারছেন, অথচ এই সাধারণ কথাটা তিনি যেন ধরতে পারছেন না। দুঃখ। দুঃখ। ঘাটোয়ারীবাবু খুব ছেলেমানুষ হয়ে গেছেন এখন।
—আপনি কি বললেন ঠিক বুঝতে পারলাম না।

—আপনার মত আমিও এ-ঘাটে থাকব। আমি নতুন ঘাটোয়ারীবাবু। সুপারিশের জোরে কাজটা হল। বাবাকে

হয়ত চিনবেন, তিনি ট্যাক্স কালেক্টর। অনেক ধরে করে কাঠ-খড় পুড়িয়ে তবে চাকুরী।

—-দয়া করে নামটা।

—বাবার নাম?

—জি তোমার নাম বাপু! কাজত আমার শেষ হয়ে এল বুঝতেই পারছি। ট্যাক্স কালেক্টর ত চার পাঁচ জন আছেন। কোন জনের তুমি বাপু।

—আপনি তেমন ভাববেন না। বুড়ো হয়েছেন বলে আমাকে ওরা কাজটা দিল।

—ওহে ছোকরা, তেমন কথা আমি তোমাকে কি বলেছি! চাকরী আমার নেয় কে। কার বাবার সাধ্য আছে নেয়। নামটা শুনি এবার।

নতুন বাবু খুব বিব্রত বোধ করছিলেন। তিনি নামটা বললেন, দুঃখভঞ্জন ভট্টাচার্য।

—আপনি বামুনের ছেলে। ছিঃ ছিঃ কি ব্যবহারটাই না করে ফেললাম। দয়া করে দোষ ধরবেন না। ব্রাহ্মণ! কুলশ্রেষ্ঠ! উপনিষদ পড়েছেন? কঠোপনিষদ, প্রশ্নোপনিষদ, কেনোপনিষদ? পড়েন নি? তবে পড়বেন। এখানে যখন ভিড়ে গেছেন তখন একবার পড়তে হবেই। উপনিষদ বলে— পুরুষ আপাদমস্তক পবিত্র। দৃষ্ট পদার্থের মধ্যে যাহাদের প্রাণ আছে তাহারা শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে আবার মনুষ্য শ্রেষ্ঠ। এবং মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। এসব কথা আমার নয় দুঃখভঞ্জনবাবু। এ-সব কথা মনুর। বলে, ঘাটোয়ারীবাবু গড় হয়ে প্রণাম করতে উদ্যত হলেন নতুন বাবুকে।

দুঃখবাবু ফের বিব্রতবোধ করতে থাকলেন। বড় অদ্ভুত এ-জায়গা তিনি ভাবলেন। তিনি বললেন, এ কি করছেন। ছিঃ ছিঃ বয়সে কত বড় আপনি। না না এ ঠিক হল না আপনার।

—ঠিক হয়নি বলতে চান? যেন ঘাটোয়ারীবাবু নতুন

বাবুর অপরিপক্কতা ধরে ফেলেছেন। তিনি হেসে আর বাঁচলেন না।

তিনি সামনের টুলটায় বসে খুব উদাসীনের মত বললেন, ঠিকেরই বা কি আছে, আর বেঠিকেরই বা কি আছে। সবই ঠিক, সবই বেঠিক। দেখুন না আমাকে? অর্থাৎ আমার এই শিবরাম ঘোষকে। কতকাল এখানে আছি, কত ঠিকও দেখলাম, কত বেঠিকও দেখলাম, কত ঠিক-বেঠিক হল—অথচ রেহাই কারো থাকল না। না আমার, না আপনার। মা শশ্মানী সকলকে গিলে খাচ্ছে। খাবে। আমাকে খাবে, আপনায় খাবে, সকলকে খাবে। সকলকে গিলে খাচ্ছে আর শান্তি দিচ্ছে। কি পাপী কি তাপী! তবু প্রণাম করলাম আপনাকে, আপনি কুলশ্রেষ্ঠ বলে, আপনি জাতসাপের বাচ্চা বলে। ঠিক-বেঠিক বুঝিনি, মন চাইল কাজটা হয়ে গেল। এবারে বসুন। চা খান। প্রসাদ পেয়ে সুখী হই।

মাচানে শুয়ে শুয়ে সব শুনতে পাচ্ছে নেলী। কে এখন এসেছেন এই চটানে, যাকে ঘাটোয়ারীবাবু পর্যন্ত সমীহ করে কথা বলছেন। দুনিয়ায় তবে তেমন লোকও আছে, ঘাটোয়ারী-বাবু যাকে সমীহ করেন! প্রথম ভাল লাগল, পরে খারাপ লাগল ভাবতে। ঘাটোয়ারীবাবুর উপরওয়ালা কেউ থাকুক সেটা ওর ভাল লাগল না। মন চাইল না। সুতরাং খুব ইচ্ছা হচ্ছে উঠে দেখতে—তিনি কে, তিনি কেমন। ইচ্ছা হচ্ছে দেখতে ঘাটোয়ারী-বাবুর চোখ-মুখ এখন কেমন দেখতে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘাটোয়ারীবাবুর কথা শোনারও ইচ্ছা। নেলী সেজন্য মাচান থেকে নেমে শরীরে কাঁথা-কাপড় জড়িয়ে ঘাট-অফিসের বারান্দায় উঠে এল। জানলা দিয়ে সে উঁকি দিল। বাবু বসে আছেন, নতুন মানুষটি চা খাচ্ছেনা। বাপ খাচ্ছেন। ওদের খেতে দেখে

তিনি যেন কৃতার্থ হচ্ছেন। রামকান্তের দোকান থেকে চা এসেছে, নেলী বুঝতে পারল। ছোকরা চাকরটা এখনও দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। নেলীর এ-সময় ইচ্ছা হল জানতে, মড়া এল না ত! ঘাটোয়ারীবাবুর কোন পরিচিত জন যদি দূর থেকে মড়া নিয়ে আসে।

নতুন বাবু দেখলেন জানলায় একটি বেশ মিষ্টি মুখ পরম কৌতূহল নিয়ে ওকে দেখছে। নতুন বাবু চোখ তুলতেই মেয়েটা চোখ নামাল। নতুন বাবু বললেন,—মেয়েটা কে?

—গোমানী ডোমের বাচ্চা। এই যে গোমানী—বড় মজাদার লোক। এসেছেন যখন নিশ্চয়ই টের পাবেন। বেটা হাসপাতালে লাসকাটা ঘরে কাজ করে। বেটা ইসপিরীট খোর মদ, ভাং, গাঁজা খেয়ে সারাদিন চটানে পড়ে থাকে।

গোমানী নতুন বরের মত মাথা গুঁজে বসে আছে। এবং মাঝে মাছে বলছে—কি যে বুলছে বাবু।

নেলী জানালা থেকে প্রশ্ন করল—মানুষটা কে বাবু?

—আয়, আয়। ভিতরে আয়। আমাদের নতুন ঘাঁটোয়ারী-বাবু। জাত সাপের বাচ্চা।

নেলী ভিতরে ঢুকল। দূর থেকে গড় হয়ে প্রণাম কবল। তারপর জড়সড় হয়ে নতুন বাবুকে এক কোণায় দাঁড়িয়ে দেখতে থাকল। তখন এক এক করে সকলে উঠে এল। সকলে গড় হল। গড় হয়ে সকলে দুঃখ বাবুকে বিব্রতও করে তুলল।

নতুন বাবু আবার জানতে চাইলেন, এখানে ক' ঘর ডোমের বাস?

—হবে ছ'সাত ঘর।

—বেশ। বেশ। নেলীর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, তোমার নাম কিগো মেয়ে?

—হামার নাম? হামার নাম নেলী। গোমানী ডোম হামার বাপ।

তখন গেরু ও উঠে এসেছে মাচান থেকে। কৈলাশ ফিরেছে ফরাসডাঙ্গা থেকে। দুঃখিয়া, মনু, বাবুচাঁদ সকলে এসে জড় হয়েছে অফিস বারান্দায়। নতুন ঘাটোয়ারীবাবুকে ওরা দেখতে এসেছে! ওদের ভক্তি জানাতে এসেছে। গেরু দেখল বাবুকে—বাবু ওরই মত সুঠাম, তিনি সুপুরুষ। চোখ দুটো বড় বড়। মুখটা ডিমের মত মসৃণ। সে জন্যই মনে হল সকলের—চটানে মানুষটা বড় বেমানান। অমসৃণ চটানে মসৃণ মানুষটাকে শেষ পর্যন্ত কারো যেন ভাল লাগল না।

নতুনবাবু চলে যাবার পরই এক এক করে সব মনে হতে থাকল ঘাটোয়ারীবাবুর। মনে হতে থাকল আর দুঃখ পেতে থাকলেন। তিনিও একদিন মৃত্যুর ইজারা নিতে এসে দেখেছিলেন পুরানো ঘাটোয়ারী বাবুকে। দেখেছিলেন গহনীর স্বামী সোনা-চাঁদকে। সোনাচাঁদ তখন ঘাটের ইজারাদার হয়ে বসে আছে, ঘাটোয়ারী হয়ে বসে আছে। মাথায় বড় বড় পাকা চুল। গোঁফ ঝুলে পড়ছে—সাদা। মুখ পাঁচের মত লম্বা—বনমানুষের মত চেহারা। শিবরামকে দেখে প্রথম দিন সোনাচাঁদ চটানের এক কোনায় গুম হয়ে বসেছিল। তখন এখানে জলকল ছিল না, গ্যাস পোষ্টে আলো ছিলনা, বাবু মানুষদের বাড়ীগুলো দূর দূর ছিল। ডহড়-ডোবায় চারিদিক ভর্তি। চারিদিকে তখন ঘন জঙ্গল। নদী ভেঙ্গে এত এদিকে আসেনি। এ-পারে নদীর কোন চর ছিল না। এত লোকজন ছিল না, এত মৃত্যু ছিলনা। এত মানুষ ছিল না। ক'বছরে সহরটা ভরে গেল যেন। কোত্থেকে সব হুড় হুড় করে লোক এসে এই বেওয়ারিশ জায়গাটাকে পর্যন্ত দখল করে বসল। তখন মিউনিসিপাল অফিসের নজর এল এদিকটায়, জলের কল এল। আলো এল। ট্যাক্স বসল। শিবরাম ঘোষ বুড়ো হলেন।

অশত্থ গাছটা তখন নতুন। সবে সজাগ হয়ে আকাশে ডাল-পালা মেলে ধরেছে। শিবমন্দিরের পথ ধরে গঙ্গায় নামতে সিঁড়িটা নতুন হচ্ছে। সিঁড়িটা রসকলির মা নিজের নামে গড়িয়ে দিচ্ছে। তোমাদের পদরজ দাও মোরে—নামাঙ্কিত মারবেল পাথরটা গাঁথা হচ্ছে। রসকলির মা নিজের নামে সিঁড়ি বাঁধিয়ে পরকালের সিঁড়ি বাঁধাতে চাইল। জীবনের সব পাপ ধুয়ে মুছে দেওয়ার জন্য শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করল সে। ঘাটোয়ারীবাবু সব চোখের উপর দেখেছেন। অন্ধকার গলির মোড়ে সেদিন কত লোক! কত আলো! কত দীন-দরিদ্র! কত ব্রাহ্মণ! কত অলিক ভোজন! কত দান-ধ্যান! রসকলি তখন মাত্র নতুন ব্যবসা ফেঁদেছে। পুরানো বাবুরা চলে যাচ্ছেন ভোজ খেয়ে। তারা আর রসকলির মা সুরবালাকে পাবে না। সুরবালা তীর্থ করতে যাচ্ছে। যাবার আগে এই সব কাজগুলো করে যাচ্ছে।

এই সব ভাবনার ভিতর আরও দূরে চলে যেতে থাকলেন তিনি। অনেক সব কথা মনে হতে থাকল তাঁর। দুঃখবাবু এসে পুরনো দিনের সব স্মৃতিকে ভাসিয়ে দিয়েছেন; যত মনের গভীরে ভেসে উঠছে তত বিষণ্ণ হয়ে পড়ছেন। দুঃখবাবু চটানে যেন আজ ওঁর স্মৃতির ঘরে লুকোচুরি খেলতে এসেছিলেন। গহনীর শাপশাপান্ত এতদিনে ওঁর জীবনে যথার্থভাবে দেখা দিয়েছে। দুঃখবাবু না এলে এইসব কথা মনে হওয়ার নয়। তিনিই যে ঘাটের একমাত্র ইজারাদার নন, মৃত্যুর হিসেব-নিকেশের একমাত্র বাবু নন, দুঃখবাবু আজ বড় বেশী হঠাৎ যেন সে কথাটা স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেল। বড় বেশী—সহসা তিনি বুঝতে পারলেন সোনাচাঁদের হিসেবের মত দুঃখবাবুও শিবরামের হিসাব রাখবে। সাং—আজীমগঞ্জ, পিতার নাম—হরেরাম ঘোষ। পেশার কথা লিখবে কি? তিনি লিখেছিলেন কি? তিনি দেয়ালে টাঙানো সব ছবিগুলো দেখলেন। ওরা যেন আজ প্রথম সকলে মিলে হাসল। ঘটোয়ারীবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, দুধ দিয়ে কাল সাপ পোষা দেখছি। দেয়ালের ছবিগুলো

যত হাসল, তত তিনি ভয় পেতে থাকলেন। তত তিনি মৃত্যুর জন্য বেশী চিন্তা করছেন। মৃত্যুর শক্ত মুঠোতে তিনি হাঁস-ফাঁস করছেন। ভয়ানক! বীভৎস! তিনি ভয়ে শিউরে উঠলেন। নিঃসঙ্গ—নিঃসঙ্গ! সব নিঃসঙ্গ হয়ে যাচ্ছে। বড় একা, বড় বেশী একা তিনি আজ।

স্মৃতির ঘরে অনেক চেষ্টা করেও মাকে মনে করতে পারলেন না, অথবা মাকে দেখতে পেলেন না। তিনি সেই স্মৃতির ঘরে যখন খুব ছুটোছুটি করে মায়ের দেখা পেলেন না, তখন তিনি যেন বাধ্য হয়ে চীৎকার করে উঠলেন—মা! মা! এখন তিনি বুঝতে পারছেন মাকে না-মনে হওয়ারই কথা। অথচ তিনি গল্প শুনেছেন মা-র। জানালার গরাদে মুখ রাখার সময় সেই সব শোনা কথা সত্য ঘটনা বলে মনে হয়েছে। তিনি তখন মাকে দেখতে পান। সেই ঘরটা দেখতে পান। পাট কাঠির সেই ঘরটায় ভাঙ্গা জানালা, খড়ের চাল—মা মেঝের উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছেন, সে মা-র আশেপাশে দুষ্টুমি করে বেড়াচ্ছে এবং মাকে ঘুম থেকে জাগাবার জন্য নানা রকমের ফন্দি-ফিকির আঁটছে। মা কিন্তু ঘুম থেকে জাগলেন না। মায়ের মৃত্যুটা এমনই নাকি কিছু একটা ঘটনা।

বাবার মুখটা মনে পড়লে ওঁর মুখটা আরও কুৎসি· হয়ে উঠে। তিনি বড় হয়ে এসব কথা শুনেছেন। মায়ের মৃত্যুর সময় বাবা বলেছেন—তোমার মায়ের মৃত্যু হয়েছে। অথচ তিনি শুনেছেন—বাবা মাকে বিষ দিয়েছিলেন, অথবা মা নিজেই বিষ খেয়েছিলেন। তিনি মনে করতে পারেন মাকে, বাবাকে। তিনি সব মনে করতে পারেন। সেই নিঃসঙ্গ দুঃখদায়ক দিনগুলোর কথা মনে করতে পারেন। তখন বাবা দ্বিতীয় বার বিবাহ করেছেন। বাবা যাকে নিয়ে ঘর করতে চেয়েছিলেন, শেষ পর্যন্ত তাকে তিনি ঘরণী পেলেন। ঘাটোয়ারীবাবুর সেই জীবনে দুঃখ বাড়ল। দুঃখ ঘনীভূত হল। তিনি ঘর ছেড়ে পালাতে চাইলেন।

স্মৃতির ঘরে এখন রসকলি হাঁটছে। গলিটার স্মৃতি জাগছে।

ছোট ছোট দরজা, ঘিঞ্জি গলি। মুখে সাদা রঙ মেখে, চোখে কাজল টেনে, গ্যাসপোষ্টের আলোর নীচে ওরা দাঁড়াত। কেবল রসকলির বাঁধা খদ্দের। ওর ঘরে তখন হারমোনিয়াম বাজাত, ঘুঙুর বাজত। সে এসে ওদের মত আলোর নীচে দাঁড়াত না, চোখ-মুখ প্রকট করে তুলত না। অথচ ঘাটোয়ারীবাবু মনে করতে পারছেন না সেদিন কি করে এই সব মুখ ঠেলে রসকলির ঘরে গিয়ে উঠেছিলেন। কি করে বাঁধা খদ্দেরের মত বলেছিলেন—বাহবা অঃ হঃ! বড় সুখের মুখ, সোহাগের মুখ। বড় কমনীয়! কমনীয়! অঃ হঃ!

—অভদ্র! শূয়ারকা বাচ্চে! দু-চারজন ভদ্রলোক—যারা আসর গরম করছিল তারা এমন সব কথা বলে শিবরামকে তাড়াবার চেষ্টা করেছিল।

শিবরামের চোখ-মুখ জ্বলছিল—প্রথম মাত্রারিক্ত মদ খেলে যা হয়। শরীরে জড়তা আসছিল, জিভ টানছিল। কথা জড়িয়ে আসছিল। সে কথা বলতে পারছিল না। তবু বলার চেষ্টা করল—অঃ হঃ! অ···স্বী, শ্মশানের বীভৎস গ্রাস দেখে সে ভেঙে পড়েছিল সেদিন। সে মদ খেয়েছিল সেদিন। প্রথম মদ খেয়েছিল। প্রচুর মদ।

—বদমাস লোকটাকে বাহার নিকালো। আসর গরম-করা লোকগুলো ওকে চ্যাঙদোলা করে বাইরে বের করবার ব্যবস্থা করছিল।

সে চ্যাঙদোলায় দুলতে দুলতে বলল, তোমরা কি করছ! যাচ্ছি। বেশ যাচ্ছি। তারপর ঘাড় কাত করে বলল, সুন্দরি, আমি থাকব না, আমি থাকব না। আমি জল খাব। বুকে হাত রাখার চেষ্টা করল শিবরাম ঘোষ।

রসকলি দেখল। সব দেখল। শিবরাম ঘোষের শরীরের শক্ত বাঁধুনি দেখল। চওড়া কাঁধ দেখল। ডাগর চোখ দেখল। শিবরামের বুকে পিপাসার কথা শুনল। সে একটু দুলে বলল, ওকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। ও গান শুনুক। ওকে বসতে দাও।

সকলে এতটুকু হয়ে গেল। ওরা ওকে ছেড়ে লক্ষ্মী ছেলের মত যে-যার জায়গায় বসে পড়ল। শিবরাম উপুড় হয়ে পড়ে আছে। হুঁস নেই, উঠতে পারছে না। যতবার উঠতে যাচ্ছে ততবার পড়ে যাচ্ছে।

রসকলি নিজে উঠে সাহায্য করল। ওকে তাকিয়া দিল। পাশে এনে বসাল। তারপর গান ধরল। কিন্তু শিবরামের হুঁস ছিল না কোন। সে গান শুনতে পেল না। সে শুধু পড়ে থাকল। কতক্ষণ ধরে এইসব গান, মাইফেল হল্লা হয়েছিল তাও সে জানতে পারত না, যদি না রসকলি সকলকে বিদেয় করে দিয়ে শেষ রাতের দিকে ডাকত, এবার ওঠ নাগর!

শিবরাম যেন ঘুম থেকে জাগল। তাকিয়া থেকে মাথা তুলে বড় বড় চোখে তাকাল—যেন রসকলি কি বলছে সে বুঝতে পারছে না। চোখ দুটো জবাফুলের মত, চোখ দুটো তবু ঝিমুচ্ছে। নেশা ভাল করে কটেনি। শরীরে এখনও জড়তা আছে। মাথাটা খুব ভারী ঠেকছে। রসকলিকে এখনও যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না তাছাড়া সে বিশ্বাস করতে পারল না—এ-মেয়েটা ওকে উঠতে বলতে পারে। সে বলল, আমি উঠব না সখি! আমি শোব। ঘুমুব। আর কিচ্ছু করব না। তোমার অনিষ্ট করব না। চরিত্র নষ্ট করব না। সখি, আমি ঘুমোব। বলে তাকিয়ার উপর ের শরীরটা ঢেলে দিল।

রসকলি চাকরকে ডেকে বলল, ধন্নুয়া, উসকো বাহার নিকালো।

শিবরাম চোখ পর্যন্ত খুলল না। অথবা খুলতে ইচ্ছা হল না। এত জড়তা শরীরে, এত বেশী সে অবসন্ন। চাকরটা যদি ঠেলে বের করে দেয়! ওর কিন্তু উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে না, শিবরাম মনে মনে খুশীই হল।

চাকরটা এসে শিবরামের ঘাড় ধরে বের করতে গেলে রসকলি বলল, থাম। ওকে বিছানাটা ভাল করে পেতে দে। শুইয়ে দে। আর সারারাত এখানে বসে থাকবি। বাতাস করবি।

রসকলি মুখটা শিবরামের মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, হ্যাঁগো নাগর, তোমার কেউ নেই ত?

—কেউ নেই।

—কেউ নেই! সত্যি বলচ?

—সত্যি বলচি। কেউ নেই। এতটুকু বয়সে সব গেছে। এতটুকু বয়সে বাবা ঘর থেকে বের করে দিয়েছে। আর এতটুকু বয়সে লোকের হয়ে মড়া পোড়াতাম। ক'দিন যাবৎ ঘাটোয়ারীবাবু হয়ে আছি এতটুকু বলার সময় শিবরাম হাতদুটো বিনীতভাবে ফাঁক করল। রসকলি ঘাটোয়ারীবাবুর এমন সব কথায় না হেসে পারল না।

সেই থেকে শিবরাম রোজ সন্ধ্যায় যেতেন। গহনীর স্বামীকে আসার সময় বলতেন, তুমি দেখবে ঘাট। দিনে আমি। রাতে গিয়ে রসকলির ঘরে পড়ে থাকতেন এবং অন্য সব খদ্দেরদের সঙ্গে মাইফেল করতেন। কিন্তু বেশীদিন শিবরামের ওসব ভাল লাগেনি। রসকলি অন্য খদ্দেরদের সঙ্গে ন্যক্কারজনক কথা বললে তিনি মনে মনে রেগে যেতেন। এবং রসকলি যখন খদ্দের নিয়ে ভিতরে চলে যেত, তখন তিনি রাগে অভিমানে উঠে আসতেন। চটানে হরিতকী তখন বড় হয়ে উঠছে, ঘাটোয়ারী-বাবুর ভাত জল দিতে পারছে। ঘর-দোর দেখাশেনো করছে।

একদিন শিবরাম জানালায় মুখ রেখে বসল। রসকলির উপর রাগে-দুঃখে কিছু ভাল লাগছে না। গরাদে মুখ রেখে শপথ করল—কোন দিন সে গলির আঁধারে হারিয়ে যাবে না। রসকলি তার মক্কেলদের নিয়ে থাক, রসকলি দিন দিন চরিত্র নষ্ট করে শরীর নষ্ট করুক, যত্রতত্র ঘুরে বেড়াক—ঘাটোয়ারীবাবুর কোন আসবে যাবে না! রসকলি নষ্ট মেয়ে, নষ্ট মেয়ের অবার চরিত্র, তার আবার শরীর, তার আবার ভালমন্দ। নষ্ট মেয়ের আবার ভালবাসা! তিনি যাবেন না। আর যাবেন না—এমনিই একটা

যখন শপথ করছিলেন তখন দরজায় কড়া নড়ল। কে যেন দরজায় কড়া নাড়ল।

—কে দরজায়!

—আমি গো আমি।

ঘাটোয়ারীবাবু বুঝতে পেরেছিলেন রসকলি দরজায় দাঁড়িয়ে। তিনি ভেবেছিলেন তিনি উঠবেন না, তিনি দরজা খুলবেন না, জানালা থেকেই বলবেন, শরীর ভাল নেই। কিন্তু তিনি পারলেন না। উঠলেন, দরজা খুললেন। জানালার অস্তিত্ব ভাল লাগল। চটান ভাল লাগল। দরজা খোলার সময় তিনি অদ্ভুত আরাম পেলেন। তবু কিছু একটা অজুহাত দেখাতে হয়! তিনি বললেন, শরীব ভাল যাচ্ছে না।

রসকলি শিবরামের শরীরে হাত দিল। কপালে হাত রাখল এবং উত্তাপ দেখল। তারপর কাছে টেনে নিয়ে বসাল। বলল, আজ তোমার এখানে থাকব। গলিতে ভাল লাগছে না।

শিবরাম শঙ্কিত হল।—না, না, এ চটানে নয়। বড় খারাপ জায়গা। বরং তোমার ঘরে চলো।

—আমার ঘরে কত মক্কেল। ওদের থেকে পালিয়ে এলাম।

—ওদের আসতে বারণ করে দাও।

—তবে আমার সংসার চলবে কি করে? বুড়ো বয়সে আমাকে কে তীর্থ করাবে? পয়সা—তখন পয়সা পাব কোথায়?

—আমি দেব।

—তুমি পারবে এত দিতে!

শিবরামের মনে হল তখন—সে বড় নিঃস্ব। মনে হল রসকলির জন্য তার কিছু করার নেই। ভাবল, রসকলিকে নিয়ে বরং কোথাও চলে যাওয়া যাক। কিন্তু মায়ের মৃত্যু, বাপের তিরস্কার এবং সৎ-মায়ের অত্যাচার, তারপর মড়া পুড়িয়ে অন্ন সংগ্রহ, সব ওকে বিষণ্ণ করে তুলল। দুঃখ। দুঃখ। শুধু দুঃখই রয়েছে সেখানে। সেই করুণ অতীত ওকে চটান ছাড়তে দিলনা। হাতের লক্ষ্মী পায়ে

ঠেলতে দিল না। অফিসের মাসহারা ওকে চটানে আবদ্ধ করে রাখল। একটা জীবনের জন্য চটানে কোন অভাব নেই, কোন দুঃখ নেই। চটানটা শিবরামের সুখের জগত। ইচ্ছা করলে সে এখানে বসেই দুটো মানুষের মত অন্ন সংস্থান করতে পারে। ইচ্ছা করলে সে এখানে বসেই রসকলিকে তীর্থ করাতে পারে। এই চটানে বসে ইচ্ছা করলে সে ওর সব, সব কিছু করতে পারে। শুধু পারে না চটান ছাড়তে—হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে।

রসকলি আবার বলল, আছে তোমার এত টাকা ?

—আছে।

—রোজ তুমি আমায় খুশী করতে পারবে !

—টাকা দিয়ে ?

—না সব দিয়ে। পারবে ! যদি পার কালই মক্কেলদের ভাগিয়ে দেব। কালকেই ঘরটা একমাত্র তোমার হবে। রসকলি আর কারো না, তোমার। যদি পার, তুমি আমায় কথা দাও।

—পারব। ঘাটোয়ারীবাবু কথা দিলেন। আর অক্ষরে অক্ষরে সে কথা তিনি পালন করলেন। সে একদিন গেছে। —টাকা চাই সোনাচাঁদ ?—কত টাকা ? অনেক টাকা। —লেকিন বাবু থোড়া সবুর করতে হবে।

দূর দূর থেকে তখন মড়া আসত। দশ ক্রোশ, বিশক্রোশ হবে। গঙ্গা পাইয়ে দিতে আসত তারা। দশ, বিশ ক্রোশ আসতে মড়া-গুলো ফুলে-ফেঁপে উঠত। তারা তিন চার দিনের পথ হেঁটে এসেছে। মড়াটা ওরা চটানে নামাত। দুর্গন্ধ উঠত। চটানের আশেপাশে কেউ দাঁড়াতে পারত না দুর্গন্ধে। সোনাচাঁদ তখন বলত, ওদের ছেড়ে দ্যান বাবু। ওরা চলে যাক। ঘাটোয়ারীবাবু মড়ার নাম ধাম লিখে নিয়ে বলতেন, তোমরা যাও বাপুরা। মড়া পোড়াতে হবে না। আমি পুড়িয়ে দেব। তারপর ওদের আরও কাছে ডেকে বলতেন, কাঠের দামটা ত তোদের শালা লাগতরে। ওটাও লাগল না। ও দিয়ে তোরা রামকান্তর দোকানে বেশী পচাই

খেতে পারবি। যা। যা। তোদের বেশী টাকা হল, সোনাচাঁদেরও বেশী টাকা হল। ঘাটোয়ারীবাবুরও বেশী টাকা। কাঠের টাকা বাঁচল। তিনি কিছু কাঠ চুরি করে বেচে দিতে পারবেন। এবং মড়াটা নিয়ে সোনাচাঁদ আশেপাশের কোন খানাখন্দের ভিতর পচিয়ে রাখত। গহনীর বড় ছেলে কৈলাস তখন নিখোঁজ। কৈলাস তখন কাছাড়ের জঙ্গলে ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছে। ওস্তাদ হারুণ রসিদের দরগায় মন্ত্র নিচ্ছে হাকিম দানরীর।

কৈলাশ কিন্তু একদিন কঙ্কাল সংগ্রহ করে জীবনধারণ করতে হবে ভেবেই ভয়ে চটান ছেড়ে পালিয়েছিল এবং সেই থেকে অনেক দেশ দেখেছে। আসামের জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরেছে—হারুণ রসিদের দরগা আবিষ্কার করেছে কাছাড় জঙ্গলে। সেখানেই সে বিদ্যা আয়ত্ত করল হেকিমী জীবনের। বেঁচে থাকার কিছু একটা সুরাহা করল। বাপের মত পচা গন্ধ শুঁকতে পারল না। শেয়াল খটাসের মত বন-বাঁদাড়ে ঘুরে ঘুরে শরীর নষ্ট করতে পারল না। অথচ কৈলাশ এখন বিশ্বাস করেছে যা নসিবে লেখা আছে, তার খণ্ডন নেই। নতুবা দ্বিতীয় পক্ষের বৌটাই বা পালাবে কেন, ডোমন সা-ই বা সেই ফাঁকে জীয়ন হাড়টা চুরি করবে কেন। নসিব সকলের উপরে। নসিবের হাত থেকে কারো রেহাই নেই। না দরগার রসিদের, না কৈলাশের। না বাবু-চাঁদ, না সোনাচাঁদের। না ফকির দরবেশের, না বেইমান পুরুষের। কারো রেহাই নেই, কারো রেহাই নেই। সব নসিব। নসিবের জন্য রসিদ খুন হল কাছাড় দরগায়। রসিদকে খুন করে কৈলাশ জীয়ন হাড়টা চুরি করল। হেকিমী ব্যবসা ফাঁদল দেশে ফিরে। সাদী করল। তখন গহনী বেঁচে নেই, সোনাচাঁদ বেঁচে নেই, কৈলাস তখন জোয়ান মরদ। রাহু চণ্ডালের হাড়ের দৌলতে পয়সার শেষ নেই। কিন্তু নসিবের জন্য প্রথম বৌটা

গেল। সে ঘরে ফিরে একদিন দেখল ভাল বৌটা বমি করছে। দু-বার বমি, দু-বার পায়খানা। তারপর শেষ। নসিবের ঘরে ফাঁকি নেই। খুনের বদলে নসিব বদলা নিল।

কিন্তু এখন দেখলে মনে হবে কৈলাশ নসিবের ঘরেই বদলা নিচ্ছে। অথবা নসিবের ঘরে চুরি করছে। নসিবের ঘরে গেরুকে কৈলাশ জিম্মায় রাখতে পারছে না। ওর যে করে হোক কোন হিল্লে করতে হয়। চটানের ঘরে বেঁচে থাকার এলাদ খুঁজতে হয়। একটা পাকা ব্যবস্থা করতে হয়। তিনটে কবচের বিশ্বাসকে দৃঢ় করে, সাদী-সমন্দ করে, গেরুকে নসিবের হাত থেকে দূরে রাখার ইচ্ছা। কিন্তু বেইমান বাচ্চাটা তার কি বুঝবে! ডাইনী মাগীর সাথে ঘুরে বেড়াবে শুধু। কৈলাশ ফরাসডাঙ্গা থেকে ফিরে আসার পর এমন কিছুই মাচানে বসে ভাবছিল। তৃতীয় পক্ষের বৌটার নালিশ, গেরুটা কাল রাতে ভি গেল ঘাটে। নেলীর সাথ হল্লা করল। তু কিছু না বুলছিস ত ওটা আরও বাড় বাড়বে।

কৈলাশের চোখ দুটো লাল হচ্ছে। চটানে চোখ দুটো ঘুরছে। মাচান থেকে উঁকি মেরে মেরে গেরুকে খুঁজছে। গেরুকে চটানে না দেখে ওর তেষ্টা পেল। ও জল খেল।

বৌটা কৈলাশকে যখন জল দিল তখন হরিতকী রুটি সেঁকছে। দুজনের রুটি। হরিতকী এবং ঘাটোয়ারীবাবুর। হরিতকী বাচ্চাটাকে উঠোনে শুইয়ে রেখেছে। সমস্ত শরীরে তেল মাখিয়ে রোদে শক্ত করছে। মেয়েটা কাঁদছেনা—হাত পা নেড়ে খেলছে। এই সব দেখে কৈলাশ গেরুর কথা ভাবল। ওর ছেলেবেলাকার কথা ভাবল। চটানে শুয়ে শুয়ে ওর হাত-পা নেড়ে খেলার কথা ভাবল। এই সময় কৈলাশ পকেট থেকে একটা নাকছাবি তুলে মাটির গেলাসের বাকি জলটুকুতে ফেলে দিল। উঁকি দিল গেলাসটায়। নাকছাবিটা সোনার কি তামার দেখার ইচ্ছা হল। বেওয়ারিস মড়ার নাকছাবিটা ঘসতেই টের পেল

ওটা রুপোর। গেরুর মা-র কথা মনে হল। একটা নাকছাবির কথা মনে হল। নাকছাবিটা রূপোর। ঠিক এই রকম দেখতেই যেন। ঠিক যেন এই রকম। এক রকম। এক রকমের গহনা বুঝি হতে নেই। ওর ইচ্ছে হচ্ছে এখন এই সব মন্দ ভাবনা থেকে সরে দাঁড়ায়। এই সব ভাবনা ওকে বিষণ্ন করে তোলে। বার বার রাহু চণ্ডালের হাড়টার কথা মনে হয়। রাগে দুঃখে গেরুর মাকে গাল দিতে ইচ্ছে হয়। লাথি মেরে দাঁত ভাঙতে ইচ্ছে হয়। ফের কষ্ট হয় গেরুর মার জন্য। গেরুর মা ঘরে থাকলে হাড়টা বুঝি চুরি যেত না, রাতের আঁধারে ডোমন সা পালাতে পারত না।

বেশ চলছিল তার সেই হেকিমী জীবনটা। ভোরে উঠে দুটো জল-ভাত মুখে দিয়ে ডাকত গেরুকে। পাশে বসতে বলত। সে বসত। গেরু বসত। জড়িবুটিগুলো সামনে বিছিয়ে রেখে সহসা একটা জড়ি তুলে বলত, বুলতরে বাপ এটা কি?

—এটা জীয়ন হাড়।

—বুলতে পারিস বেম্ম চণ্ডালের হাড়, লয়তো রাহু চণ্ডালের হাড়।

—এ দিয়ে কি হয়?

—জড়িবুটির কাজ-কারবারে লাগে।

—বেশ। বেশ। তু আচ্ছা বুলে দিচ্ছিস। কৈলাশ এ সময় একটা নরসিং ঝাপ তুলে ধরে বলত, এটা কোন ব্যারামে লাগে। কোন ব্যারামের জড়িবুটি। বুলতে লারলি?

গেরু বলত, এটা নরসিং ঝাপ।

—এটা কি?

—এটা দুর্গা ঝাপ।

কৈলাশ বলত, এটা ঈশ্বর ঝাপ, কালী ঝাপ।

গেরু বলত, এটা বন রুই মাছের ছাল, হেমতাল কাঠ।

কৈলাশ বলত, কুলকুহলীর গাছ।

গেরু বলত, মরদ রাজের মূল।

কৈলাশ গেরুকে তন্ত্র-মন্ত্র শেখাত এবং ভাবত—গেরুটার মনে তন্তর-মন্তরের বিশ্বাসকে দৃঢ় করতে হবে। সেজন্ম জড়িবুটির নাম, কি কায়দা আছে জড়িবুটিতে, কোন ব্যারামে কোন জড়িবুটি লাগে—সব এই বে-হিসেবী চটানে হিসাব করে শেখাত। ওর ইচ্ছা গেরু যেন মনে প্রাণে বিশ্বাস করে—দানরী বিদ্যার একটি অপার্থিব শক্তি আছে। গেরুও অকৃত্রিম বিশ্বাস নিয়ে সে বিদ্যা আয়ত্ত করেছে। কিন্তু কিসে কি হল, কি হয়ে গেল—ভোরে উঠেই কৈলাশ দেখল কাঠের বাক্সটা থেকে রাহু চণ্ডালের হাড়টা এবং দামী গাছ-গাছড়াগুলো চুরি গেছে। ঝুড়ির পাশে দাঁড়িয়ে সেদিন কৈলাশ হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলেছিল।

সে কেঁদেছিল ওর অকৃত্রিম দ্রব্য গুণের জন্য নয়। কেঁদেছিল ওর ব্যবসা মাটি হল বলে। গেরুর দিকে চেয়ে ওর দুঃখ বাড়ছিল—চটানে বাচ্চাটা দু-মুঠো খাবে কি করে! চটানে যারা কাঠ বয়ে খায়, তাদের প্রায় উপোস দিতে হয়। অন্য দল সহরের বেড়াল-কুকুর তাড়িয়ে অথবা ফেলে পয়সা রোজগার করে। তাদেরও সে উপোস করতে দেখেছে। একমাত্র রয়েছে হাসপাতাল। কিন্তু ইসপিরিট-খোর গোমানী বেঁচে থাকতে গেরু সে কাজ পাবে না। মরলেও না। চটানের সকলে সে দিকটা হাঁ করে আছে!

সেদিন কৈলাশ প্রথম গালমন্দ দিল গেরুর মাকে। গেরুর মা ঘরে থাকলে ডোমন সা রাহু চণ্ডালের হাড় এবং দামী গাছ-গাছালী চুরি করে উধাও হতে পারত না। গেরুর মার ঘুম ছিল পাতলা। মাচান নড়েছে ত বৌটা জেগে উঠেছে। মাচানের নীচে শব্দ হয়েছে ত বৌটা কুপি জ্বেলেছে। কৈলাশ ঘুমের ভিতর হেসে উঠেছে ত বৌটা মাচানে উঠে বসেছে। লম্ফ জ্বালিয়ে বলেছে, কিরে মরদ, খুব যে হেসে লিচ্ছিস বড়।

কৈলাশ সেই শব্দে মাচানে উঠে বসল। চোখ দুটো রগড়াল। কুপির আলোতে বৌটাকে ঝাপসা মনে হল। নজর আসছেনা

ঠিক মত। সে বুক হেঁচড়ে বৌটার কাছে গেল। বৌটা তখনও হাসছে। হাসিতে বত্রিশটা সরুদাঁত উপছে পড়ছে যেন। বৌকে হাসতে দেখে সেও হাসল। হাসির জোয়ারে ওরা ভাসল। বর্ষার চিতা ঘাট অফিসের কাছে এসে গেছে। চিতার আগুনে সে বৌটার মুখ পরিষ্কার দেখল। বৌটার কাছে ঘন হয়ে বসল। এবং চিতার আলোতে ওরা ভালবাসার গল্প করল। কিন্তু সেই কৈলাশ ভোরে গেরুর মার উঠতে দেরী দেখে, সকাল সকাল এক সানকী ভাত দিতে দেরী হল বলে কপালে লাথি মারল। কপাল ভাল বলে, কপালের লাথি মুখে লেগেছে। কৈলাশ বলেছিল, শালির হামার ঘুমে পোষায় লাগ।

লাথির জন্য গেরুর মার দাঁত ভাঙল। ঠোঁট কেটে গেল। চারিদিক অন্ধকার দেখল মেয়েটা! তিন চারদিন ধরে সে চীৎকার করল চটানে। তিন চারদিন ধরে নাচন কোদন হল। তিন চারদিন ধরে ওরা দুজন এক মাচানে শুল না। ভাত রাঁধল না। গেরুটা নীচে পড়ে কাঁদল, একবার কৈলাশ ধরে কোলে নিল না। অথচ পাঁচদিনের দিন রাতের কি শলাপরামর্শতে ভোর বেলা কৈলাশ ডাকল, চলেহ গেরুর মা।

ডাক্তারখানায় গিয়ে কৈলাশ বলল, ডাগদারবাবু আছাড় পড়ে দাঁত টুটে গেল। বহুত কষ্ট পেয়ে লিচ্ছে বা বহুটা। দুটা দাঁত ওয়ায় টুটে গেল।

কৈলাশ পয়সা খরচ করে টাকা দিয়ে দাঁত বাঁধিয়ে দিয়েছে। এবং সেই তামার বাঁধানো দাঁত নিয়ে যখন গেরুর মা হাসত কুপির আলোতে, কৈলাশ তখন ভাবত—ওর বৌর মত রূপের বৌ চটান জুড়ে কেন, সহর জুড়েও বুঝি নেই। সে হেসে বলত খুশী হয়ে —দাঁত টুটে তুর রূপ যে বাড়লরে বৌ। হাসলে তুর রূপের জৌলস আরও খুলে পড়ছে।

তখন মাচান থেকে নেমে আসত গেরুর মা। তখন চুপ করে দাঁড়াত কৈলাশের সামনে। চোখ দুটো ডাগর করে তুলত।

উনুনের পাশ থেকে নোড়াটা নিয়ে বলত, রূপের বাহার যখন খুললই হামার দু দাঁত বাঁধিয়ে তখন বত্তিশটা দাঁত টুটে ফের না হয় বাঁধিয়ে দে। বলে খিল খিল করে হাসত গেরুর মা। চটানের মেয়ে মরদেরা বলত, মাগীর ঢং দেখ।

সেই গেরুর মা শেষ পর্যন্ত চটান ছেড়ে পালাল। এখন কৈলাশের আপশোষ হয়। আপশোষ, কেন সে গেরুর মার বত্তিশটা দাঁতই ভেঙ্গে দিলনা। কেন সে দুটো দাঁত বাঁধিয়ে দিতে গেল। বত্তিশটা দাঁত ভাঙ্গলে ওর রূপ ডুবত, জৌলুস কমত। চটানে পড়ে থেকে চিল্লাত শুধু। অন্ততঃ শেষ বয়সে তবে কাটোয়া থেকে আর একটাকে ধরে নিয়ে আসতে হত না। বাপ-নানার ব্যবসা কাঁধে চাপিয়ে ঘোড়দৌড় করতে হত না।

গেরু ঘরে ঢুকতেই মাচানে উঠে বসল কৈলাশ। বলল, তু কাঁহা যাস, কাঁহা ঢুঁড়ে বেড়াস? এ-ঠিক না আছে গেরু। আভি ত তু বড় হো গেলি। থোড়া সমজে না চললে তুর সাদী-সমন্দ হাম কেইসে করে।

—হাম ত আভি সাদি না করে বাপ।

—কাহে তু সাদি করবি না?

গেরু চুপ করে থাকল। মাচানের পাশে দাঁড়িয়ে মাথা নীচু করে রাখল। গেরুকে দেখে কৈলাশের জিদ বাড়ছে। পুষে বড় করা বাচ্চাটা বলছে কি! —তুকে জরুর সাদি করতে হোবে। কৈলাশ এ-সময় নিজের ওজনটা মেপে দেখতে চাইল।

—না করিত…!

—তু সাদি করবি না?

—না করিত।

—না করিসত চটানে ভুখা থেকে মরবি। পেটে ভুখা থাকবি, মনে ভুখা থাকবি। এ-আচ্ছা বাত লয় গেরু। হাম মর জানেসে তুকে কোন দেখবে? কোন তুকে পিয়ার করবে। বুল? বুল! চুপ করে থাকলি ক্যানে? চুপ করে থাকলি চলবে? হামি মর

যানেসে তুকে কোন দিক ভাল করবে? তুকে জরুর সাদী করতে হবে। ডাইনী মাগীর সাথ তু ঘুরবিত হাম জরুর চটানে সালিসী মানবে। তু কি ভাবিস? তু ভাবিস হামি কৈলাশ মরে গেছে?

গেরু এবারেও কোন জবাব না দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। কৈলাস মাচানে বসে তু তিনবার ফোঁস ফোঁস করল। তারপর নীচে নেমে ডাকল বৌকে, তু খেতে দে। হামি আজ জীয়াগঞ্জ যাবে। ঢাউস ডোমের বিটির খোঁজ করবে। গেরুর সাদি সমন্দ হামি জরুর করে লিবে। কৈলাশ খেতে বসে বিড়বিড় করে বকল তুর মাই হামারে জাদা সুখ দিয়াছে আর তুত গেরু। পুষে বড় করা বাচ্চা। মা মনসার বাহনের লাখান লিক লিক করছিস। ফাঁক পেলেই ছোবাল বসাবি। ও বাত হামার না জানা আছে ভাবিস তু।

খেতে বসে কৈলাশের চোখ দিয়ে জল পড়ল। পুষে বড় করা বাচ্চাটাও বেইমানী করতে শিখেছে। বাচ্চাটা বুলে কিনা—না করিত! হামার মরদরে তু!

গেরুই প্রথম খবরটা দিয়েছিল নেলীকে। —জানিস বাপ জীয়াগঞ্জ গেল।

নেলী গঙ্গা যমুনাকে আদর করছিল। গঙ্গা যমুনাকে ধরে গালে লেপ্টে দিচ্ছিল। গেরু পাশে দাঁড়িয়ে ফের বলল, জানিস বাপ জীয়াগঞ্জ গেছে।

ঝাউ গাছটা থেকে একটা ডাল ভেঙ্গে পড়ল। কাকের পুরনো বাসা থেকে খড় কুটো উড়ল। দুটো প্রজাপতি উড়ছে আকন্দ গাছে। মুরগীরা সব ডিম পাড়ছে। নতুন ঘাটেয়ারীবাবু এসে অফিস ঘরে বসেছেন। পুরনো বাবু গল্প করছেন নতুন বাবুর সঙ্গে। দুঃখবাবু মাঝে মাঝে জানালা দিয়ে নেলীকে দেখছেন। ওর কুকুর দুটোকে আদর করা দেখছেন। বাঘের মত কুকুর দুটোকে দেখে

বাবুর ভয় বাড়ল। তিনি চোখ তুলে ফের পুরনো বাবুকে দেখলেন এবং ফের গল্প আরম্ভ করলেন।

নেলী কুকুর দুটোকে আদর করতে করতে চোখ তুলে একবার বাবুকে দেখল। একবার গেরুকে দেখল।

গেরু ফের বলল, বাপ জীয়াগঞ্জ গেছে। বাপ জীয়াগঞ্জ সাদী সমন্দ দেখতে গেল।

—কার সাদী সমন্দ?

—তু বুঝি জানিস না। হামার সাদী সমন্দ।

—তুর বাপ গেল আর যেতে দিলি?

—হামি বারণ করলাম। লেকিন শুনল না।

—তু বুলতে লারলি নেলী হামার বিবি হবে। বুলতে লারলি নেলীর সাথ হামার বাতচিত হয়ে গেছে। বুলতে লারলি অন্ত চটানে উঠে যাব এক রোজ। তুর বাপ বুলল আর ভেড়ীর মত সব বাতচিত শুনলি!

—তু বুলতে পারতিস তুর বাপকে গেরুর সাথ হামার সাদী হবে। বুলতে পারতিস গেরু হামার মরদ হবে।

ওরা দুজনই দুজনের মুখোমুখী দাঁড়িয়েছিল। দুজনই দুজনের গোপনীয় কথা বলছিল। কেউ দেখতে পাচ্ছে না; একমাত্র দুঃখ-বাবু ওদের দেখতে পাচ্ছেন। মুখ ফেরালে ঘাটোয়ারীবাবুও ওদের দেখতে পাবেন। ওরা কাঠ গোলার পাশে, শূয়োরের খাটালের গলিতে দাঁড়িয়ে বচসা করছে। গলা তুলে বচসা করছেনা, ওরা ফিস ফিস করে কথা বলছে। দুঃখবাবু ওদের দুজনকে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছেন। কিছু তিনি শুনতে পাচ্ছেন না অথবা ওরা আরও ঘন হল না। ওরা আরও ঘন হলে তিনি হয়ত চোখ নামাবেন।

নেলী বলল, জরুর পারি বুলতে। আভি বুলতে পারি বাপকে বাপ গেরু হামার মরদ হবে। দেখবি? দেখবি তু? নেলী গঙ্গা যমুনাকে নিয়ে যেন এই মুহূর্তে বাপের কাছে ছুটতে চাইল। যেন

এই মুহূর্তে বলা চাই বাপকে—বাপ গেরু হামার মরদ হবে। বাপ্‌ হামার আর গেরুর বাতচিত ঠিক হয়ে আছে। তু মানা না করে।

গেরু বলল, যাক, আভি তুকে বুলতে হবেনা। বাপকে জীয়াগঞ্জ থেকে ফিরতে দে। হাম বাপকে জরুর বুলবে।

নেলী বলল, অঃ। হামার মরদরে! তুর মত মরদ হামার লাগে না। বলে একটা বিদঘুটে শিস দিল নেলী, কুকুর দুটোকে নিয়ে গঙ্গার ঢালুতে ছুটল। এখন যেন কোন দুঃখ নেই নেলীর। যেন কোন আপশোস নেই গেরুর সাদী-সমন্দের জন্য! মরদের জন্য কষ্ট হয়। মেয়েমানুষের জন্য কিসের আবার কষ্ট! জীয়াগঞ্জের মেয়ে গেরু ধরে আনুক, সাদি করুক, সুখে থাক—ওর কোন আপশোস নেই।

নেলী কুকুর দুটোকে নিয়ে বালির চরে নামল। তারপর কুকুর দুটোকে ছেড়ে দিল কুকুর দুটো ছাড়া পেয়ে মাটির গন্ধ নিতে নিতে উপরে উঠে গেল। এই বালির চরে নেলী এখন একা। নিঃসঙ্গ। শীতের নদীতে কোন শব্দ নেই। জলে ঘূর্ণী নেই। জল কাঁচের মত অথবা আয়নার মত। দুটো একটা করে পাখী উড়ে যাচ্ছে। নদীর জলে তাদের ছায়া পড়ল। নেলী জলের আয়নায় মুখ দেখল। চোখ দেখল। জীয়াগঞ্জের মেয়ে ওর চে' খুবসুরত কিনা জলের আয়নায় যাচাই করল। একটু জল তুলে নেলী মুখে দিল। মুখ ধুল। দুটো একটা মাছ নড়ল জলে। জলের আয়নায় নেলীর মুখটা হারিয়ে যাচ্ছে অথবা কাঁপছে। অথবা মুখটা ঝাড়ো ডোমের বৌয়ের মত হয়ে গেল। মুখটা জলে কাঁপছে, কুৎসিত হয়ে উঠছে। যখন শ্যাওলার আঁধারে মাছদুটো হারিয়ে গেল নেলী তখন বালিয়াড়িতে উঠে এল এবং বালির উপর বসে পড়ল। দু-হাঁটুর ভিতর মুখ গুঁজে দিল। বুকের ভিতর কেমন যেন কষ্ট হচ্ছে। নেলী বুকে হাত রাখল। গেরুর সাদি হবে, সমন্দ হবে। ঠোঁটে অনেকবার শব্দগুলো ভেঙ্গে পড়ল। ওর কষ্ট হচ্ছে। খুব কষ্ট। এই কষ্টটুকু গেরুর কাছ থেকে আড়াল দেওয়ার জন্য সে যেন এখানে

এসে বসেছে। মুখ ধুয়েছে জলে। গেরুর সামনে শিস্ দিয়ে নিজের কষ্টকে আত্মগোপন করেছে। যেন কিছুই হয়নি। যেন এমন হামেশাই ঘটে থাকে। মরদের কথা ঠিক থাকে না, থাকবার নয়। গেরু অন্যত্র সাদি করবে এটা যেন জানাই ছিল নেলীর।

বালির চরে নেলী অনেকক্ষণ বসে থাকল। বাপ হয়ত এখন লাস-কাটা ঘর থেকে বের হয়েছে। গাছের নীচে বসে ইসপিরিট খাচ্ছে। মাসের পয়লা। বাপ মাইনে পাবে। আজ ছুটো ভালমন্দ খাবে নেলী। বাপ ভাল ভাল সওদা করবে। এ-দিনটাতেই নেলীর সুখ। এ-দিনে বাপ নিজে বেশী খেতে চাইবে না। নেলীকে সব খাওয়াতে চাইবে। এখন কিন্তু নেলীর উঠতে ইচ্ছা হচ্ছে না। গতরাতে গেরু এবং সে এখানে বসেই হল্লা করেছে। নেলীর সব মনে পড়ছে এখন। নেলীর যত মনে পড়ছে তত কষ্ট বাড়ছে তত এই চরে বসে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে। সে গত রাতে গেরুকে ধরে মরদ বানাতে চেয়েছে। মা হতে চেয়েছে। সেই গেরুর সাদি হবে। সমন্দ হবে। কৈলাশ যখন বের হয়েছে তখন সে ঠিক না করে ফিরছে না। জীয়াগঞ্জের সব কটি মেয়ের মুখ সে মনে করার চেষ্টা করল। ওরা ওর চেয়ে কত খুবসুরত তা নিয়ে মনে মনে ফয়সালা করল। সে বসে বসে ভুতি, শনিয়া এবং আঁধারীর কথা ভাবল। জীয়াগঞ্জের সবকটি মেয়ে ওর দুশমন হয়ে গেছে। আঁধারীকে ধরে গেরু একবার একটা কেচ্ছা করেছিল। গঙ্গাপূজোর রাত্রির সেই কেচ্ছার কথা ভেবে সে হাসল। সেদিন ডোমেদের সব মেয়ে-মরদেরা পয়সা নিচ্ছে যাত্রীদের কাছ থেকে। জীয়াগঞ্জ থেকে সে তিনটে মেয়েও এসেছিল। আঁধারী এসেছে, ভুতি এসেছে। আঁধারী এবং গেরু রাতে কোথায় হারিয়ে গেল। লখি, ধুমুয়া তদারক করল। খুঁজল। নেলী ওদের খুঁজে বের করল। সেই নিয়ে কত কথা। কত কেচ্ছা। হয়ত সেই আঁধারীই গেরুর বিবি হয়ে আসছে।

এই বালিয়াড়িতে বসে নেলী ভেঙ্গে পড়ছে। যন্ত্রণাটা বুকের ভিতর অসহ্য ঠেকছে। যে-গেরুকে মরদ বানাবার এত সখ সেই গেরু হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে। গেরুকে নিয়ে আঁধারীর কত সখ, কত সুখ পাবে। যে পুতুলের জন্য নেলী রং গুলতে চেয়েছিল, সে পুতুলটা শেষ পর্যন্ত আঁধারীই পাবে! সব কিছু অসহ্য লাগছে নেলীর সেজন্য। চারিদিকে সে চাইতে থাকল। যেন সে গেরুকেই খুঁজছে। কুকুর দুটো তখন অনেক উপরে। অনেক দূরে। মাটির গন্ধ নিতে নিতে বাবলার ঘন বনে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। ওদেরও সুখ আছে, ওদেরও সখ আছে। বাবলার ঘন বনে হয়ত ওরা সে সুখ এবং সখকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু নেলীর কিছু নেই। না সুখ, না সখ। না গেরু, না দুঃখবাবু। আজ দুঃখবাবুকে নেলীর খুব আপন জন বলে মনে হল।

মনে হল এ-বাবু তার দুঃখ বুঝবে। এ-বাবু তাকে একটু আশ্রয় দেবে। আঁধারী এবং গেরুর মত কোন সুখের রঙ গুলতে গিয়ে হয়ত আর একটা কেচ্ছা হবে চটানে, লেকিন রসের ঘরে এ-কেচ্ছার দাম থোড়াই আছে। গেরুর মত পুতুলের রঙ না হয়ে অথবা গেরুর মত পুতুলের মুখ না হয়ে দুঃখবাবুর মত হবে। সেই চোখ, সেই রঙ, সেই গড়ন।—গেরুরে, তুর মত মরদ হামায় গামেশাই আসবে। রাগে দুঃখে নেলী এখন গেরুকে গালমন্দ দিচ্ছে। বদলা নিয়ে মনে মনে সুখ পাচ্ছে। —তুর আঁধারী, হামার দুঃখবাবু। কম কিসে! তু এক কাঠি বাজাবি, হামি দু কাঠি। তু আঁধারীর পেটে বাচ্চা বানাবি, হামি দুঃখবাবুকে লিয়ে কেচ্ছা বানাব।

নেলী বালিয়াড়িতে হয়তো আরো কিছুক্ষণ বসে থাকত, আরও কিছুক্ষণ গালাগালি করত গেরুকে কিন্তু মনে হল বাপ ফিরছে নদীর পাড় ধরে। ঢুলতে ঢুলতে আসছে। দু একজন বাবুমানুষের ছেলেরা ঢিল ছুঁড়ছে যেন বাপকে। বাপ কিছু বলছে না। ওদের হাত দিয়ে ইসারা করছে। ওদের ঢিল ছুঁড়তে বারণ করছে ইসারা করে। ওরা শুনছে না। ওরা তবু ঢিল ছুঁড়ল। বাপ

যখন ওদের দিকে দৌড়োবার জন্য ঝুঁকি সামলাল, তখন ছেলেগুলো দৌড়ে পালাল। তাই দেখে বাপ হাসছে। মদের নেশায় বাপ হাসছে।

—বাপ…। বালিয়াড়ি থেকেই নেলী ডাকতে থাকল।

—আয় আয়। তু ওখানটায় কি করছিস? তু আয়। গোমানী নেলীকে পাড় থেকে ডাকতে থাকল।

নেলী ছুটল। চর ভেঙ্গে উপরে ছুটল। নেলীর খোলা চুল উড়ছে। কাপড় খসে পড়ছে শরীর থেকে। চর ভেঙ্গে তবু নেলী উপরে ছুটল। নয়তো বাবু মানুষদের ছেলেগুলো বাপকে আরো বেশী ঢিল ছুঁড়বে। নেশার শরীর বাপের। ওদের ধমক দিতে পারছে না।

উপরে উঠে সে প্রথম বাবু মানুষদের ছেলেগুলোকে তাড়াল। শেষে বাপের হাত ধরল। বাপের কোমরে হাত দিয়ে দেখল মাসের মাইনেটা ঠিক রেখেছে কিনা।

গোমানী বলল, গঙ্গা যমুনা কোথারে নেলী?

—ওরা জঙ্গলে ঢুকল বাপ।

—ওদের থোড়া গোস্তর ঝোলে ভাত খাওয়াবি। হলুদ মেখে ভাত খাওয়াবি। হাসপাতালের সাব ওয়ার কুকুরটাকে গোস্ত দেয়। তু গঙ্গা যমুনাকে গোস্ত দিবি। ভুলবি না।

—ভাল সওদা করলি না বাপ?

—তু করে লিয়ে আয়। পয়সা দিচ্ছি। বলে কোমর থেকে টাকা খুলতে চাইল গোমানী। গঙ্গা যমুনার লাগি বোয়াল মাছ লিবি। ওভি ডাগদার বাবু ওয়ার কুকুরকে খাওয়ায়। এক পোয়া গোস্ত লিবি তুর লাগি। খাসির গোস্ত। হাম রাতে কুছ খাবে না। গোমানী পর পর দুটো ঢেঁকুর তুলল। সে হাঁটছে। কোমরের কাছে হাতটা ঝুলছে। অথচ সে ট্যাঁক থেকে টাকা বের করল না। সব বেমালুম ভুলে গেছে। বেমালুম ভুল বকছে। কি কথা বলতে অন্য কথা বলছে। সে বলল, তুর মায়ীর লাগি ভি গোস্ত লিবি আজ ফুলন ভি গোস্ত খাবে।

নেলী বলল, তু রূপেয়া দিলিনা, হামি গোস্ত লিব কোথেকে।

—রূপেয়া! লে দিচ্ছি। কত লাগবে বল? দশ, বিশ, পঁচিশ, শ রূপেয়া? কেতনা রূপেয়া আওর তু মাঙে? গোমানী এবার কোমর থেকে কাপড়ের ভাঁজটা খুলল। ছোট লাল শালুর খুঁট থেকে গুণে একটা টাকা বের করল। লে রূপেয়া। আচ্ছা সওদা করে নিবি। গঙ্গা যমুনার লাগি দুটো শাড়ী লিবি। জায়দা হোত ফুলনের।

নেলী বলল, তাই লিব। লেকিন তু যেতে পারবি একা একা! না হামি যাব তুর সাথ।

গোমানী চোখ দুটো ছোট করল। মুখ কুঁচকাল। কপাল কুঁচকাল। যেন নেলীর জায়দা সাহস হয়ে গেছে। সে বলল, তু যা! তু যা!

নেলী দাঁড়াল না। বাপকে একটু এগিয়ে দিয়ে সে বাবলার ঘন বনে ঢুকে গেল। ডাকল—গ···ঙ্গা, য···মু···না! তুরা আয়। হামার সাথ বাজারে যাবি।

ঘন বনের ভিতর থেকে নেলী দেখল কুকুর দুটো বাঘের মত ছুটে আসছে। নেলীর এখন খুব আনন্দ হচ্ছে। কুকুর দুটো ওর বেটার মত। ঘন জঙ্গলের ভিতর কুকুর দুটোর চেহারা ভয়াবহ লাগছে। যত ছুটছে তত বেশী ভয়াবহ হয়ে উঠছে। কাছে এলে নেলী কুকুর দুটোকে কিছুক্ষণ চাপড়াল। শেষে ওরা এক সঙ্গে হাঁটতে থাকল।

গোমানী হাঁটছে অন্য দিকে। নেলী অদৃশ্য হয়ে গেল। গোমানী চটান পর্যন্ত হেঁটে যেতে পারল না। তার আগেই, চটানে ওঠার মুখে সে মাটিতে পড়ে গেল। সে দুবার ওঠার চেষ্টা করেও উঠতে পারল না। গোমানী মাটিতে পড়ে ভাবল যেন নেশাটা বেশীই হয়েছে। এমতবস্থায় সে মাটিতে পড়ে থাকল। যখন উঠতে পারছে না, হাতে-পায়ে শক্তি পাচ্ছে না, তখন নেশাটা জমেছে বটে। তা জমবে না! লাস-কাটা ঘরে

এত লাস! এত লাসের দুর্গন্ধ একসঙ্গে! অসংখ্য, অসংখ্য! গলায় দড়ির দাগ, ঠোঁটে বিষের দাগ! দুটো খুনের লাস। লাসগুলোর মাথায় নম্বর দেওয়া। জোয়ান মেয়েটা কাপড় সামলাতে পারেনি—ওয়াক্! নষ্ট! নষ্ট! মেয়েটা শরীরে আগুন দিল। শরীরটা আগুনে সিদ্ধ হল। ওয়াক্! নষ্ট! নষ্ট! এ-সব ভাবতে ভাবতে গোমানী আরও দুটো ওয়াক্ তুলল। এই নচ্ছার দুনিয়ায় বেঁচে সুখ নেই—শুধু দুঃখ। দুঃখ। দুনিয়াটা শূয়োরের চোখ নিয়ে বেঁচে আছে। সব নেমকহারাম। সব বেইমান। ওর চোখ দুটো বুঁজে আসছে। তবু এই নচ্ছার পৃথিবীকে দেখবার জন্যে সে দুবার চোখ মেলে তাকাল। যদি নেলী আসে এখন, যদি হাত ধরে বলে, বাপ উঠ্। তুর সাথ মা বসুন্ধরা ঠাট্টা করছে! তু উঠ। তামাসা করছে।

কোথাও কোন মানুষের সাড়া না পেয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ মাটিতে পড়ে থাকল। শরীরে যত শীত লাগছে, নেশাটা যেন ওর তত জমে আসছে। সে মাটিতে পড়ে থেকেই বলল—অহ!

কিছুক্ষণ পর গোমানী উঠে বসল, কিন্তু দাঁড়াতে পারল না দাঁড়াতে গিয়ে ফের পড়ে গেল। মা বসুন্ধরা বড় বেশী দুলতে শুরু করেছে। সে ক্ষেপে গেল। শুয়ে শুয়েই সে বসুন্ধরার কপালে লাথি মারতে লাগল। —আপদ!

সে শুয়ে শুয়ে আবার বলল, মা বসুন্ধরা, তু একটু থামবিনে? মেয়েটা হামার বাজারে গেছে মা। তু যা দুলছিস, নেলী হামার নিগ্ঘাত আছাড় পড়বে। তু দুলবি না মা। দোহাই তুর গোমানী বাপের। গোমানী এবারেও একটা ওয়াক তুলল।

ঘরে চাল ছিল বলে নেলী ভাল সওদা করতে পারল। খাসির গোস্ত, তেল মশলা সব নিল হিসাব করে। রাত করে ঘরে ফিরল। চটানে আঁধার নেমেছে বলে ঘরে ঘরে লম্ফ জ্বলছে। কৈলাশ ডোম এখনও চটানে ফেরেনি। ফেরার পথে ফরাসডাঙ্গায় হয়ত রাত কাটিয়ে আসবে। কাল ভোরে সঠিক খবরটা পাবে নেলী। ঝাড়ো

ডোমের বৌ বারান্দায় পাঁতি তুলছে। ঝাড়ো পাঁতি দিয়ে ডালা-কুলো তৈয়ার করছে। অন্য ঘরে কিছু নেশা জমেছে। হরিতকী ক-রোজ নেশা করতে পারল না। বিকেল থেকে বাচ্চাটা অনবরত ট্যা ট্যা করে কাঁদছে। ওর বিশ্বাস কৈলাশ ঝাড়-ফুক দিলে বাচ্চাটা ভাল হয়ে যাবে।

নেলী ঘরে ঢুকে দেখল বাপ চটানে ফেরেনি এখনও। নেলী বিরক্ত হয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল। বাপ নিশ্চয়ই এখন কোথাও পড়ে আছে। গঙ্গা যমুনাকে নিয়ে সে আঁধারে বাপকে খুঁজতে বের হয়ে গেল। এবং চটান থেকে নেমেই দেখল, চটানে উঠবার মুখে গোমানী শুয়ে শুয়ে কেবল ওগলাচ্ছে। দুর্গন্ধে কাছে যাওয়া যাচ্ছে না। নেলী নাকে কাপড় দিয়ে বাপকে টেনে তুলল এবং বাপকে ধরে শীতের গঙ্গায় চুবিয়ে আনল। শেষে গোটা পথ ধরে ধরে এনে মাচানে শুইয়ে দিয়ে বলল, বক বক করবি ত এখন মাথায় পোড়াকাঠের বাড়ি মারব বলে দিলাম। চটানে পড়ে হয় ঘুমোবি, লয় মাচানে আগুন ধরিয়ে দেব।

নেলী উনুনে কাঠ গুঁজে দিল। লম্ফ থেকে আগুন দিল কাঠে আগুনটা বাড়িয়ে দিল। মাচানে বাপ শীতে হি হি করে কাঁপছে। আগুন পেয়ে বাপ কিছুটা যেন তাজা হল। নেলী আগুনটা বার বার উসকিয়ে দিচ্ছে যাতে বাপ তাড়াতাড়ি গরম হয়, যেন বাপ তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়তে পারে। বাপের বক বক আর ভাল লাগছে না। মনটা ভাল নেই। দুঃখবাবু হয়ত এতক্ষণে চলে গেছেন। অফিস ঘরে এখন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। গেরু নিশ্চয়ই মাচানে শুয়ে আছে, নিশ্চয়ই ঘুমুতে পারছে না। শরীরের যন্ত্রণায় ছটফট করছে।

অফিস ঘরে দুঃখবাবু নেই। তিনি চলে গেছেন। কাল থেকে পাশের ঘরটাতে থাকবেন এ ঠিক হল। তবে রোজ রাতে থাকবেন না, মাঝে মাঝে থাকবেন। ঘাটোয়ারীবাবুর সুবিধে-অসুবিধে দেখে তিনি এখানে রাত কাটাবেন। মড়ার হিসাব রাখবেন।

ঘাটোয়ারী বাবুকে একটু সুখ-সুবিধা দেবেন। ঘরে বৌ আছে, বাচ্চা আছে, রাতে এখানে থাকার অসুবিধা আছে। দুঃখবাবুর দুঃখ বুঝেই যেন তিনি বলেছেন, রাতে এখানে না থাকলেও চলবে আপনার। যতদিন আমি আছি মাঝে মাঝে হাজিরা দিলেই চলবে।

দুঃখবাবু বলেছেন তখন, না আপনি বুড়ো মানুষ। মাঝে মাঝে রাতে আমি থাকব বৈকি! তবে বুঝতেই পারছেন বৌ বাচ্চা নিয়ে ঘর। পুরো সংসার।

ঘাটোয়ারীবাবুর ইচ্ছা হল জানতে দুঃখবাবুর ছেলে কটি। ওরা কত বড়। ওরা কি করে, দুঃখবাবু চটান আসবার সময় ওরা কাঁদে কিনা। ওরা কদমা খেতে চায়, কমলা খেতে চায় হয়ত। না দিলে তারা কেমন করে—সে জানারও ইচ্ছে ঘাটোয়ারীবাবুর। না দিলে ওরা হয়ত কাঁদে, তখন দুঃখবাবুর কষ্ট হয়। দুঃখ হয়, মনে হয় ওরা মরবে একদিন। এই চটানে বয়ে আনতে হবে। আপনি, নয় আমি, নয় অন্য কোন ঘাটবাবু ওদের হিসাব রাখবে* আপনার মনে হয়না—আপনিও মরবেন একদিন! তবে সংসার সংসার করে লাভ কি! অত সুখ-দুঃখ ভেবে কি হবে! বরং চলে আসুন চটানে। সারাদিন সারা রাত এখানে পড়ে থাকুন। ডোমেদের নিয়ে ঘরকন্না করুন। যথার্থ ঘাটোয়ারীবাবু হয়ে দুনিয়ার তাবত সুখ-দুঃখকে তফাত রাখুন। কিন্তু ঘাটোয়ারীবাবু এ-সব বলতে পারেন নি। প্রথম কিংবা নতুন বলেই হয়ত। কিংবা সংসারী মানুষকে ঘেঁটে লাভ কি!

তা ছাড়া তিনি নিজেও রসকলিকে নিয়ে কম ডুবে ছিলেন না। রসকলির ঘর বাঁধার সখকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন।

রসকলি বলত, আমি এ-চটানেই ঘর বাঁধব।

ঘাটবাবু বলতেন, তা হয় না।

অর্থের অভাবের জন্যেই তিনি অন্যত্র উঠে যেতে পারেননি।

রসকলি বলেছে অন্যত্র যাব।

—না তা হয় না। অর্থের অভাবকে আমার বড় ভয়।

—তবে এ-চটানেই। ঝাড়ো, গিরীশ ঘর করতে পেরেছে যখন।

—ওরা পারে। ওরা গঙ্গাপুত্তুর। ওরা সব পারে। ওরা শিবের মত। ওদের ঘর করা এখানেই সাজে অন্যত্র সাজেনা।

রসকলির বাসনা তিনি পূরণ করতে পারলেন না। শেষ দিকে রসকলিকে তেমন মধুর মনে হতনা। রসকলির মৃত্যুর কিছু পূর্বে তার প্রতি ওঁর কেমন বিরক্তিবোধ জন্মেছিল। রসকলিকে শেষ দিকে বলেছেন, সংসারের সং সাজতে ইচ্ছে নেই। তিনি মনুষ্য চরিত্রকে ব্যাঙের মত লাফ দিতে দেখে নিজের মনেই হেসেছেন। রসকলির প্রতি ভালবাসা এবং বিরক্তিবোধ উভয়ই ব্যাঙের মত উলম্ফন মনে হয়েছিল।

হরিতকীকেও তিনি সেদিন বলেছেন, সংসারের সং সাজতে ইচ্ছা নেই।

হরিতকী বলেছে সংসারের সং সাজতে তুকে বুলেছি। আর বুলবে না। পেটটাকে লিয়ে এতদিন ভয় ছিল। পেটটা খালাস হয়ে হামাকে খালাস দিল। হামাকে লিয়ে তুকে আর কোথাও যেতে হবে না। কোথাও আর পালাতে বুলবনা। হামার নসিব লিয়ে হামি বাচ্চাকো সাথ চটানেই পড়ে থাকবে। লেকিন তুঝে বুলবে না, আঃ যাঃ বাবু কাহাভি চল যাই। কভি বুলবেনা চটান ছোড় দে।

ঘাটোয়ারীবাবু সব কথাগুলো স্মরণ করে না হেসে পারলেন না। তিনি নিজেও জানেন না হরিতকীর বাচ্চাটা ওঁর না চতুরার। এ-কথা হরিতকী, নিজেও জানে না। চতুরাকে নিয়ে ঘর করতে করতে মাঝে মাঝে যে উদবৃত্ত সময়টুকু ঘাটবাবুকে সে দিত, সে বড় অল্প। বড় কম সময়। অথচ হরিতকীও চতুরার মৃত্যুর পর বুঝলো ঘাটবাবুরও এ চটান ভিন্ন গত্যন্তর নেই। এ-চটান ভিন্ন তিনি অন্যত্র বাঁচতে পারবেন না। সে শুধু যেন অর্থের জন্য অথবা অভাবের জন্য নয়। কারণ এও যেন জীবনের মহৎ সত্য।

আপনার মনে হয়না আপনিও মরবেন একদিন? তবে আর সংসার-সংসার করে লাভ কি? অত সুখ দুঃখ ভেবে কি হবে! বরং চলে আসুন না এই চটানে, সারারাত সারাদিন এখানে পড়ে থাকুন। ডোমেদের নিয়ে ঘরকন্না করুন। যথার্থ ঘাটোয়ারীবাবু হয়ে দুনিয়ার সব সুখ, সব সখকে তফাত রাখুন।

আবার যখন রাত হয়, চটানে কেউ জেগে থাকেনা, যখন ঘাটে কোন মড়া জ্বলেনা, তিনি সপ্তর্পণে উঠে কাঠের বাক্সটা খুলে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকেন। বাক্সর ভিতর অনেক গহনা। রসকলির গহনা। এক দুই করে গহনাগুলো গুণবেন, এক দুই করে গহনাগুলো সাজিয়ে রাখবেন। রসকলি মৃত্যুর আগে ঘাটবাবুকে ডেকে সব গহনা দিয়ে বলেছিল, আমি চলেছি, তুমি এবার ঘর কর। রসকলির তীর্থে যাওয়া হলনা। গলির আঁধারেই রসকলির ভয়ানক রোগে মৃত্যু হল। অথচ এখন মনে হবে—এই চটানে এই কাঠের বাক্সর জন্য তিনি বেঁচে আছেন। সেজন্য চটান ছেড়ে তিনি অন্যত্র গেলেন না। নিঃসঙ্গ জীবনে রাতের কোন নির্জন সময় ওঁর জীবনে বৈচিত্র্য বয়ে আনে। তিনি বাক্স খুলে গহনা দেখেন, গহনার সঙ্গে রসকলির মুখ দেখেন। রসকলির হাসি-মসকরা শুনতে পান। ভালবাসার কথা শুনতে পান। এই সব কথা ভেবে তিনি একটু দুঃখ পেতে চান। আপনজনের দুঃখ। আপন জনের বিয়োগ-বেদনা। জীবনে তিনি এই দুঃখটুকুর স্পর্শের জন্যই রাতের আঁধারে কাঠের বাক্সটা খুলে বসেন এবং পৃথিবীকে ভালবাসতে চান। আবার এমনও হয়—কাঠের বাক্সটা খুলে বসে আছেন, অথচ রসকলির মুখ স্মরণে আসছে না। কোথায় যেন হারিয়ে গেছে মুখটা, কোথায় যেন পালিয়ে আছে রসকলি। যতবার তিনি মুখটা স্মরণ করতে চান, ততবার মুখটা কাছে এসে মাকড়সার জালের মত কাঁপতে থাকে। যত দিন যাচ্ছে, ততই যেন এমন ঘটনা বেশী ঘটছে। ততই তিনি রসকলিকে ভুলতে

বসেছেন। একটু ব্যথা এবং বেদনার স্মৃতিতে তিনি এখন বাঁচতে চান। কিন্তু মনের এই নিষ্ঠুর গণ্ডি অতিক্রম করে কিছুতেই তিনি সেখানে পৌঁছতে পারেন না। শুধু মৃত্যু, মৃত্যু, মৃত্যু। এই মৃত্যুর নিষ্ঠুর পরিণতিই ঘাটবাবুকে দিন দিন অচল করে তুলছে, অনড় করে তুলছে। ঘাটের মত নির্দয়-নিষ্ঠুর করে তুলছে। কোন কোন দিন ঘাটোয়ারীবাবু এইসব ভাবতে ভাবতে চোখ ঢেকে চেয়ারে বসে থাকতেন। কাঠের বাক্সটা খোলাই থাকত।

কোন দিন দরজায় শব্দ হত। দরজাটা ঠক ঠক করে কাঁপত। তিনি ভেবেছেন রসকলি এল। ভেবেছেন, রসকলির প্রেতাত্মা এসে উঁকি ডাকছে। অথবা মনে হত রসকলির প্রেতাত্মা সব গহনা ফিরিয়ে নিতে এসেছে। তিনি তখন ভয়ে জড়সড় হয়ে চেয়ারটাতে বসে থাকতেন। এবং চেয়ার থেকেই জবাব দিতেন —কে, কে দরজায়?

—আমরা মড়ার লোক বাবু। বহুদূর থেকে এসেছি বাবু। আমরা সাতকান্দির মড়া পোড়ার দল বাবু।

ঘাটোয়ারীবাবু দরজা খুলতেন না। ওদের বলতেন কাউন্টারে এস। তিনি ভয় পেতেন। হয়ত রসকলির প্রেতাত্মা সকল মানুষকে বলে বেড়িয়েছে—ঘাটবাবুর কাঠের বাক্সে কি আছে জান না? অথবা ঘাটবাবুর ধারণা—হয়ত চটানের সব লোক জেনে ফেলেছে—বাক্সটাতে জাড়োয়া গহনা আছে। তিনি কখনই রাতে দরজা খুলে বসে থাকতেন না। তিনি বলতেন, কাউন্টারে এস। তিনি বলেতেন, যা হয় কাউন্টার থেকে বল।

লোকটা কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়াল।

যে চটানটা এতক্ষণ ঝিমিয়ে ছিল, যে চটানটা নেশা-ভাঙ কোরে এতক্ষণ ঝিমুচ্ছিল, মড়া আসছে শব্দে সেই চটানটাই আবার জেগে উঠল। আবার সোজা হয়ে বসল। —ওরে ওঠ ওঠ। ও নেলী, দেখ মড়া এসেছে। ঘরে ঘরে তখন লম্ফ জ্বলল। ঘরে ঘরে তখন

ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি। ঘরে ঘরে কথাবার্তার শব্দ। দুঃখিয়া উঠল। মংলী উঠল, দুঃখিয়া পাগড়ি বাঁধল মাথায়। হাতে লাঠি নিল। মংলীর এত ঘুম যে উঠতে পারছিল না, তবু উঠল। কাঠঘরে দরজা খোলার শব্দ হচ্ছে। কাঠ মাপছে ঝাড়ো। ডোমেদের মেয়ে-মরদেরা কাঠ বয়ে নিচ্ছে। একমাত্র হরিতকী ওঠেনি। বাচ্চাটার শরীর ভাল যাচ্ছে না। টোকায় ধরেছে। বাচ্চাটা কাঁদতে কাঁদতে নীল হচ্ছে, লাল হচ্ছে। কৈলাশের জন্য রাত জেগে বসে আছে হরিতকী। বাচ্চাটাকে হাঁটুর উপর রেখে পেটে গরম তেল মাখিয়ে দিচ্ছে। মুখটা দেখে কষ্ট হচ্ছে—হরিতকী কাঁদছে। নিঃশব্দে। কৈলাশ যদি থাকত এ-সময়! ওর ঝাড়ফুঁক, যাদু মন্তরে বড় বিশ্বাস হরিতকীর।

ঘাটে চিতা সাজানোর ভার হরিতকীর। শরীর ভাল নয় বলে সে যাচ্ছে না। সে নেলীকে ডেকে বলল, তু আজ চিতার কাঠটা সাজিয়ে দে নেলী। পয়সা যা হবে তু লিবি।

নেলী যখন গেরুর পাশ কেটে নদীতে নামল, তখন একটা ছোটরকমের খেউড় দিল গেরুকে। নেলীর মাথায় কাঠ। গেরুর মাথায় কাঠ। নেলী ঠেস দিয়ে বলল, তুর বহু আসছেরে গেরু, তুর বহু হামার মরদ হবেরে, মরদ হবে। ঠেস দিয়ে গেরুকে এই ধরনের কথা বলে খুশী হল নেলী।

ঘন আঁধারে চটানের আলোগুলো যেন ভুতুড়ে চোখ। ভুতুড়ে গন্ধ যেন চারিদিকে। আস-শ্যাওড়ার জঙ্গল পুরানো অশথগাছটার পাশে। সেখানে ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকছে। সেখানে আকন্দ গাছে ফুল ফুটেছে। শিশির পড়েছে। শীতের কীট, শীতের পতঙ্গ—শিশিরে ভিজে ঘুমুচ্ছে। দূরে আলো, সহরের আলো। ওপারে ট্রেনের শব্দ। হুইসেলের শব্দ। নদীর ঢালুতে মড়াটা পড়ে আছে। শিয়রে লণ্ঠন জ্বলছে। মড়াটার পাশে দুটো লোক বসে। ওরা শীতে কষ্ট পাচ্ছে। এই সব ঘাটোয়ারীবাবু জানালায় বসে বসে দেখলেন। দেখলেন এবং ভাবলেন। জীবনের কোথাও যেন

অন্তরঙ্গ সুর নেই। ডোমেরা সব ঘরে ফিরে গেছে। ওরা হরিধ্বনি দিয়ে মড়াটা চিতায় তুলে দিল। আগুনটা ধীরে ধীরে সব কাঠগুলোকে, মড়াটাকে গ্রাস করার জন্য উপরের দিকে ধেয়ে উঠছে। যেন স্বর্গের সিঁড়ি তৈরী করছে। মানুষগুলোর মুখ লাল হচ্ছে, ওরাও সিঁড়িতে পা রাখার জন্য যেন প্রস্তুত হল। ওরা ফের হরিধ্বনি দিল। চটানে তখন যে যার মত ঘুমিয়ে পড়েছে। আবার রাতটা বোবা হয়ে গেল, ঘন হয়ে গেল। মনেই হবে না এই সব দেখে—মড়া জ্বলছে। মনেই হবে না পৃথিবী থেকে একটা মানুষ চলে গেল। তার সুখ-দুঃখ চলে গেল। তার অনুভূতি-আবেগ চলে গেল। যেন কিছুই হয়নি—অথবা এমন হওয়াই স্বাভাবিক। হামেশা এটাই হচ্ছে। আগুন জ্বলছে আর স্বর্গের সিঁড়ি তৈরী হচ্ছে। অথচ এ-মানুষটারও জন্ম হয়েছে। তুদিনে ষষ্ঠি, শেষে বিয়ে। ঘর-সংসার। ঘর, সুখ, সখ—সব! শুধু ঘাটের সুখটা জানা ছিল না। আজ সে তাও পেল। স্বর্গের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে তুনিয়াকে শেষবারের মত আদাব দিল আজ।

ভোরবেলায় খবর শুনে চটানের সকলে আশ্চর্য হল! নেলী রোদে পিঠ দিয়ে বসে সব শুনছে। কৈলাশ ডোম সকলকে ডেকে ডেকে বলছে, গেরুর সাদী ঠিক হো গিলরে গোমনী। ও ঝাড়ো, বাত শুনলি ত? গেল রাতে ঠিক করে লিলাম গেরুর সাদী। তু ত চিনিস নন্দুয়াকে। নন্দুয়ার বিটি।

গেরু চটানের অন্য পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনছে। ঘরে ঢুকে নেলীকে তুবার দেখবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু দেখতে পায়নি। রোদে পিঠ দিয়ে বসে আছে নেলী। একটা কাঠি দিয়ে মাটিতে একটা একটা করে আঁক দিচ্ছে এবং এক তুই করে গুণছে। কৈলাশের খবরকে যেন পাত্তাই দিল না। খবরটা শুনে চটান থেকে মুখ তুলল না পর্যন্ত। গেরুর ইচ্ছা এখন ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। ওর মুখটা দেখে।

মুখে কোন কোন ইচ্ছার রং ধরছে—সে দেখারও ইচ্ছা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেতে পারল না। যেতে সাহস হল না। কিছুদূর হেঁটে গিয়ে আবার ফিরে এল। বাপ তখন চটানের ঘরে ঘরে খবর দিয়ে বেড়াচ্ছে, পুষে বড় করা বাচ্চাটাকে চটানে বেঁধে দিয়ে গেলাম। বাঁচি-মরি গেরুকে দেখার একটা লোক থাকল। কৈলাশ এমন সব কথা বলছিল, আর ঘরে ঘরে খবর দিয়ে বেড়াচ্ছিল।

ঝাড়োর বিবি বলল, কি দেবে বেটাকে?

—একটা শূয়োর দেবে বুলছে।

ছুঃখিয়া বলল, খুব খরচ পত্তর করবিত?

—জরুর। করবনা ত টাকা হামার খাবে কে? এক বেটার সাদি হামার—কম সখের কথা! কি বুলিসরে গোমানী?

—তা বটেক। হাম ভি এক দফে কাহা ভি চলে যাবে। বিটির সাদি ঠিক করে লিব। হাম ভি খরচ-পত্তর করবে ভাবছে। হামার ভি এক বিটির সাদি। খরচ-পত্তর না করলে চলবে ক্যানে?

মংলী তখন মুখে কাপড় চাপা দিয়ে খুক খুক করে হেসে দিল। কৈলাশ বলল, তা দিবি। দেবার ত সময় হয়েছে বটেক। গোমানী মাচানে বসে সকলকে জোরে জোরে বলল, দিব, দিব। ঠিক সাদি দিয়ে লিব। হামি কি কৈ আদমীসে কম রোজগার করি! তবে—তবে—তামাসা ক্যানে? মসকরা ক্যানে? তবু চটানের সকলে নেলীর সাদি-সমন্দকে তামাসা বলে ভেবে নিল।

কৈলাশ ঘটোয়ারীবাবুর ঘরে ঢুকল। বাবুর পায়ে গড় হল। বলল, আপনার—আওর—ডাক ঠাকুরের কিরপায় গেরুর সাদি-সমন্দটা হয়ে গেল। চার রোজ বাদ নন্দুয়ার বিটিকে লিয়ে আসছি। বেটার লাগি ইবার ভিন্ন ঘর করে লিব। আপ বুলেন ত আজই করে লিচ্ছি।

ঘাটবাবু বললেন, বলিস, কিরে! সাদি-সমন্দ তবে লাগালি!

—হে বাবু, করে লিলাম। জান আওর দিচ্ছে না এক রোজত

মর যাওগে বাবু। টাইম ভি ত হয়ে গেল। লেকিন বেটার হিল্লে কর়ে না দিলে ওকে কোন দেখবে?

—বেটাকে ওরা দেবে কি?

—একটা শূয়োর দেবে। শূয়োর না দিলে শূয়োরটার দাম দেবে বাবু। লেকিন হামি বুলে দিয়েছি হামি শূয়োর লিব। বুলছে খাসি শূয়োর দেবে। বিয়ের দিন ভোরে শূয়োরটাকে লিয়ে আসবে। শূয়োরটা চটানে জবাই হবে। শূয়োরের গোস্ত হবে। পচাই আসবে। বিকালে হামরা সব গোস্ত, পচাই লিয়ে জীয়াগঞ্জ যাবে। বাবু আপ ভি চলিয়ে না। খুব খুশিকা বাত হবে।

নেলী তখনও রোদে পিঠ দিয়ে বসে আছে। ওর শীত আজ শরীর থেকে যাচ্ছে না। যেন সে নড়বে না এমনই একটা শপথ করেছে। গেরু দূরে দাঁড়িয়ে সকলের আড়ালে অনেকক্ষণ নেলীকে দেখল। তারপর চটান থেকে নেমে গেল। বাপের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারল না, হাম সাদি না করবে বাপ। তু এ-সাদি তুলে দে।

নেলী কিন্তু রোদ থেকে উঠল না। নেলী এই রোদে বসেই বুঝতে পারছে গেরু চটান থেকে নেমে গেল। গেরুর মনের ইচ্ছা যেন নেলী ওর সঙ্গে চটান ছেড়ে নামুক। এই বোধের জন্যে নেলীর বিরক্তি-বোধ গেরুর উপর আরও বাড়ল। সে ভাবল, কি দরকার? বরং এই রোদ ভাল, রোদের এই উত্তাপ ভাল, গেরুর কাছে গিয়ে সে কি শুনবে! যে মরদ সকলের সামনে কিছু বলতে পারলনা, চটান থেকে নেমে সে আর কি বলবে? কি আর অন্তরের কথা শোনাবে?

নেলী সেজন্যে উঠল না। যে-ভাবে বসেছিল ঠিক সেই ভাবেই বসে থাকল। রোদে বসে গেরুর উপর অভিমানে ফেটে পড়ছে। —ছিঃ ছিঃ তু কিছু বলতে লারলি! সকলের সামনে তুর বাপ হল্লা করে বলল, গেরুর সাদি ঠিক হো গিল। তু তখন বোবা বনে গেলি! কোন জবাব দিতে লারলি। লেকিন তু হামারে লিয়ে চটানের নীচে নেমে যেতে চাস। সেখানে তু কি বুলবিরে মরদ, কি বুলবি!

হামি জানি তু কিছু বুলতে লারবি। রাগে, দুঃখে, নেলীর ভেতরটা ফুলে ফেঁপে উঠছে। চটানের চারিদিকে হল্লা। গেরুর সাদি হবে বলে, সকলে হল্লা করছে। গেরুর সাদি হবে বলে, সকলে ভোজ পাবে বলে, ঘরে ঘরে খুশির কথা। গোমানী পর্যন্ত কৈলাশকে ডেকে বলেছে, হামার লাগি তু থোড়া বিলিতি মাল লিবি। লয়তো হামার জমবে না। হাঁড়ি হাঁড়ি পচাই গিলে সাদি-সমন্দে সুখ নেই। তুর ত এক বেটার সাদি।

নেলীর কাছে এখন চটানের সব মানুষগুলো বেইমান। সব মানুষগুলো শুধু ভোজের কথা ভাবল। নেলীর দুঃখ-কষ্ট কেউ দেখল না- বাপ পর্যন্ত মাচানে শুয়ে বিড়ি টানছে। ভোজের খোয়াব দেখছে, অথবা অন্য কিছু। নেলীর কিছুই ভাল লাগছেনা। না এই রোদ, না রোদের উত্তাপ। না এই চটান, না চটানের মানুষগুলোকে। ঘাটোয়ারীবাবু পর্যন্ত বলছেন না, এ সাদি সমন্দ করে তুই ঠিক করলি না। কৈলাশ। নেলীর কথা তোদের জানা উচিত ছিল। অথচ কেউ কিছু বলছে না। নেলীর অভিমানে কান্না পেতে থাকল।

দুঃখবাবু চটানে ঢুকে দেখলেন নেলী রোদে পিঠ দিয়ে বসে আছে। তিনি ডাকলেন, কিরে নেলী রোদ মাখাচ্ছিস গায়ে?

নেলী তখন মাথা গুঁজে বসে কাঁদছিল বলে উত্তর করতে পারল না। দুঃখবাবু ফের বললেন, খুব বুঝি শীত লাগছে গায়ে!

নেলী কোন রকমে জবাব দিল, হে বাবু।

—আমার ঘরটা একটু পরিষ্কার করে দিবি। আজ বিছানা-পত্র নিয়ে আসব। কোন কাজ নেই ত তোর এখন।

—না বাবু কোন কাজ নেই। আপনি যান বাবু হামি যাচ্ছে।

সে রোদ থেকে উঠে পড়ল। মাচানের নীচে থেকে একটা ঝাঁটা নিয়ে দুঃখবাবুর ঘরে ঢুকে গেল। ঘরটা কত কাল থেকে নোংরা হয়ে আছে। কবে ঝড়ের রাতে একটা মড়া এ-ঘরে রাখা হয়েছিল— তার কাঁথা-বালিশগুলো পর্যন্ত এখনও পড়ে আছে। ঘরটার চুনবালি খসে দিন দিন খুব নোংরা হয়ে উঠছে। দেওয়ালের ইঁট সব খসে

পড়ছে। ঝুল ঝালড়ে ঘরটা ভর্তি। নেলী ভাল করে কাজগুলো করতে থাকল এবং ভেতরের কষ্টটাকে ভুলতে চাইল।

ঘাটোয়ারীবাবুর ঘরে দুঃখবাবু বসে আছেন। দুজনে গল্প করছেন। ঘরের গল্প। স্ত্রীর গল্প। পরিবার-পরিজনের অভাব-অনটনের গল্প। এই সব গল্প বলে দুঃখবাবু কত সুখী—এমন ধারণা করলেন ঘাটবাবু। গল্প শুনিয়ে দুঃখবাবু যেন বলতে চাইলেন, বেশ আছি মশাই। বাচ্চাদুটো ভালমন্দ খাবার জন্য কাঁদে, বৌ-এর হরেক রকমের বায়না—যতটা পারি দেওয়ার চেষ্টা করি। না দিতে পারলে গিন্নি অভিমান করে, দুঃখ করে। বেশ লাগে মশাই—আছি বেশ। ছেলেটাকে ভালমন্দ দিতে না পারলে কষ্ট হয়, কিন্তু যখন দিতে পারি, ছেলেটা ভালমন্দ হাতে নিয়ে যখন কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, বড় ভাল লাগে, বড় আনন্দ। দুঃখবাবু চোখ বড় বড় করে আনন্দ প্রকাশ করছিলেন। —এবার মাইনে পেলে প্রথমেই বৌকে কিছু কিনে দেব। দুঃখবাবু এবার উঠলেন। —দেখি কতটা হল! দেখি গোমানীর বেটি কতটা সাফ করল।

—কিরে কতটা সাফ করলি? দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দুঃখবাবু প্রশ্ন করলেন।

—হয়ে এল বাবু। ঘর ত লয় বাবু, ভাটিখানার মজলিস। এখানে কাঁথা, ওধারে বালিস, দেওয়ালে নোনা, চিতার কাঠের মত সব দাঁত-বের-করা ইঁট—ঘরে ঢুকলেই ত ভয় ধরে।

দুঃখবাবু ঘরে ঢুকে ভীষণ দুর্গন্ধে নাকে কাপড় দিলেন। বললেন, কিসের গন্ধরে নেলী? ঘরে থাকা যাচ্ছে না।

—আর কিসের গন্ধ! পচা ইঁদুরের গন্ধ বাবু। ঐ দেখুন না বাবু, কেমন ফুলে-ফেঁপে আছে! আপনি আভি যান। হলে ডাকব। তখন আর কোনো গন্ধ পাবেন না। যখন নেলীর হাত লেগেছে, তখন সব ঠিক হয়ে যাবে। নেলী আশ্বাস দিল দুঃখ-বাবুকে।

বস্তুতঃ এ কাজগুলো করতে করতে নেলী নিজের দুঃখটা বেমালুম ভুলে গেল। গেরুর সাদি হবে, শনিয়া চটানে বৌ হয়ে আসবে, শূয়োরের গোস্ত হবে, মজলিস বসবে—পরিচিত ঘটনার মত এগুলো ওকে আর দুঃখ দিচ্ছে না। সে ঝুল ঝাড়ল, ঘরের মেঝেটা ভাল করে পরিষ্কার করে দিল, পচা ইঁদুরগুলোকে সামনের একটা ডোবায় রেখে এল, মড়ার কাঁথা-কাপড়গুলোকে বাইরে বের করে আগুন ধরিয়ে দিল। তারপর একটু বিশ্রাম নেবার সময় নেলী দুঃখবাবুকে বলল, বাবু চটানে ত ভোজ লেগে গেল। গেরুর সাদী হবে জীয়াগঞ্জে। আপনি যাবেন না ভোজ খেতে জীয়াগঞ্জে।

—গেরুর সাদি হবে তুই যাবি না?

—হামাকে কি লেবে বাবু?

—কেন নেবে না? ঘাটোয়ারীবাবু বললেন, সবাই যাচ্ছে। তিনি পর্যন্ত যাবেন।

—লেকিন হামি যাবে না বাবু। হামাকে ওরা লেবেনা। নেলী এইটুকু বলে আর দাঁড়াল না। হয়ত দাঁড়াতে পারল না। ফের সেই দুঃখটা বুক বেয়ে গলা ধরে উপরে উঠছে।

যে দুঃখটা নেলীর গলা বেয়ে উপরে উঠে আসছে সে দুঃখটাই ওর চোখ দুটোকে সর্পিল করে তুলল। সে মনে মনে হিংস্র শ্বাপদের মত গর্জাতে চাইছে। সে চোখ তুলে চারিদিকে চাইল এবং হাঁটতে থাকল। দুটো ষাঁড় শিং নীচে নামিয়ে তেড়ে আসছে। দুটো গরু চরছে অন্যত্র। ওরই বয়সী দুজন মেয়ে গঙ্গায় স্নান করতে যাচ্ছে। ওরা হাসছে। ওদের পিঠে রোদ। শাড়ীর আঁচলে ওদের হাসির কৌটা যেন বাঁধা। সমস্ত লজ্জার মাথা খেয়ে এ সময় বিশ কাটালীর ঝোপে একটা মানুষ বসে পড়ল। নেলী নিজের শরীরের উপর এ সময় বিরক্ত হয়ে পড়ছে। মানুষটা বিশ কাটালির ঝোপে, দুটো ষাঁড় লড়ছে, আঁচলে হাসির কৌটো বাঁধা, আর পেটে ওর যে

দুঃসহ ব্যথা—সব মিলে দুঃসহ ভাব সর্বত্র। তলপেটে পরিচিত ফিক ব্যথাটা ক্রমশঃ নীচে নামছে। যত নামছে তত দুঃসহ মনে হচ্ছে পৃথিবীটাকে। শরীরটা এই মুহূর্তে নোংরা হবে জেনে সে আর নীচে নামল না। বড় অস্বস্তি এ-সময় ওর। শরীরটাকে নিজের বলে ভাবতে কষ্ট হয়। কিছু ভাল লাগে না। ইচ্ছা করে মাচানে সারাদিন পড়ে থাকতে, মাচানে পড়ে ঘুমোতে, শরীর কাঁথা-কাপড়ে আড়াল রেখে একটি দুঃসহ ভাবকে ঢেকে রাখতে। একটি দুঃসহ লজ্জাকে ঢেকে রাখতে। সেজন্য সে ঘাটের দিকে নেমে গেল না, গেরুকে খুঁজে দুটো কথা বলবার সময় হল না। যতটা সত্বর সম্ভব সে চটানে উঠে গেল।

ঘরে ঢুকেই সে মাচানের নীচে থকে কিছু ছেঁড়া কাঁথা-কাপড় ছুঁড়ে দিল। বাপ মাচানে নেই—কোথাও বের হয়েছে। অন্য কাঁথা-কাপড় দিয়ে সে দেয়ালের ফাঁক-ফোকর বন্ধ করে দিল। তারপর শরীরের দুঃসহ লজ্জাকে ভাল করে আড়াল দিয়ে সব কাঁথা-কাপড় বেড়া থেকে টেনে মাচানে এনে ফেলল। কৈলাশ তখন ঝাড়ফুঁক দিচ্ছে হরিতকীর বাচ্চাটাকে। কৈলাশ অদ্ভুত সব মন্ত্র উচ্চারণ করছে। নেলী মাচানে শুয়ে না হেসে পারল না। কৈলাশের মন্ত্রগুলো সে নিজে নিজে আওড়াল—ইটমের বিবি চিটম খায়, পাহাড়ে পাহাড়ে ছুটে বেড়ায়! মা মনসার বাহন হবি, পীরের ভূত পয়গম্বরে যাবি—ফুঃ। মাচানে শুয়ে কৈলাশের মত একটা জোরে ফুঁ দিল। কৈলাশের মত চারিদিকে থু থু ছিটাল নেলী।

কিন্তু নেলী মাচানে শুয়ে থাকতে পারল না। পিসির মেয়েটা কাঁদছে। পিসি গেল রাতে উজাগর থাকল। নেলী উঠে হরিতকীর ঘরে ঢুকে গেল। কৈলাশ ঝাড়ফুঁক দিয়ে বের হয়ে গেলে সে বলল, দে পিসি হামার কোলে দে। তু এক দফে ঘুম দিয়ে লে। সারারাত না ঘুমিয়ে তুর শরীরটা আর শরীর নাই।

—তু কোলে লিবি ?

—হে পিসি লিব। হামার হাতে কোন কাজ না আছে। লতুন ঘাটবাবুর ঘর ঝেড়ে লিলাম। বাপ কাহা ভি চল গেল। বাসী ভাত আছে। বাপ বাসী ভাত খেয়ে লিবে।

—তু খাবি না ?

—বাপ খেলে যদি দুটো থাকে তবে খেয়ে লিব।

নেলী হরিতকীর কোল থেকে বাচ্চাটাকে নিল। কাঁথা-কাপড়ে পেঁচিয়ে কোলে রাখল। —পিসি ওয়ার নাম হবে চঞ্চলা। হামি চঞ্চলা বলে ডেকে লিব।

নেলী চঞ্চলাকে দু-হাঁটুর উপর শুইয়ে আদর করল। মুখ দেখল, ছোট ছোট চোখ, ছোট ছোট হাত-পা। এখন আর কাঁদছে না যেন। চোখ-মুখ নীল হচ্ছে না। কৈলাশের ঝাড়ফুঁয়ে যেন ভাল যাচ্ছে। পিসি পাশে শুয়ে পড়ল। নেলীর এ-সময় কুকুর দুটোর কথা মনে হল। ওরাও পিসির বাচ্চাটার মত ছোট ছিল একদিন। শীতে কষ্ট পেত খুব। ওদের মা-টা মরে গেল। তখন কে দেখবে ওদের! কে আগলাবে! অফিস ঘরের বারান্দায় শীতে কাঁদত রাতে। এ-সব শুনে মাচানে শুয়ে নেলীর কষ্ট হত। একরাতে সে মাচান থেকে উঠে পড়ল এবং সন্তর্পণে বারান্দা থেকে বাচ্চা দুটোকে এনে বুকের কাছে কাঁথার নীচে ঘুম পাড়াল। বাচ্চা দুটো এতটুকু নড়ল না। এতটুকু কাঁদল না। ভোরে শূয়োরের দুধ বাচ্চা দুটোকে খাওয়াল। পুষে পুষে বড় করল। এখন ওরা গঙ্গা যমুনা। এখন ওরা নেলীর বেটার মত। গেরু শনিয়ার মরদ হচ্ছে, বাপ দিন দিন অমানুষ হয়ে উঠছে, কৈলাশ, দুখিয়া ডাইনী বলে ওকে গাল-মন্দ দিচ্ছে—সব কিছুই সে দু-বেটার মুখের দিকে চেয়ে সহ্য করে আছে। অথবা দু-বেটার জন্য এ-সবকে সে এতটুকু গ্রাহ্য করে না। কৈলাশ কিংবা দুখিয়া যদি বেশী হারামী হয়ে উঠে, রামকান্ত যদি বেশী বেইমানি করতে চায়, গেরু যদি ফের ফিরে আসে কোন দিন, তবে সে কাউকে সালিসী মানবে না। একমাত্র গঙ্গা-যমুনাকে

বলবে, তুরা দেখে লে ব্যাপারটা। যা করতে হয় তুরা করে লে। হামার মা বাপ আছে তুরা।

হরিতকী এখন নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুতে পারছে। কাপড়ে মুখ ঢেকে মেঝেতে শুয়ে আছে। মাছিগুলো তবু যন্ত্রণা করছে পিসিকে। নেলী হাত বাড়িয়ে মাছি তাড়াল। পিসি শুয়েছে ত ঘুমিয়েছে। পিসির বিশ্বাস কৈলাশের ঝাড়ফুঁকে বাচ্চাটা ভাল হয়ে উঠবেই। নেলীরও বিশ্বাস। ওর দ্রব্যগুণের কথা, মন্ত্র-তন্ত্রের কথা নেলী এতদিন এই চটানে অনেকবার শুনেছে। অনেকবার দেখেছে। ওর দ্রব্য-গুণের জন্য সহরের বাবুরা পর্যন্ত আসেন। কতদিন দেখেছে নেলী— পুরানো অশথের নীচে কৈলাশ দাঁড়িয়ে আছে, বাবুরা এসেছেন সহর থেকে—কৈলাশ মেয়ে মানুষের শরীর থেকে ভূত ছাড়াচ্ছে। কতদিন সে কত পোয়াতির বাচ্চা হতে সাহায্য করেছে। সেজন্য নেলীও যেন জেনে গেছে বাচ্চাটা ভাল হয়ে উঠবেই। পিসির মত সেও নিশ্চিন্ত হয়ে খুব হাল্কা বোধ করল।

কৈলাশ নিজের চালা ঘরটায় ঢুকে শুয়ে পড়ল মাচানে। সেই দ্রব্যগুণ, সেই জড়ি বুটি, সেই ওস্তাদের দেওয়া মন্ত্র ওকে ছেড়েও যেন ছাড়ছেনা। সেই ঝাড়ফুঁক, সেই যাদুমন্ত্র, সেই মিথ্যা ফেরব্বাজি—যার কোনো দাম নেই, কোনো গুরুত্ব নেই ভাল হয়ে ওঠার জন্য। তবু সে কেউ এলে দ্রব্যগুণের কথা আওড়ায়, যাদু-মন্ত্র করে মানুষের বিশ্বাসকে মজবুত করে তোলে, হারুণ রসীদের দোহাই দেয়, গেরুকে ডেকে বলে—বুঝলি, এ-বারো পেকারের তন্ত্র আছে। শুধু পুষে বড় করা বাচ্চাটার জন্যই—কেউ জড়ি বুটির জন্য হাজির হলে চীৎকার করে বলতে পারে না, সব মিথ্যা, সব ফেরব্বাজি। গেরুটা যে তবে সব জেনে ফেলবে—একা ফরাস-ডাঙ্গার কঙ্কাল তুলতে সাহস পাবে না।

যখন বাবুদের গলি থেকে সূর্য ওঠার চেষ্টা করছে, যখন রামকান্ত

দোকান সাজিয়ে বসেছে—আঁধারের খেয়া পার হয়ে সূর্য যখন পৃথিবীর ঘরে এসে হাজির, তখন চটানের এক দিকে ভীড় জমতে শুরু করেছে। ছেলে, বুড়ো, মেয়ে, মরদ, মংলী, দুখিয়া সকলে একে একে সেখানে ভীড় বাড়াচ্ছে। ছেলে বুড়ো, মেয়ে মরদ গোল হয়ে দাঁড়াল। জনা আষ্টেক জীয়াগঞ্জের মরদ বাঁশে বেঁধে শূয়োর এনে ফেলেছে। ওরা মাঝ রাতে লণ্ঠন হাতে রওনা হয়েছিল। ওরা চটানে পৌঁছল আর ভোর হল। ওরা এই শীতের ভোরেও ঘেমে গেছে। ওরা এখন কৈলাশের ঘরে বসে বিড়ি টানছে এবং বুক ফুলাচ্ছে।

খাসি শূয়োরটা ঘোঁত ঘোঁত করছে পড়ে। চারটা পা বাঁধা বাঁশটার সঙ্গে। তবু পড়ে পড়ে দাঁত দিয়ে মাটি তুলছে। এইসব দেখে পাশের খাটালে বাবুচাঁদের শূয়োরগুলো লাফাল, ছুটতে চাইল।

বাবুচাঁদ শূয়োর নিয়ে আজ বের হবে না। বিকেলে জীয়াগঞ্জ যাবে গেরুর সঙ্গে। সে ঘরে বসে লাঠিতে তেল খাওয়াচ্ছে। সে জন্য শূয়োরগুলো খাটালেই পড়ে থাকল কাদায়—নাক-মুখ ডুবিয়ে পড়ে থাকল। মাঝে মাঝে খাসি শূয়োরটার চীৎকারে ওরা যেন অন্য-মনস্ক হচ্ছিল। যেন দেখছিল—আহাবে।

নেলী ওর ঘরে বসে বলছিল—আহারে।

মংলী ছাই তুলতে তুলতে বলছিল, আহা শূয়োর বটে একখানা! যেমন চর্বি তেমন গোস্ত।

ঝাড়োর বৌ বলছিল, খেয়ে সুখ হবে।

চটানের উপরই শূয়োরটা খুন হবে। বাপ গোমানী খুন করবে। বাপ এখন লাস-কাটা ঘরের মত চেহারা ধরবে। বাপ দা দিয়ে বসে বসে এখন বাঁশ সরু করছে—চাঁচছে। আঙুল টিপে টিপে শুটির ধার দেখছে। এ সময় ওর জিভটা মুখ থেকে বের হয়ে আসছে। কাজ করবে আর, জিভ কামড়াবে গোমানী। বেশ মিহি; বেশ সরু করে শুটির মুখে ধার দিচ্ছে। গোটা চারেক হলে চলবে

আপাতত। কোমরের দু পাশে দুটো, গলার দু-পাশে দুটো বসিয়ে দেবে। এবং লোহার শিকটা গরম করে লেজের নীচে দিয়ে দিলেই হবে। একটা খাসি শূয়োর খুন হবার পক্ষে এই যথেষ্ট। গোমানী বাঁশ চাঁচবার সময় এমন সব ভাবছিল এবং জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছিল।

গিরীশও বসে নেই। সে বড় বড় সব কলাপাতা কাটছে। কলাপাতা এনে চটানে জড় করছে। শূয়োরটার চার পাশের বাচ্চা-গুলো এখন ঢিল ছুঁড়ছে—শূয়োরটার মুখে ঢিল ছুঁড়ে ওরা পরিতৃপ্ত হচ্ছে। ঘাটোয়ারীবাবু জানালা দিয়ে দেখছেন। হ্যাঁ মৃত্যু বটে শূয়োরের মৃত্যু। তিনি জানালার গরাদে হাত রেখে এ সব ভাবলেন। নেলী ঘরে বসে দেখল। সে বের হল না, বের হয়ে শূয়োরের মৃত্যু দেখল না। নতুন বাবু চটানে নেই, তিনি বিকেলে আসবেন। মাচানে শুয়ে শুয়ে নেলী নতুন বাবুর কথা ভাবল। গেরুর বাড়ীতে সে যাবে না, পিসিও যাবে না, তিনি যাবেন না। যখন সকলে দল বেঁধে জীয়াগঞ্জে যাবে তখন তিনি ঘাটের পাহারায় থাকবেন।

অথচ আজ নিয়ে চার রাত নেলী মাচানে ঘুমুতে পারল না। সে নিজেও বুঝতে পারেনি যে গেরুর সাদিতে সে এতটা ভেঙে পড়বে। অথচ যতদিন গেল আফসোসটা তত বাড়ল। গেরুর সঙ্গে যত বার দেখা হল, ততবার সে নিজেকে আড়াল দিল। আগের মত উচ্ছল হল না। হাসি-মসকরা করল না। গেল কাল থেকে নেলী নিজের ঘর থেকেই বের হল না। বের হতে ইচ্ছে হচ্ছে না। কতবার সে গেরুর গলার আওয়াজ পেল, কতবার গেরু এ-ঘরে ঢুকে ডেকেছে নেলীকে, কতবার বলেছে, নেলী তুর বাপ কুথিরে? নেলী সবই আন্দাজ করতে পারল। আন্দাজ করল—গেরু বাপের নাম করে এ-ঘরে সে তার দুঃখ জানাতে এল। আফসোস জানাতে এল। তখন নেলী কোনো জবাব দেয় নি, চুপ করে থেকে গেরুকে ফিরিয়ে দিয়েছে। অথবা বড় বড় চোখে দেখেছে গেরুকে এবং ভেবেছে গেরু তু সব ভুলে গেলি!

ভেবেছে মরদ এত বেইমান হয়, মরদ এত আহাম্মক হয়! মরদ এমন পাগল বনে যায় মেয়েমানুষের জন্য। মেয়েমানুষের শরীরের জন্য এত লুক লুক! এত হয়রানি! এত খানাপিনা! এত গোস্তের রস শনিয়ার শরীরটাকে চটানে তোলার জন্য। নেলী গেরুকে ফিরিয়ে দিয়ে এমন সবই ভাবল কেবল।

শূয়োরটা যত চীৎকার করছে, যত দাঁত দিয়ে মাটি তুলছে, যত মুখে গাঁজলা তুলছে, তত যেন নেলী ভেঙ্গে পড়ছে। তত নেলী মাচানে শুয়ে শূয়োরের কষ্ট কু নিঃশেষে ধরতে পারছে। বাপ শূয়োর-টার কোমরের দু পাশে, গলার দু পাশে বাঁশেব শলা পুঁতে দিচ্ছে। লেজের নীচে লোহার শিক—ভয়ানক বীভৎস। গোমানী শূয়োরটাকে যেন লাস-কাটা ঘরে ফেলেছে—শূয়োরটা শুয়ে আছে, গোমানী শূয়োরটাব কপালে হাতুড়ি ঠুকছে। গোমানী লোহার শিকটা কাঠের আগুনে লাল করেছিল। এই বাড়তি দয়াটকু বাপের কেন যে হল নেলী, বুঝতে পারছে না! আহা! শূয়োরটা মরবে এখন। বড় কষ্ট পেয়ে মরছে। বাপ গুণে গুণে যত শলা পুঁতল তত শোক জমল চটানে। রামকান্ত পর্যন্ত ছুটে এল। বলল, দেখি, দেখি, কি কয়ে পুঁতলি। দেখি, দেখি, কতটা পুঁতসি। আঃ হাঃ ওতেই হবে, বড় দাঁতাল দেখছি।

গোমানী বলল, না বাবু, ও মরবে না। ওয়ার ত কচ্ছপের জান। দাঁড়িয়ে দেখে লেন, আউব ভেবে লেন, কেতনা হারামী আছে ও। সহজে শালা মরছে না বাবু।

গোমানী আব একটা শলা চেঁচে শূয়োরটার পেটে পুঁতে দিল। মোটা এবং গেরুর খোঁটার মত শলাটা চড় চড় করে ভিতরে ঢুকে গেল। তার ওপর গোমানী মুগুব দিয়ে ওটায় তিন চারটে বাড়ি মারল। শূয়োরটা মুখ দিয়ে কতক রক্ত উগলে দিল। শূয়োরটা কুঁকড়ে যাচ্ছে। মুখটা হাঁ করে বীভৎস করে তুলছে। ডোমদের ছোট ছোট বাচ্চাগুলো তবু ঢিল ছুঁড়ল। দুটো কাক

ডাকল ঝাউ গাছটায়। ওরা ঘুরে ঘুরে উড়ল শূয়োরটার উপর। মংলী ঝাঁটা নিয়ে কাক তাড়াল।

গিরীশ পাতাগুলো জড় করে বিছিয়ে রাখছে—একটা দুটো করে ভাঁজ করে। গোমানী আগুন জ্বালল। সকলকে ডেকে শূয়োরটাকে আগুনে তুলে সেঁকে নিল। আগুনের উপরও শূয়োরটা রক্ত উগলে দিল। শেষ বারের মত শরীর থেকে রক্ত বের করে শূয়োরটা এবার সোজা হয়ে শক্ত হয়ে গেল। গোমানী খুসী হল —শালে এতক্ষণে গেল।

নেলী শুয়ে শুয়ে বেড়ার ফাঁক দিয়ে সব দেখল। সব শুনল। বাপের কাণ্ডকারখানায় বিরক্তবোধ করল। যেন শত জন্মে শূয়োর খায় নি বাপ। যেন সাতজন্মে এমন ভোজের আয়োজন বাপ চটানে দেখেনি। নেলী বিরক্ত হয়ে কাঁথা-কাপড় ফেলে উনুনের একপাশে বসে পড়ল। শূয়োরটার কষ্ট শেষ হওয়াতে সে যেন হাল্কাবোধ করল।

হাঁড়িটা বেশ বড়। গঙ্গা থেকে কৈলাশের বৌ হাঁড়িটা ধুয়ে এনেছে। ওরা কয়েকজন মিলে শূয়োরটাকে এখন পাতার উপর রেখেছে। শূয়োরটার শরীরে পোড়া ঘায়ের মত রঙ। কৈলাশের বৌ হাঁড়িটা শূয়োরের পাশে রাখল। গোমানী শূয়োরের পেট চিরল। লাস-কাটা ঘরে ছুরি চালিয়ে হাত ওর পাকা। ছুরির প্যাঁচে পেটটাকে দু ভাগ করল। অদ্ভুত কায়দায় ভিতর থেকে সব ময়লাগুলো তুলে নিল গোমানী। তারপর হাত ঢুকিয়ে পেটের ভিতর থেকে কাদার মত জমাটবাঁধা রক্ত মালসা মালসা তুলে আনল এবং হাঁড়িতে রাখল। কৈলাশের বৌর দুটো লোভী চোখ হাঁড়ির ঢাকনা খুলে দেখছে। দুখিয়া মংলী পরস্পর তাকিয়ে চোখ টান করল। হরিতকী দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে। বাচ্চাটা এখন কাঁদছেনা নীল হচ্ছে না। সে এ-শরীর নিয়ে জীয়াগঞ্জ যেতে পারবে না ভেবে দুঃখ পাচ্ছে। এমন একটা খানা পিনা থেকে বাদ গেল সে। এমন একটা মাইফেলে সে থাকতে পারল না। ওর চোখে সে আফসোস ধরা পড়েছে।

চর্বিগুলো গোমানী ভাগ করে রাখল। মাংসগুলো কেটে কেটে কলাপাতায় স্তূপ করল। শূয়ারটার গায়ে মাংসের চেয়ে চর্বি বেশী। শূয়ারটা বড় জবরদস্ত, শূয়োরের মত শূয়োর বটে। কৈলাশ দাওয়ায় বসে এমন সব কথা বলছে। এখন কৈলাশের মুখে ও মনে বেশ একটা আমিরী চাল। রাজা-বাদশার মত বসে বসে গুজর বানাচ্ছে। আদেশ দিচ্ছে। চটানের সকলের কাছে সে হুজুর বনে গেছে। সকলে এসে ওর পাশে দাঁড়িয়েছে—কি করতে হবে, কোথায় যেতে হবে হুকুম দিচ্ছে। সে গেরুকে বাজারে পাঠাল। লখি, টুনুয়াকে নদীর ওপারে। ঝাড়োকে জীয়াগঞ্জ থেকে কাটোয়া পর্যন্ত গঙ্গার ধারে ধারে যত চটান আছে—সেখানে। সে ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছে। বলছে সকলকে, তুমরা যাবেক কিন্তুক বাপুরা। কৈলাশের পুষে বড় করা বাচ্চাটার সাদি। মেহেরবানী করে তুমরা সব চলোগে। লয়তো কৈলাশের খুব দুঃখ হবে। তুমরা যাবেক সকলে। ঝাড়ে সকলকে দাওয়াত দেবার জন্য চটান ছেড়ে দুদিন আগে চলে গেছে।

আজ এই ভোবে, এই আমিরী ভাবকু কৈলাশকে খুব সুখ দিচ্ছে। সকলের সঙ্গে সে কথা বলল। আজ বৌটারও খুব সুখ। এত বড় একটা শূয়োর এ চটানে কোতল হল, সে ত ওরই বেটার জন্য। চটানের মানুষেরা এত বড় শূয়োর কোতল হতে দেখেছে চটানে—না আর দেখবে! সে ঘরে গেল তখন। কৈলাশের কানে কানে বলল, একটা মাইক লাগা না! বাবুদের বাড়ী গমগম করে উঠুক। বলুক, কৈলাশ ডোমের বেটার সাদি। সহরের লোক যদি না জানল তবে সাদিতে কি সুখ!

কৈলাশ ভাবল, তা বটে, তা বটে। এক বেটার সাদি।

সে ডাকল দুখিয়াকে—দুখিয়ারে, অঃ দুখিয়া।

—হা জী বলেহ।

—তু একবার লখনবাবুর কাছে যা। ওয়াকে বলবি একটা মাইক লিতে হবে। একটা কলের গান ভি লিতে হবে। দশ রূপায়া কাল দে লিব। তু যা।

দুপুরে একটা চাঁদোয়া টাঙানো হল উঠোনে। একটা ঘট বসানো হল। চটানের সকল মেয়ে-মরদ মিলে নদী থেকে জল তুলে ঘটে একটু একটু করে জল ঢালল। মাইক বাজল উঠোনে। বাবুদের বাড়ীমুখো মাইকটা বসানো হয়েছে। খাটালের গলিতে দুটো বড় কড়াইয়ে শূয়োরের গোস্ত জ্বাল হচ্ছে। বড় মাছের ঝোল হচ্ছে। বড় কড়াইয়ে দু কড়াই মিষ্টি আনিয়েছে কৈলাশ। দুখিয়া রান্নার তদারক করছে। মাঝে মাঝে ঘাটোয়ারীবাবু অফিস থেকে নেমে আসছেন। হেঁটে হেঁটে সব দেখাশোনা করছেন এবং সকলকে তাড়া দিচ্ছেন—এবার রওনা হতে হয়।

নেলী উনুনটার পাশে বসে সব দেখল। বাপ ছুটোছুটি করে মরছে। একবার রামকান্তের কাছে, একবার কলের গানের কাছে। লাস-কাটা ঘরের দুজন লোক এসেছিল, বাপ এক ঘণ্টার ভিতর সে-কাজগুলো সেরে চলে এল। বাপের মুখে ঘাম জমেছে। এতদিন পর বাপ যেন একটা কাজের মত কাজ পেল। কৈলাশ ওকে দিয়ে পয়লা নম্বরের কাজগুলো করাচ্ছে বলে—সে কৃতার্থ হচ্ছে। বড় অনুগত আজ গোমানী ডোম। বড় ভালোমানুষ আজ সে।

লখি-টুনিয়া নদীর পার থেকে ফিরছে। ওদের সঙ্গে আরও চারজন মরদ। ওদের কাঁধে বড় বড় ভাঁড়। ওরা পচাই নিয়ে ফিরছে।

ঘাটোয়ারীবাবু ফের অফিস থেকে নেমে এলেন। বললেন, কিরে তোদের এখনও হল না! জীয়াগঞ্জ পৌঁছতে দেখছি তোরা খুব রাত করবি।

ঘাটোয়ারীবাবুকে চটানে দেখে সকলে এসে জড় হল। ওরা খুব ভালমানুষের মত বাবুর কথা শুনল। তারপর সকলে সকলকে তাড়া দিল। বলল, জলদি, জলদি করো। আর দেরী চলবেনা।

ঘরে ঘরে সকলে সাজল। মংলী দাওয়ার নীচে পানের পিক ফেলে আকাশী রঙের শাড়ী পরল এবং ভাবল যদি কাটোয়া থেকে লোকটা আসে, যদি মংলীর সঙ্গে জীয়াগঞ্জে যায়! কাঠের বাক্স

থেকে সে ভাঙ্গা আরশি নিল। নিজের মুখ দেখল এবং পাশাপাশি অন্য মুখটা দেখারও ইচ্ছা। কপালে টিপ দিল কাগজের। চোখে কাজল, পায়ে রুপোর খাড়ু, হাতে রুপোর চুড়ি, নাকে পিতলের নথ পরল, চোখ টান টান করে সকলের সঙ্গে কথা বলছে। তুখিয়াকে ধমক দিচ্ছে। মংলীর ধমক খেয়ে তুখিয়া ফেটি বাঁধল মাথায়, কাঁধে গামছা, গায়ে হাফসার্ট, হাতে লাঠি নিল। হাতে লাঠি নিয়ে তুখিয়া এ-ঘর সে-ঘর করতে থাকল। ছুটো গরুর গাড়ী ভাড়া করা হয়েছে। তুখিয়া দেখে-শুনে গোস্ত, পচাই, মিষ্টি, মাছ—গরুর গাড়ীতে বোঝাই করছে। অন্য গরুর গাড়ীতে গেরু বসেছে টোপর মাথায় দিয়ে। চারপাশে বসেছে চটানের সব বাচ্চাকাচ্চার দল।

বেড়ার ফাঁকে নেলী দেখছে। হরিতকী তবু বাচ্চাটা কোলে নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াতে পারল। নেলী সেটুকু পর্যন্ত পারল না। লজ্জায়, দুঃখে সে চালাঘরটার একপাশে চুপচাপ বসে থাকল এবং বেড়ার ফাঁক দিয়ে গরুর গাড়ীর উপর গেরুকে দেখে তার চোখ ফেটে জল বেরোতে লাগল। গেরু সাদি করতে যাচ্ছে। সে আজ থেকে শনিয়ার মরদ হবে। অন্য চটানে উঠে যাওয়ার জন্য অন্য কোনো মরদ থাকল না নেলীর। সে এ চটানে বড় একা, বড় নিঃসঙ্গ। বাপ গোমানী পর্যন্ত চুল পাট করেছে, তেল মেখেছে, গোঁফে তেল মেখে গোঁফ মোটা করেছে। শক্ত করেছে। বাপ গোমানীকে বড় খুবসুরত লাগছে। গেরুকে আজ বাবু মানুষের মত লাগছে। লতুন কাপড় পরনে, লতুন জামা গায়ে। মাথায় টোপর পরেছে গেরু। সেও কেমন চুপচাপ, কেমন ভেঙ্গে পড়েছে যেন। গেরুকে দেখে নেলীর কষ্ট হতে থাকল। যেন ওর কিছু ভাববার নেই। সে বাপ কৈলাশের হাতে বাঁধা। যেন তার নালিশ—নেলী তু না কাঁদিস। হামাকে তু ভুলে যা। আজ থেকে তুর গেরু মর গিল।

গরুর গাড়ী ছুটো চটান থেকে নেমে গেলে নেলী হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল উনুনের পাশে। চটানে কেউ নেই, হরিতকী গরুর গাড়ীর সঙ্গে কিছুদূর নেমে গেছে। একমাত্র মংলী

তার কাঠের দরজায় তালা দিয়েছে। অন্য সকলের দরজা নেই, তালাও পড়েনি। নেলী ঘর থেকে বের হয়ে চটানের চার পাশটায় হাঁটতে থাকল। সহসা একটি দুরন্ত ইচ্ছা নেলীকে পাগল করে তুলেছে। নেলীকে উত্তেজিত করে তুলেছে। এ-চটানে ওর জন্য কেউ ভাববার নেই, কি হবে এ-চটান দিয়ে, কি হবে বাপ গোমানী, অন্য মেয়ের মরদ গেরুকে দিয়ে, কি হবে এই চটানে বেঁচে থেকে। তার চেয়ে সে অন্য কোথাও উঠে যাবে, অন্য কোথাও গিয়ে ঘর বাঁধবে। সেইজন্যই দুরন্ত ইচ্ছাটা ওকে ঘোড়দৌড়ের মত ছুটাল। ঘরে ঘরে আগুন ধরানোর জন্য নানারকম ফন্দি-ফিকির খুঁজতে থাকল। দরকার হলে সে-আগুনে পুড়ে মরবে। চটানে আগুন দেবার আগে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল, কিছুক্ষণ আকাশ দেখল। দু একবার প্রকট হাসিতে ফেটে পড়তে চাইল। অথচ আত্মহত্যার প্রবল ইচ্ছা নেলীকে হাসতে দিচ্ছে না। ক্রমশঃ বিষণ্ণ হয়ে পড়ছে, ক্রমশঃ হাতে পায়ে শক্তি পাচ্ছে না, এমন কি দেশলাইটা হাতে নিয়ে একটা কাঠি ধরাবার শক্তিটুকু পর্যন্ত নেই। এত ভারী হয়ে গেছে শরীরটা, এত সে ভেঙ্গে পড়েছে।

তখন দুঃখবাবু চটানে উঠে এলেন। চটানটা একেবারে ফাঁকা। কেউ নেই। এমন কি হরিতকীকে দেখতে পাচ্ছেন না। নেলীকে দেখতে পাচ্ছেন না। তিনি চটান অতিক্রম করার সময় ডাকলেন, নেলী আছিস নাকি রে ঘরে? নেলী, ও নেলী। চটান যে একেবারে ফাঁকা। হরিতকীও বুঝি গেছে! নেলী, ও নেলী, সাড়া দিচ্ছিস না কেন?

নেলী তাড়াতাড়ি দেশলাইটা লুকিয়ে ফেলল। ভেতর থেকে উত্তর করল এই যে বাবু আমি ঘরে। শরীর ভাল নেই বলে শুয়ে আছি বাবু।

—কিছু করছিস না ত?

—না বাবু, কিছু করছি না।

—শরীর কি খুব খারাপ যাচ্ছে?

—না বাবু।

—ওরা তবে সব চলে গেল?

—জী বাবু। নেলী আর শুয়ে থাকতে পারল না। খুব খারাপ দেখাচ্ছে ভেবে নেলী তাড়াতাড়ি উঠে বসল। বাইরে বের হয়ে এল। হাতে পায়ের জড়তা ভাঙ্গবার মত শরীর টানা দিল। গেরুর বিয়েতে সে এতটুকু ভেঙ্গে পড়েনি, শরীর টানা দিয়ে এ-মত ভাব প্রকাশ করার ইচ্ছা—যেন ভাবটা—গেরু সাদী করতে গেছে, নেলী পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে।

—তা হলে তুই গেলি না?

—না বাবু। যেতে ইচ্ছে হল না।

—বসে থাকলি একা একা?

—জী বাবু।

—তবে আমার ঘরে আয়, কাজও করবি, গল্পও করবি।

দুঃখবাবু এবার অফিস ঘরের দিকে হাঁটতে থাকলেন। বেলা পড়ে আসছে। দুঃখবাবু ঘরে ঢুকে জানালা খুলে দিলেন। শীতের পাখীরা জানালার আকাশে উড়ছে। পলাশগাছে ফুল ফুটছে। গাঙ শালিকেরা মধু খাচ্ছে পলাশ ফুলের। ওরা উড়ল। ওরা বসল। দুঃখবাবু জানালা খুলে সব দেখতে পেলেন। বাবলার ঘন বনে দুটো মেয়ে কাঠ সংগ্রহ করছে, দুটো কাঠঠোকরা পাখী, দুটো ইষ্টিকুটুম ওর মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। আকাশ ঘন নীল। চালা ঘরটায় ইতস্ততঃ কুকুরের আর্তনাদ। বালি-য়াড়িতে পায়ের ছাপ। হরিতকীর ঘরে বচ্চাটা হাত পা নেড়ে খেলছে। হরিতকী ফিরে এসেছে নদীর ঢালু থেকে। হরিতকী কত রকমের কথা বলল বাচ্চাটার সঙ্গে। দুঃখবাবু নিজের ঘরের কথা ভাবলেন। বৌ বাচ্চার কথা ভাবলেন। ভাবলেন অভাবের সংসার। সুখ-দুঃখের ঘর। ওদের মুখে দুটো অন্ন দেওয়ার জন্যই এই কাজ। ওদের চোখ-মুখে সুখের ইশারা পাওয়ার জন্যই তিনি এখানে মরা মানুষের হিসাব আগলাচ্ছেন। কিন্তু এখানে

এলেই মনটা ভারী হয়ে ওঠে। বুকে নিঃসঙ্গ যন্ত্রণা— মৃত্যু, মৃত্যু। এই ভাব শুধু মনে। তবু আসতে হবে, বসতে হবে। জীবনের শেষ পর্যন্ত এখানে পড়ে থেকে মরার হিসাব আগলাতে হবে। এইসব ভেবে দুঃখবাবু কেমন মুষড়ে পড়লেন কেমন বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন। তখন পাশে কেউ নেই যে দাঁড়িয়ে দুটো কথা বলে সাহস দেবে অথবা দুটো ভিন্ন রকমের কথা বলে মনের মৃত্যু-ইচ্ছাকে অন্যমনস্ক করে দেবে। তিনি ফের ডাকলেন, নেলী, ও নেলী। একবার আয়না বাপু। ঘরে একা বসে বসে করছিসটা কি শুনি। এইসব বলে, ডেকে হেঁকে নিজেই মনটাকে অন্যমনস্ক করতে চাইলেন।

নেলী ঘরে গিয়ে মাচানে বসে পড়েছিল। উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে না। গল্প করতে ইচ্ছে হচ্ছে না। তবু বাবু ফের ডাকলেন। বাবুর কথা অগেরাহ্যিতে আনতে নেই। বাবু যখন ডেকেছেন, যখন এ-দুঃখ যাবার নয়, তখন দুটো ভিন্ন রকমের কথাই বলা যাক নতুন বাবুর সঙ্গে। সে মাচান থেকে উঠল—যেন আর কোন দুঃখ নেই। কিছুক্ষণ আগেও আত্মহত্যার যে প্রবল ইচ্ছা ওকে তাড়না করছিল, নতুন বাবুর ডাকে সে ইচ্ছা আর সাড়া দিচ্ছে না। সেই দুরন্ত ইচ্ছাটাও নেই। বাবু ডাকছে। বাবুর ইচ্ছা ওর পাশে বসে সে গল্প করুক। নেলী নিজের শরীরটার দিকে চাইল। কদিনে শরীরটা আরও যেন বেশী ভারী হয়ে উঠেছে। কোমরের নীচেটা ক্রমশঃ মোটা হচ্ছে। শরীরে মাংস লাগছে। ছোট কাপড়ে শরীর ঢাকছে না। সে নিজেই লজ্জা পেল শরীর ঢাকতে গিয়ে। তবু শরীর কোনরকমে ঢেকে সে বাবুর ঘরে গিয়ে উঠল। দরজার ভিতরে উঁকি মেরে বলল—আমায় ডেকেছেন বাবু! কি কাজ করে দিব বুলে দ্যান।

—দেখ্‌না ঘরটা কেমন নোংরা হয়ে আছে। সেদিন ত ঘরটা পরিষ্কার করে দিলি। দ্যাখ্‌ আজই কি নোংরা হয়ে গেছে। দ্যাখ্‌ তক্তপোশে কেমন দেওয়ালের চুনবালি। মেঝেতে পা

রাখা যাচ্ছে না। দে দে পরিষ্কার করে দে। ঘরটাতে বসতে পারছিনে।

—আপনি টুলটার উপর উঠে বসেন, হামি ঝাড় দিয়ে দিচ্ছি।

ইতিমধ্যে ঘাটোয়ারীবাবু দুঃখবাবুর জন্য একটা ছোট পুরানো তক্তপোশ যোগাড় করে দিয়েছেন। ঘরের একপাশে সেটা পাতা আছে। নেলী নুয়ে প্রথম তক্তপোশের নীচেটা পরিষ্কারের জন্য গলা বাড়াল। নেলী তক্তপোশের নীচেটা ঝাঁট দিচ্ছে—দুঃখবাবু টুলে বসে সব দেখছেন। ওর শরীর থেকে শাড়ীর আঁচলটা একটু নেমে গেছে। দুঃখবাবু দেখতে গিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলেন। নিজের স্ত্রীর কথা মনে হল। ঘরে ওর স্ত্রী আছে। সতীসাধ্বী স্ত্রী। সুতরাং মনের দুর্বিনীত ইচ্ছাটাকে দমন করতে চাইলেন। বিবাহিত পুরুষের এমন ইচ্ছা ভাল নয়। তিনি টুলে বসে আহ্নিকের মত জপ-তপ করতে থাকলেন - বিবাহিত পুরুষের এমন ইচ্ছা ভাল নয়। ভাল নয়। শেষে কেন জানি তিনি নেলীর উপর বিরক্ত হয়ে উঠলেন। তিনি বললেন, নেলী, তুই একটা ব্লাউজ পরতে পারিস না? তোর বাপকে বলবি তুই বড় হয়েছিস। একটা জামা যেন তোকে কিনে দেয়। কথাগুলো দুঃখবাবু ধমকের সুরেই বললেন।

নেলী লজ্জায় মাথা তুলতে পারল না।

তখন সূর্য পুরানো অশথের ডাল বেয়ে নদীর ওপারে নামছে। যে রোদ জানালা বেয়ে মেঝেতে নেমেছিল সে আবার দেয়াল বেয়ে উপরে উঠছে। লাল রঙ ধরেছে। পৃথিবীর সর্বত্র আলো। আলোর রঙ। লাল নীল হলুদ আলো। আকাশ নীল। সাদা মেঘ। টুকরো টুকরো সাদা মেঘের রঙ আকাশে কুর্চি ফুল ফুটিয়েছে। বিকেলের সাদা মেঘ সোনালী রঙে জ্বলছে। নেলী জানালায় মুখ রাখতে পারল না। একটি ব্লাউজের অভাব এই ধরণীর সব সুখকে দুঃখময় করে তুলল। ঘরটা পরিষ্কার করে সে কোন রকমে বাইরে এসে দাঁড়াল।

সূর্যের সোনালী আলো ওর শরীরে এসে নেমেছে। দুঃখবাবু দেখলেন—নেলী সে আলোয় জ্বলছে। নেলীর মুখ, চোখ, শরীর এই আলোর অসামান্য লাবণ্যে বড় মনোরম হয়ে উঠল।

দুঃখবাবু ডাকলেন, কিরে রাগ করলি ?

নেলী জবাব দিল না।

সহজ হবার জন্য দুঃখবাবু বললেন, তোর বিয়েতে আমাকে নিমন্ত্রণ করবি না ? তোর বিয়েতে কিন্তু দেখিস যেন বাদ পড়ি না। কিরে কথা বলছিস না কেন ? মনে থাকবেত আমার কথা ?

—মনে থাকবে। লেকিন সাদি হামার হবে না বাবু।

—কে বললে হবে না ? জরুর হবে। আমি দেখে শুনে তোর সাদি দেব !

—কাঁহা দিবি বাবু ? কোন হামারে সাদি করবে ?

—সবাই করবে। কাটোয়ার চটান থেকে তোর জন্যে মরদ ধরে আনব।

—লেকিন হবে না।

—কেন হবে না ?

—চটানের লোকেরা বুলবে হামি ডাইনী আছি। দিন দিন ডাইনী বনে যাচ্ছি। আপনি ত লতুনবাবু আছে। দুরোজ থাকেন, সব টের পাবেন।

নেলী নেমে যেতে থাকল অফিস ঘরের বারান্দা থেকে। দুঃখবাবু ফের ডাকলেন। নেলী দাঁড়াল না। বাবুরকথাগুলো ওর দুঃখটাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। সে যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকল। নীচে নেমে সে কাউকে না দেখে গঙ্গা যমুনাকে ডাকল। শেষে চটানে উঠে হরিতকীকে বলল, রাতে তু কিছু না রাঁধবি পিসি। হামি আজ রাতে বুড়াটার ঘরে যাবে। আজ তু, হামি—দুটো ভাল মন্দ খেয়ে লিবে।

সন্ধ্যা নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে নেলী গঙ্গা যমুনাকে নিয়ে নদীর পাড় ধরে ছুটতে থাকল। নদীর পাড়ে রাত ঘন হয়ে নামছে। ঘন অন্ধকারে জোনাকী জ্বলছে। নীচে বালিয়াড়িতে পশ্চিমাদের কাঁচা কয়লা পুড়ছে। নেলী ছুটতে থাকল কেবল। কুকুর দুটো ছুটছে। শিমুল-পলাশের অন্ধকার অতিক্রম করে নেলী সেই বুড়োর বাড়ীটার পাশে একটা ঝোপের ভেতর কুকুর দুটোকে নিয়ে লুকিয়ে থাকল। বুড়োর ছেলে দুটো আসছে। কিছু মেয়ে পুরুষ সঙ্গে। পুকুর পাড়ে পেয়ারা গাছের নীচে ওরা প্রদীপ রাখল। ওরা পেয়ারা গাছটার নীচে বুড়োর আত্মাকে খেতে দিল। নেলী ঝোপের ভেতর বসে সব দেখছে। গঙ্গা যমুনাও দেখছে। পেয়ারা গাছটার নীচে মালসাতে খেতে দিয়ে বুড়োর ছেলেরা কাঁদল। মেয়েরা কাঁদল। তারপর ওরা চলে গেল। বুড়োর আত্মাকে শেষবারের মত খেতে দিয়ে ওরা বাড়ীর ভিতর ঢুকে সদর বন্ধ করে দিল। শুধু যারা বাড়ীর জানালা দিয়ে উঁকি দিয়েছিল তারা দেখেছিল প্রথম একটি মেয়ের রূপ ধরে আত্মাটা খাবারগুলো খেল। পরে দুটো কুকুরের শরীর নিয়ে আত্মাটা খাবারগুলোর আশে-পাশে ঘুরে বেড়াল এবং এক সময় পেয়ারা গাছের নীচে প্রদীপটা নিভে গেল।

নেলী সে রাতে ঘরে ফিরে বলেছিল, পিসি তু আর হামি খাবে। খাওয়ার পর ঢেকুর তুলে বলেছিল, বেশ খেলাম নারে পিসি। তু ভি খেলি, হাম ভি খেলাম। গঙ্গা যমুনা ভি খেল। বুড়োটার খুব চিংড়ি মাছের মুড়ো ভাজা খাওয়ার সখ। সব দে লিছে পিসি। ওর বিটিরা কাঁদছে কি পিসি! বুলছে—বাবাগো, তুমি চিংড়ি মাছ খেতে ভালবাসতে গো। বাবাগো তোমাকে দেখতে নারলেম গো। কি কাঁদুছে পিসি। ওয়ার বেটারা পিসি আচ্ছা [illegible] করে।

নেলী খেয়ে উঠে বলল, হামরাও একটা ভোজ্ঞ খেয়ে লিলাম পিসি। আচ্ছা ভোজ।

হরিতকী বলল, ভাত, দাল মিষ্টি রসগোল্লা। মাছের কালিয়া। কত হরেক রকম খাবার খেয়ে লিলুমরে! গেরুর ভোজের চেয়ে এটা কম হল না। কি বলিস তু?

অথচ ঘুরে ফিরে সেই দুঃখটা নেলীর। যত জীয়াগঞ্জের চটানের কথা মনে পড়ছে তত দুঃখ বাড়ছে। এখন হয়ত শনিয়াব শরীরটা গেরুব শরীবের সঙ্গে মিলে আছে। বাপ গোমানী মদ খেয়ে হয়ত হল্লা করছে। কৈলাশের হাঁক-ডাকে হযত গোটা চটানটা কাঁপছে। মংলী মবদেব সঙ্গে হয়ত বালিয়াড়িতে নেমে গেছে। যত রকম ভাবে হতে পারে—সব রকমের ফুর্তি করছে। নেলী নিজের ঘরে ঢোকাব সময় এমন সব ভাবল। এমন সব ভাবায় চোখে-মুখে জ্বাল ধরছে। সে বিছানায় শুয়ে শরীরটাকে শক্ত করে দিল। গাঁয়ে কাঁথা-কাপড় টেনে পায়ে পা ঘসতে থাকল। উপুড় হয়ে পড়ে চাপ দিতে চাইল শবীরে। শরীবের বিশেষ বিশেষ ইচ্ছাব আধার-গুলোতে দুঃখবাবু অথবা গেরুর প্রতিবিম্বকে দেখতে চাইল। গেরুর চেয়ে দুঃখবাবুর প্রতিবিম্ব ওকে বেশী তাড়া করছে। অথবা নেলী সেই প্রতিবিম্বকে ভালবাসতে চাইছে। গেরুর উপর বদলা নিতে চাইছে। সুতরাং নেলীও সেই প্রতিবিম্ব নিয়ে যত রকম ভাবে হতে পারে শরীরের উপর লুফতে থাকল। কিন্তু এই করে গতরে উত্তেজনা শুধু জমছে। বাড়ছে। গভীর রাতে দুঃখবাবুর ঘরের দিকে নিয়ে যেতে চাইছে। নেলী শক্ত হয়ে শুয়ে থাকল মাচানে। মাচান ধরে পড়ে থাকল। শরীরের চাপ মাচানে সেজন্য বাড়ছে। কাঁথা-কাপড়ের ভিতর মাচানের শব্দ উঠছে। সে কিছুতেই শুয়ে থাকতে পারছে না। কিছুতেই নিজেকে আর যেন ধরে রাখতে পারছে না। আর পারছে না। পারছে না। সে উঠে বসল। উত্তেজনায় শরীর

কাঁপছে। মনে হচ্ছে শরীরে ভীষণ জ্বর এসেছে। অথবা বেতো রুগীর মত কেমন এক অলস যন্ত্রণায় ভুগছে। মাচানের উপর বসে সে যেন বুঝল শুধু প্রতিবিম্বকে নিয়ে লেনদেনের হিসাব মেটে না। এতে শরীরের যন্ত্রণা আরও বাড়ে। নেলী নিজের কাছেই খুব অসহায় হয়ে পড়ল। যত ভাবছে উঠবে না, দুঃখবাবুর ঘরের দিকে যাবে না, ততই উত্তেজনায় অধীর হয়ে পড়ছে। অসহ্য মনে হচ্ছে এই মাচান। কপালে ঘাম জমেছে। শরীরের সব রক্ত-মাংস যেন জল হয়ে এক্ষুনি গলে পড়বে। নেলী মাচানে বসে অন্ধকাবে দু-হাত উপরে তুলে ডাকল, ডাকঠাকুর, তু হামারে ভরসা দে।

এমন সময় হরিতকীব ঘরে বাচ্চাটা কেঁদে উঠল। দূবে রাত পেঁচা ডাকল। ঝাউ গাছটার মবা ডালে শকুনেবা পাখা ঝাপটাল। শ্মশানে মড়া নেই। সুতরাং আগুন জ্বলছে না। পিসি ঘুমের ভিতরই বাচ্চাটাকে ষাট সোহাগ করছে।

নেলী ফের ডাকল তার ঈশ্বরকে, ডাকঠাকুর, তু হামারে ভরসা দে লয়তো হামি মরে যাবে, হামি বাঁচবে না।

তারপর নেলী বুঝল তার নিজস্ব কোন ইচ্ছা-অনিচ্ছাব কথা নেই এখন। এটা তার শরীরের ইচ্ছা, সে ইচ্ছার দুঃসহ যন্ত্রণায় মাচান থেকে নেমে দুঃখবাবুর ঘরের দিকে হাঁটছে। তখন হরিতকীর ঘরে আঁধার। নেলীব ঘরে কোনো লম্ফ জ্বলছে না। চটানে আঁধার। চটানে কোনো মরদের সাড়া নেই। মেয়ে মরদ বিহীন এই চটানে নেলী যেন ভূতের মত হাঁটছে। কুকুর দুটো পিছনে আসছে। নেলী ওদের ইশারা করল চলে যাওয়ার জন্য। কুকুর দুটো আঁধারে নেমে গেল। শ্মশানের চালা ঘরটার হ্যারিকেন জ্বলছে। কুকুর দুটো নীচে চীৎকার করল। বাবলার ঘন বনের দিকে ওরা যেন ছুটে গেল। এখন আর কোনো শব্দ নেই। শুধু রাতের শব্দ, রাত পোকার শব্দ। কিছু ঝিঁ-ঝিঁ পোকার শব্দ অথবা যন্ত্রণার শব্দ। কাঠ-

গোলায় কারা যেন হুড়মুড় করে সব কাঠ ঠেলে ফেলে দিল। নেলী দাঁড়িয়ে পড়ল। সন্তর্পণে কাঠগোলার দিকে তাকাল— কেউ সে-ঘর থেকে নেমে আসছে কিনা দেখল। কেউ আসছে না। শুধু একটা কুকুর কাঠগোলা থেকে ছুটে পালাচ্ছে। কুকুরটা কাঠ গোলায় যেন ভূত দেখেছে। তখন নেলীর পায়ের উপর আলো। দুঃখবাবুর ঘরের জানালা দিয়ে আলো এসে নীচে নেমেছে। সে দুঃখবাবুর ঘরের খুব কাছাকাছি এসে গেল। আলোটা ওর পা থেকে বেয়ে কোমরে উঠল। নেলী উপরে উঠে জানালাটা একটু ঠেলে ঘরের ভিতরটা দেখল। নতুন বাবু লেপ দিয়ে শরীর মুখ ঢেকে রেখেছেন। আলোটা পাশের একটা তাকে জ্বলছে। নেলী এবার দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। এবং ধীরে ধীরে ঠেলে দিতেই দেখল দরজাটা খুলে যাচ্ছে। অথচ নেলী দরজাটা বেশী দূরে ঠেলে দিতে পারল না। সে উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে দরজার পাশে বসে পড়ল। মনে হল দুঃখবাবু এক্ষুনি হাজার লোককে ডেকে বলবেন, ডাইনী মাগী আমাকেও খেতে চাইছে।

দুঃখবাবু ঘরে ঘুমোতে পারছিলেন না। চটানের প্রথম রাতযাপন তাঁকে মনের দিক থেকে বিব্রত করে মারছে। তিনি শুয়ে শুয়ে নেলীর কথাই ভাবছিলেন। নেলীর অসহ্য চোখ দুটো শরীরে দুরন্ত যন্ত্রণার জন্ম দিচ্ছে। বাসী কাপড়ের মত স্ত্রীর শরীরটা মনের দড়িতে ঝুলছে। তিনি চোখ বুঁজে পড়ে ছিলেন শুধু। নেলী এই চটানে আছে। মাচানে নেলী একা পড়ে অছে। কুকুর দুটো হয়ত ওকে পাহারা দিচ্ছে। নেলী, নেলী, এই ভাবনা শুধু মনে। বিকেলে এ-ঘরে নেলী না এলেই যেন ভাল করত। কিন্তু মনে হচ্ছে দরজাটা কে যেন ঠেলে দিল। মনে হচ্ছে দরজার ও পিঠে কে বসে হাঁপাচ্ছে। চোখ বুঁজেই তিনি যেন সব টের করতে পারছেন। তিনি ডাকলেন. কে বাইরে? কে দরজাটা ঠেলছিস?

তিনি দরজার ও-পিঠ থেকে কোনো জবাব পেলেন না বলে উঠে বসলেন। চোখ মুখ ঘসলেন। ভাবলেন মনের বিভ্রম হয়ত। তিনি শুয়ে পড়তে যাচ্ছিলেন ফের। কিন্তু শুয়ে পড়ার সময় দেখলেন দরজাটা সত্যি একটু খোলা। ভাবলেন হয়ত বাতাসে। তিনি উঠে দরজা বন্ধ করতে গিয়েই দেখলেন বাইরে নেলী চুপচাপ বসে আছে। বসে বসে যেন শীতে কাঁপছে।

তিনি বললেন, কিরে ভয়ে চটানে ঘুমোতে পারলি না বুঝি? আয়, আয়, ভিতরে আয়। ভিতরে বসবি। বাইরে খুব ঠাণ্ডা।

নেলী উঠে দাঁড়াল। বাবুর কথা শুনতে হয়, সুতরাং সে ঘরে ঢুকে গেল। এখন আর যেন নেলীর কিছু করণীয় নেই। আবার বাবু যদি কিছু বলে, যদি বলে বোস, তবে বসবে। যদি বলে দাঁড়া তবে দাঁড়াবে। যদি বলে অন্য কিছু—তবে, তাই হবে। দুঃখবাবুর কাছে এখন নেলী কাঠের পুতুলের মত হয়ে বাঁচতে চাইল।

সে সময় সহসা বিদ্যুৎ চমকাল আকাশে। জানালায় বিদ্যুতের ছটা এসে নামল। ওদের মুখ উজ্জ্বল হল। শীতের শেষে ঝড়বৃষ্টি হবে। দুঃখবাবু জানালা বন্ধ করে দিলেন। সহসা মনে হল আকাশ কেঁপে উঠছে এবং দু দুবার বাইরের আকাশটা ছাদের পিঠে ভেঙ্গে পড়ল। দুঃখবাবু ভয় পাওয়ার মত করে বললেন, কোথাও বাজ পড়ল নেলী। নেলী কাঠের পুতুল বলে জবাব দিতে পারলনা। আবার তেমনি আকাশ ভেঙ্গে পড়ার শব্দ। জোর হাওয়া দিচ্ছে। দরজা জানালা কাঁপছে। বৃষ্টির ভয়ানক ছাট আসছে। জানালার ফাঁক দিয়ে দেয়াল বেয়ে জল মেঝেতে নামল। মেঝেতে জল জমল। তারপর মনে হল জানালায় কারা যেন ধাক্কা মারছে। যেন লাঠি পিটছে। অথবা কারা যেন জানালায় হাত দিয়ে শব্দ করছে এবং ভয়ানক

কিছু ঘটে গেছে এমন ভাব দেখাচ্ছে। দুঃখবাবু জানালা খুলে বাইরের পৃথিবীতে কি ঘটছে দেখার জন্য ফাঁক করতেই এক পশলা শিলাবৃষ্টি হল ভিতরে। তিনি বুঝলেন বাইরে ভয়ানক শিলাবৃষ্টি হচ্ছে। নেলীকে বললেন, তুই তক্তপোশে উঠে আয়। জলে দাঁড়িয়ে কষ্ট পাচ্ছিস কেন? তক্তপোশে বসে থাক, জল ছাড়লে ঘরে যাবি।

নেলী শীতে কাঁপছিল অথচ কিছু বলছিল না। দুঃখবাবু চাদরটা দিলেন ওকে। নেলী চাদরটা গায়ে দিলনা, জবুথবু হয়ে তক্তপোশের এক কোণায় খুব আল্গা হয়ে বসে থাকল। মেঝেতে জল জমে ক্রমশঃ উপরে উঠছে। শীতে কনকন করছে পাটা। নেলী তবু পা তুলে বসল না।

দুঃখবাবু ভাবলেন ধমক দেবেন। শাসন করবেন। নেলী এটা ভাল হচ্ছে না। আমার কথা অমান্য করতে নেই। তক্তপোশে পা তুলে বোস। চাদরটা গায়ে দে। শীতের ঠাণ্ডা কাউকে রেহাই দেয় না। তোকেও দেবে না, তুই শীতের ঠাণ্ডায় মরবি। অথচ তিনি কিছুই বলতে পারলেন না। গলাটা কেমন কাঠ-কাঠ। গলাটা শুকনো। নেলী সেই যে পুতুলের মত বসে রয়েছে, সেই যে ঘরে ঢুকে চুপ করে গেল—সেই যে ভাব, যদি বলে দাঁড়া— তবে দাঁড়াবে, সে ভাব কিছুতেই যেন কাটিয়ে উঠতে পারছে না। দুঃখবাবুর শীত করতে থাকল। তিনি একটা কাঁথা জড়িয়ে বসলেন। এমন সময় প্রচণ্ড হাওয়ায় জানালার একটা পাট খুলে গেল। আলোটা নিভে গেল। দুঃখবাবু জানালার পাশে ছুটে গেলেন। জানালাটা বন্ধ করার সময় শিলাবৃষ্টিতে ওর চোখ-মুখ ভিজল। শরীরটা ভিজে গেল। অন্ধকারে তিনি কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। তক্তপোশে ধরে ধরে চলছেন। তবু আন্দাজে নেলীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। —চাদরটা দিবি? মুখ মুছব। চাদরটা নেওয়ার সময় তিনি নেলীকেও টেনে তুললেন।

নেলী চীৎকার করে উঠল, তু হামারে ব্যাখ্যা না বানাবি বাবু।

আবার সহসা আকাশ ভেঙে পড়ল ছাদে। দুঃখবাবু নেলীর কথা শুনতে পেলেন না। নেলী এখন নিজেই পাগলের মত দুঃখবাবুকে পেঁচিয়ে ধরেছে। দুঃখবাবুর শরীরের সঙ্গে নেলী এখন মিশে যেতে চাইছে। আর দুঃখবাবু যেন বুঝলেন, ওটা সত্যি নেলীর শরীর মাত্র।

ভোরবেলায় সকলে মিলে একটা বাজপড়া মড়া মানুষ চটানে এনে তুলেছিল। সকলে দেখল সেটা গোমানীর। জীয়াগঞ্জে ভোজ খেতে খেতে মেয়েটার কথা মনে পড়ে গেল। রাতেই সে মেয়েটার জন্য ছুটল। রাতের জল-ঝড় ওকে আটকাতে পারেনি। হঠাৎ বাজ পড়ে চটানে উঠে আসতে সে মরল।

গোমানীকে ঘাটে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘাটোয়ারীবাবু সামনে দাঁড়িয়ে সব কাজগুলো করলেন। কৈলাশ কেমন ঝিমিয়ে পড়েছে। ওকে রাত করে ছেড়ে না দিলেই হত। অনেক দিন পর চটানের সকলে বড় রকমের একটা শোক পেল। ওরা সকলেই প্রায় কেঁদেছে। জোরে জোরে। শুধু নেলী অপলক চেয়ে ছিল। ব্যাপারটাকে সে যেন বুঝে উঠতে পারেনি অথবা বাপ মরেছে এ-কথা সে এখনও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। কেমন হতভম্ব, কেমন পাথর বনে গেছে নেলী। তবু সন্ধ্যার সময় শূয়োরের বাচ্চা দুটোকে ঘরে তুলতে ভুলল না, কবুতরের টঙ বন্ধ করতে ভুলল না। যন্ত্রের মত কাজগুলো করল। ঘরের লম্ফটা জ্বেলে বসতেই কৈলাশের বৌ এল, হরিতকী এল, মংলী এল। ওরা সকলে ওকে ঘিরে বসল। নানা রকমের কথা বলে ওকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল। নেলী কথা বলল না, শুধু চুপচাপ শুনল। দরজার দিকে চেয়ে ভাবল

—বাপ আর এখানটায় বসবে না। বাপ আর গালমন্দ দেবে না। বাপের আশায় সে আর শিবমন্দিরের পথে বসে থাকবে না। এইসব ভেবে নেলীর কান্না আসছে। নেলী কাঁদতে থাকল।

যত বাপের কথা মনে হচ্ছে তত নিজেকে শাপ-শাপান্ত করতে ইচ্ছে হচ্ছে নেলীর। মনে হল রাতের আঁধারে দুঃখবাবুর ঘরে না গেলেই হত। এমন করে শরীরের কষ্টে না ভুগলেই হত। নিজের শরীরটাকে বসে বসে এখন কামড়াতে ইচ্ছে হচ্ছে। বার বারই মনে হচ্ছে ডাকঠাকুর নেলীর পাপের বোঝা বাপের মাথায় ফেলেছে। বাজ হয়ে ডাকঠাকুর বাপের মাথায় পড়ল। নেলীকে সমঝে দিল—ওটা ভাল কাজ লয়। অমন কাজ করতে নেই। করলে ফের ভুগতে হবে।

হরিতকী বলল, হামার ঘরে আয় তু। দুটো খাবি। সারাদিন কিছু খাসনি। এখন তুকে দুটো খানা মুখে দিতে হবে।

—পিসি হামার ভাল লাগছে না।

—এটা কি ভাল লাগার কথা! বকা-ঝকা করত, লেকিন এ-চটানের আদমীত ও। তার লাগি তু না খাবি, শরীর মন্দ করবি ও আচ্ছা বাত লয়। একা একা থাকবি ত মন আওর জ্যাদা খারাপ হোবে। হরিতকী নেলীর হাত ধরে টানতে থাকল।

নেলী হরিতকীর ঘরে চলে গেল।

কৈলাশ দাওয়ায় বসে তামাক টানতে টানতে গোমানীর কথা ভাবল। কৈলাশের কাছে দুনিয়াটা খুব ফাঁকা ফাঁকা মনে হচ্ছে। গোমানী এ-চটানে আর চিল্লাবেনা ভাবতে বড় কষ্ট হয়। তবু উঠতে হবে ভাবল কৈলাশ। ফরাসডাঙ্গায় যেতে হবে। কঙ্কালটার নসিবে শেয়াল খটাসের অত্যাচার কতটা বেড়েছে তা দেখতে হবে। সে উঠে পড়ল।

শনিয়া চুপচাপ মাচানে বসে আছে। গেরু বাঁশে হেলান দিয়ে অন্যমনস্ক হয়েছে। এ-সাদির সঙ্গে গোমানীর মাথায় বাজ পড়ার

কোন অদৃশ্য হাত আছে যেন। গেরু, শনিয়া, মনে মনে এমনই কিছু আন্দাজ করছে যেন।

কৈলাশ ডাকল, হে রে গেরু একবার যে ফরাসডাঙ্গায় যানে লাগে!

গেরু বুঝল বাপ তাকেও ফরাসডাঙ্গায় যেতে বলছে। সে উঠল। শনিয়ার দিকে চেয়ে বলল, তু অমন না ভাবিস। সে বলল, হাম ফরাসডাঙ্গায় যাচ্ছে।

কৈলাশ এবং গেরু সেইমত হাতে বল্লম নিয়ে কাঁধে মদের ভাঁড় নিয়ে বের হয়ে পড়ল। কৈলাশ সঙ্গে একটা কোদাল নিল এবং একটা গামছা নিল। কঙ্কালটা তুলে আজই লিয়ে আসতে হবে। সাবান-সোডাতে সেদ্ধ করতে হবে। দুধের মত রঙ ধরাতে হবে কঙ্কালের গায়ে। দেরি হলে কঙ্কালের্ গায়ে দাগ পড়বে।

নদীর পারে নেমে শ্মশানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ফের কৈলাশ, গোমানীকে মনে করতে পারল। ওর উপকারের কথা মনে হল। বহু দেশ-বিদেশ ঘুরে প্রথম যেদিন সে এ-চটানে এসেছিল থাকবার জন্য বাঁচবার জন্য তখন গোমানীই তাকে থাকবার এবং বাঁচবার সব রকমের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। গোমানী তখন বড় রকমের জোয়ান দু-দশ চটানের। গলায় মোটা কারে সাদা তাবিজ। পালোয়ানের মত দেখতে। অথচ সে চেহারা বড় বেশী জলদি নেতিয়ে পড়ল চটানে। গোমানীর সেই পয়মাল চেহারা বড় বেশী জলদি ভেঙ্গে গেল।

কৈলাশ হাঁটতে থাকল।

গেরু হ্যারিকেন হাতে আগে আগে ছুটছে, ওকে ছুটতে দেখে কৈলাশ ভাবল—গেরু গোমানীর মত পয়মাল হয়ে উঠছে দিন দিন। সে ভেবে খুশী হল যে পুষে বড় করা বাচ্চাটাকে পয়মাল করে তুলতে পেরেছে। সাদি-সমন্দ হয়ে গেল; শনিয়া বিবি চটানে এলো। বাচ্চাটাকে দেখাশোনা করার একটা মানুষ থাকল। অথচ গেরুকে বড় করার জন্য কৈলাশের একদিন কিনা মেহনত। একদা এই

গেরুর জন্য ওকে সব কিছু করতে হয়েছে। গেরুর মা নিজে চলে গিয়ে গেরুর হিসাব ওকে দিয়ে গেল। গেরুর মা বেইমানি করেছে, কিন্তু সে করেনি।

চলতে চলতে মনে হল গেরুর মাকে সে বড় বেশী পিয়ার করত। বড় বেশী সুখ দেওয়ার চেষ্টা করত। অথচ বৌটা বুঝলনা, ভালবাসার দাম দিলনা। জোয়ান মরদের লোভে পড়ে চটান ছেড়ে পালাল। গাছ-গাছালিও চুরি গেল। ওর অভাব বাড়ল। হ্যাকিমী দানবীর ব্যবসা গেল, সঙ্গে সঙ্গে উপোস আরম্ভ হলো চটানে। গেরুটাও ট্যাও ট্যাও করে কেঁদে বেড়াচ্ছে ঘরে ঘরে। ওর মুখে দুবেলা দুমুঠো খাবার দিতে পারছেনা কৈলাশ। যখন কৈলাশ গেরুর মায়ের মুখ গেরুর মুখে দেখতে পেতো, তখন কষ্টটা ওর আরও বাড়ত। সারাদিন—সারা মাস চেষ্টা করে বেঁচে থাকার কোনো এলাদ ঠিক করতে পারছে না। সে ভেঙ্গে পড়ছে। একবার ইচ্ছা হয়েছিল ফের এখান থেকে বের হয়ে পড়ে। কোনো দরগায় অথবা কোনো আখড়ায় হ্যাকিমী দানবীর বিদ্যা আয়ত্ত করে, অথবা পকেটমারের বিদ্যা। ইচ্ছা হয়েছিল চটানে অনেক ডোমের মত চুরি, ডাকাতি রাহাজানি করে বাঁচতে। ইচ্ছা হয়েছিল একদিন গেরুর গলা টিপে সব চুকিয়ে দিতে। কিন্তু কিছুই করতে পারেনি। সে জন্য সারাদিন সারামাস নদীর পার ধরে হাঁটত এবং কোন আকাশে শকুন উড়ল দেখত। হাতে কৈলাশের লাঠি থাকত, কোমরে একটা ভোঁতা চাকু। মড়া গরু-পাঁঠার ছাল তুলে ঘরে ফিরে গেরুর মুখে দুটো দানা দেবার ব্যবস্থা করত।

তখন গেরুটা কত ছোট, কত সরু। সে চুপচাপ বারান্দায় পড়ে থাকত। ঘাটে মরা মানুষ কখন আসবে, কখন বড় মানুষের মড়ার পিছনে খৈ-পয়সা ছিটানো হবে তার অপেক্ষায় সে বারান্দায় পড়ে থাকত। যখন ওরা আসত, গেরু বারান্দা থেকে নেমে শিব মন্দিরের পথে গিয়ে দাঁড়াত। অন্য ডোমের বাচ্চাদের সঙ্গে সে খৈগুলো

মাটি থেকে খুঁটে খুঁটে তুলত। তারপর একটা একটা করে বারান্দায় বসে খেত।

গেরুর একমুঠো ভাত চাই। কৈলাশ এবং গেরুর জীবনে একমুঠো ভাতের দাম চড়ে গেছে। সারাদিন—সারামাস ঘুরেও চটানের অভাবকে দূর করতে পারছেনা। কৈলাশ মাঝে মাঝে ক্লান্ত এবং বিষন্ন হয়ে যেত। সে চটানে ফিরে গেরুকে কাঁদতে দেখলে রাগে দুঃখে ওকে লাথি মারত। যেন লাথি মেরেই খুন করবে এমন একটা ভাব থাকত চোখে-মুখে।

সেই সব দিনে এইসব পথ ধরে কৈলাশ হাঁটত। এইসব পথে, ঝোপে-জঙ্গলে ছাগল, ভেড়া গরু, বাছুর খুঁজে বেড়াত। অথবা আকাশ দেখত। আকাশে শকুন উড়ছে, শকুনেরা জটলা করছে—সে ছুটল। শকুনগুলো যতদূর উড়ল সে ততদূর ছুটল। সে ছুটছে, আকাশ দেখছে। শকুন উড়ছে। শকুনগুলো কোনো কোনো সময় হাজার হারুণ রসীদের মুখ হয়ে আকাশের নীচে ভাসত। ওকে এভাবে ছুটতে দেখে হাসত। যেন বলতে চাইত নসিবের ঘরে কারো রেহাই নেই। যেন বলতে চাইত, নসিব খুনের বদলা নিল। তারপর সে দেখত আকাশ ফুসমন্তরে যেন খালি হয়ে গেল। সেখানে হারুণ রসীদের মুখ নেই, শকুন নেই, কিচ্ছু নেই। হারুণ রসীদ যেন যাদুমন্তর করে এতদূর কৈলাশকে ছুটিয়ে মেরেছে। তারপর আকাশের সেইসব মুখ একসঙ্গে মেঘ হয়ে আকাশকে ঢেকে দিত। সে তখন চীৎকার করে বলত, শালা রসীদ, তুর সব সহ্য হয়, লেকিন ভণ্ডামি সহ্য হয়না। সে পথের উপর বসে হাঁপাতে থাকত। ভাবত নসিবের ঘরে বদলা নেই।

সারাদিন ঘুরে একদিন নদীর পার থেকে চটানে ফিরছে কৈলাশ। তখন বর্ষাকাল। তখন রাস্তাটা পাকা ছিল না। বাজারের মুখে এক হাঁটু কাদা। ঝির ঝির বৃষ্টি পড়ছে। গরুর গাড়ীগুলো গাছের নীচে ঝিমুচ্ছে। গরুগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে। একটা গরুকে ওর বিষ দিতে ইচ্ছা হল। সে গাছের

নীচে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য করল। গাড়োয়ানরা বচসা করছে। সে গাছের নীচে থেকে বিষের পুঁটলিটা কলাপাতায় পেঁচিয়ে বড় গরুটার সামনে ছুঁড়ে আঁধার থেকে সরে দাঁড়াল।

এমন দিন আরও সব গেছে কৈলাশের। সেদিনও সাঁঝ নেমেছিল পারের বাজারে। সেও বর্ষাকাল। রাস্তাটা তখনও পাকা হয়নি। বাজারের মুখে এক হাঁটু কাদা। সে মাথায় একটি মোষের চামড়া নিয়ে খেয়াঘাটের পাশে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ আগে মুষলধারে বৃষ্টি হয়ে গেছে। গরুর গাড়ীগুলো বাড়ীমুখো হয়েছে। গাড়ীর নীচে লণ্ঠন তুলছে। প্রচণ্ডবেগে গঙ্গার ঘোলা জল নীচে নামছে। কৈলাশ মাথায় ছাল নিয়ে পৃথক হয়ে দাঁড়াল। ছালটার টাকা মিললে তার পাঁচটা ভাগ হবে। বড় সামান্য, বড় সামান্য ওর অংশ। খেয়াতে উঠে খুব আপসোস হচ্ছে কৈলাশের।

সে দিনই ঘটনাটা ঘটল।

সে রাতেই সে বেঁচে থাকার এলাদ খুঁজে পেল।

খেয়া থেকে নেমে সে হাঁটছিল। নদীর পার ধরে, বাবলার ঘন বনের পাশ দিয়ে হাঁটছিল। সে তখন গন্ধ পাচ্ছে, কিসের যেন গন্ধ পাচ্ছে। দুর্গন্ধ। পচা গন্ধ। সে খুব খুশী হল। সে দেখল বর্ষার নদী ধরে আর একটা ছাগল অথবা গরু স্রোতের সঙ্গে নীচে নামছে। স্রোতের সঙ্গে ভেসে যাচ্ছে। সে লোভ সামলাতে পারলনা। আকাশের মরা আলো, নদীর ঘোলা জলের উত্তাপ ওকে টেনে নিল। সে জয় ওস্তাদ গুরু বলে লাফ দিয়ে জলে পড়ল স্রোতের সঙ্গে সেও ভেসে চলেছে। বাবলার ঘন বনের আড়ালে মোষের চামড়াটা রেখে এসেছে কৈলাশ। তারপর দুধারে গ্রাম মাঠ, কাশবন। দু-তীরে ঘন সবুজের জঙ্গল। নৌকায় ইতস্তত লণ্ঠন জ্বলছে। কৈলাশ সব কাটিয়ে স্রোতের সঙ্গে ভেসে চলল ওর আগে মরা জন্তুটা ওর সঙ্গে যেন পাল্লা দিচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত কৈলাশ অস্পষ্ট অন্ধকারে ডুব দিয়ে মরা জন্তুটার

একটা পা ধরে ফেলল। সে এত ক্লান্ত, এত উন্মত্ত এবং উত্তেজিত যে ধরেই বলে উঠল—শালা কাঁহা যাওগে তুম! লোভ ওকে এমন মাতাল করে তুলেছে যে সে ওটাকে টানতে টানতে পাড়ে এনে তুলল অথচ দেখলনা এত মেহনতে ওর হাতে কি ধরা পড়েছে।

জল থেকে টেনে তুলতেই কৈলাশের মাতাল ভাবটুকু থাকল না। সে ভয়ে শিউরে উঠল। ঘৃণায় মুখ কুঁচকে উঠল। ওর ওয়াক উঠতে চাইল। সে দেখল, টেনে তোলা জন্তুটা গরু, ছাগল অথবা ভেড়া নয়। একটা মানুষের শরীর, ফুলে ফেঁপে ঢাক হয়েছে। সে আর স্থির থাকতে পারল না, সে ভয়ে চীৎকার করে উঠল, ওস্তাদ গুরুর দোহাই। দোহাই হারুন রসীদের। দোহাই কাছাড় দরগার। সঙ্গে সঙ্গে কৈলাশ তাজা হল। সঙ্গে সঙ্গে সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। মনে পড়ল ওর বাচ্চা বয়সের কথা। বাপ পিতামহের কথা। বাপকে দেখেছে, পিতামহকে দেখেছে। এমন কত কঙ্কাল কুড়িয়ে এনেছে মানুষের। চুপি চুপি কলকাতায় সে-সব কঙ্কাল বিক্রি করেছে। বড় হয়ে সে শুনেছিল হিল্টন কোম্পানীর কথা। জগুবাজারে সে কোম্পানীর অফিস আছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল এতদিনে বেঁচে থাকার এলাদ সে পেয়েছে। গেরু আর উপোস করবেনা। ওকে আর শকুন দেখে বেড়াতে হবে না। এবার সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে। ফের একটা সাদি করতে পারবে। ফের চটানে বুক ফুলিয়ে চলতে পারবে।

তারপর যখন সে মড়াটাকে বাবলার ঘন জঙ্গলে কাদার ভিতর পুঁতে দিচ্ছিল তখন ভাবল, নসিবের ঘবে বদলা নেই। ওকে ফের বাপ-পিতামহের ব্যবসাতেই নেমে যেতে হল।

সে প্রায় দেড় যুগ। হিসাব করলে যেন আরও বেশী হবে। সেই গেরু এখন সময়ের পথ হেঁটে এসে জোয়ান হয়েছে। সেই গেরু এখন ইংরেজ কুঠির পথ ধরেছে। হাতে লণ্ঠন। কাঁধে বল্লম। জোয়ান গেরু ছুটে ছুটে চলেছে। কৈলাশ গেরুর নাগাল

পাচ্ছে না। পথ থেকে নীচে নেমে ডহর পার হবার সময় কৈলাশ ডাকল, গেরু হামার বাপরে পথ দেখে হাঁট। হ্যারিকেনের আলো টিকসে পথে ফ্যাল।

গেরু থামল। হাতে হ্যারিকেন এবং মদের ভাঁড় নিয়ে সে বাপের জন্য অপেক্ষা করল।

শীতের ভিতরও কৈলাশের শরীরটা ভিজে উঠেছে যেন। সে ঘেমে গেছে যেন। গেরুর কাছে এসে একটু দম নিয়ে দাঁড়াল।

গেরু বলল, তু আজ না এলে পারতি বাপ। তু চলতে লারছিস।

—চলতে লারছি! কৈলাশ ধমকে উঠল—কোন বলিছে চলতে লারছি!

—হামি গেরু এ-কথা বলিছে বাপ। তু চলতে লারছিস। ফরাসডাঙ্গার পথে আসতে তু তিন দফে হাঁফ ছাড়লি।

—তিন দফে হাঁফ ছেড়েছি ত বেশ করেছি। বলে, গেরুর হাতের হ্যারিকেনটা জোর করেই টেনে নিল। তারপর এক ধমক, খুব হেঁটে গেরুর মুখে হ্যারিকেন উচিয়ে বলল, কোন বলিছে হাম হাঁটতে লারছি? তু দেখেলে! তু নিজের আঁখোসে দেখে লিলি ত! গেরু হামার বাপরে, শালা হামার পুতরে, হামি সব পারি। হামি লড়তে পারি, হামি বসতে পারি। হামি সব পারি।

ওরা পোড়ো বাড়ীটা পার হয়ে কাঁঠাল গাছটার নীচে দাঁড়াল। রাতের আঁধারে ঝিঁঝিঁরা তেমনি ডাকছে। তেমনি জোনাকী উড়ছে। জোনাকী জ্বলছে। রাতের আঁধারে তেমনি চাপা কান্নার আওয়াজ। ঘাসের ভিতর ছোট ছোট পোকা মাকড়েরা তেমনি হামাগুড়ি খাচ্ছে।

মদের হাঁড়িটা কবরের পাশে রাখল গেরু। আজ সে ঝোপ-জঙ্গলের বীভৎসতাকে দেখল না, অথবা লক্ষ্য করল না। প্রতি-দিনের মত ওরা মদ খেল। এবং উঠে দাঁড়াল। কোদাল মেরে

চাপ চাপ মাটি সরাচ্ছে গেরু। দু-হাতে কৈলাশ মাটি সাফ করছে।

অনেকক্ষণ কোদাল মেরে যখন গেরু ক্লান্ত, যখন কপালের ঘাম মুছে বললে, তু দু-চারঠো কোপ দে ত বাপ, তখন কৈলাশ কোদাল টেনে বলল, হয়রান হয়ে পড়লি জোয়ান! তু মরদ হামারে বলিছে হামি হাঁটতে লারি!

বাপ বেশ কায়দার সঙ্গে ছোট ছোট কোপ মারছে কবরে। অবসর বুঝে গেরু বসে গেছে কাঁঠাল গাছটার নীচে। অবসর বুঝে কিছুটা মদ টেনে নিল। সে ঝিমোচ্ছে। সে দেখছে—বাপ কায়দার সঙ্গে মাটি সরাচ্ছে। ওর নেশা পাচ্ছে দেখে সে যেন না বলে পারল না তুর ভালর জন্যই হামি এ-কথা বলিছে। বুড়া হলি। চটানে থাকলে তুর দেহের ভি ভাল, মনের ভি ভাল। হামার ত আঁধার রাতে ডর থাকার কথা লয়! তু তিন তিনটে কবচ পড়ে দেহে হামার বেঁধে দিলি—ভূত, পেঁত, পীর, পরী, সাপখোপ, বাদী দুশমন কেউ হামার অনিষ্ট করতে লারছে। আঁধার রেতে হামার ডর থাকার কথা লয়। তুত বলিছে হামি রাজারে!

কৈলাশের মনে তখন ভীষণ দ্বন্দ্ব চলছে। কবরের নীচে থেকে কঙ্কাল টেনে তোলার সময় সে যেন বুঝতে পারছে তিনটে কবচই বেইমান, ইবলিশ। তবু সে সব ভুলে গিয়ে বলল, হে তু রাজার বেটা রাজা। একহাতে হ্যারিকেন লিয়ে গর্তের নীচে বসল গেরু। মাটির ভিতর থেকে খুঁজে খুঁজে হাতের হাড়, পায়ের হাড়, আঙ্গুলের হাড়—হিসাব করে গোটা কঙ্কালটাই তুলল। তারপর সে উপরে উঠে ফের বসে গেল। গামছাটা সে বিছিয়ে দিল। হাড়গুলো বিছিয়ে দিল। ওস্তাদ কৈলাশ এখন হাড়গুলো গামছার উপর একটা গোটা মানুষের মত করে সাজাচ্ছে। দুহাতের পাঁচটা পাঁচটা দশটা আঙ্গুল সাজাল। গোড়ালি থেকে মাথা পর্যন্ত সাজিয়ে দেখল ঠিক আছে। গুণে গুণে সব হাড় গেরু তুলতে পেরেছে।

কৈলাশ বলল, দাঁতগুলো কাঁহারে ?

—হামার হাতে আছে বাপ।

—দে-ত, গুণে দেখি ঠিক আছে কি না।

কৈলাশ দাঁতগুলো গুনল। এক দুই করে বত্রিশটা দাঁত। খুশিতে কৈলাশের মুখটা কুঁচকে উঠছে। মাঝে মাঝে থুথু ছিটাল। পোড়ো বাড়ীটাকে ব্যঙ্গ করল। এবং গোটা কঙ্কালটা মাটির উপর বিছিয়ে দিয়ে যখন দেখল কবরের নীচে কিছু পড়ে নেই, তখন কৈলাশ ব্যস্ত হয়ে খুলিটাকে পরখ করল। চোয়ালের হাড়টা দেখল এবং আলগা দাঁতগুলো গুণে হিসাব করে বুঝল—সাবাস বেটা গেরু, খুঁজে খুঁজে মেয়েমানুষটার সব কটি দাঁত সংগ্রহ করেছে।

সামনে দুটো দাঁত কষ্টি পাথরের মত কালো। পান-দোক্তায় অন্য দাঁতগুলোতেও কালো রঙ ধরেছে। গেরুর মা-র কথা মনে আসছে। পান-দো[illegible] খেত বৌটা। মুখের একটা দিক সব সময়ের জন্য ফুলে থাকত। ঘাসের নীচে থেকে কিছু বালি নিয়ে কৈলাশ সামনের একটা দাঁত ঘসল। বালিতে ঘষে পরিষ্কার করল। পান-দোক্তায় পাথর পড়া দাঁতগুলো সাফ হল না, অথচ একটি দাঁত বালির ঘষা খেতে খেতে তামার রঙ ধরল। কৈলাশ দাঁতটাকে হাতের সমস্ত জোর দিয়ে পরিষ্কার করল। দেখল তামার বাঁধানো একটা দাঁত। দাঁতটা দেখে ওর শরীর হাত পা সব কাঁপছে। খুঁজলে যেন সে আরও একটা তামার বাঁধানো দাঁত পাবে। সে ভয়ে দাঁতটা খুঁজল না। শুধু গেরুর মার বাঁধানো দাঁত দুটোর কথা ভাবতে গিয়ে কঙ্কালটাকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা হল। কঙ্কালটার বুকের উপর লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে ইচ্ছাহল। সে যেন কাঁদল—গেরুর মা তু ভাগ গিলিরে!

কৈলাশের আওয়াজ খুব অস্পষ্ট। পাশের গেরু পর্যন্ত শুনতে পায়নি—কৈলাশ কাঁদছে। কৈলাশ হাড়গুলোকে খুব

ধীরে ধীরে নাড়াচাড়া করল। খুব ধীরে ধীরে বুকের পাঁজর-গুলো চোখের সামনে এনে দেখল। তারপর কোনরকমে কঙ্কালটা গামছায় বেঁধে পথ চলতে থাকল। গেরু খুব অবাক হয়ে বাপকে অনুসরণ করছে। বাপ যেন ঝোপ-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে অন্ধের মত ছুটে চলছে। বাপের সঙ্গে সে ছুটে নিজেকে সামলাতে পারছে না।

কিছুদূর এসে কৈলাশ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। পিছনে টিবি, নীচে জলো ঘাস, ও বোৎল্যাংড়ার জঙ্গল ধারে ধারে। ঘন জঙ্গল দু-পাশে। জঙ্গলের ভিতর কৈলাশের শরীরটা পড়ে রয়েছে। পড়ে থেকে বিলাপ করছে—হামি গেলামরে, হামারে খেয়ে লিলরে।

গেরু আলোতে বাপকে দেখতে পাচ্ছে না। দূরে শুধু চীৎকার শুনছে—গিলামরে, খেয়ে লিলরে। আলোতে ওর নিজের ছায়াটা নড়ছে। পোড়া বাড়ীটাতে কারা যেন কথা বলতে শুরু করেছে, কারা যেন সব দরজা জানালাগুলো খুলছে, বন্ধ করছে। বুনো ঘাসের ভেতর থেকে গন্ধ উঠছে। গেরু আলোটা নিয়ে আশেপাশের জঙ্গলে খুঁজতে থাকল বাপকে। টিবির নীচে নামল গেরু। বাপকে দেখতে পেয়ে বলল, উপুড় হয়ে পড়ে আছিস ক্যানে! কি হয়েছে তুর।

গেরুর উপস্থিতিটা কৈলাশের এ-সময় ভাল লাগল না। মনে হল বেইমানটা সব গোলমাল করে দেবে! এতদিনের গড়ে তোলা সমস্ত বিশ্বাসকে এক মুহূর্তে ভেঙ্গে দেবে। সেজন্য কৈলাশ উঠে দাঁড়াল। জামা-কাপড় ঝাড়ল এবং নিজেকে সামলে পায়ের যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করতে চাইল। গেরুর হাত ধরে বললে, জলদি চটানে নিয়ে চল। হামি হাঁটতে লারছি। বুক হামার শুকিয়ে উঠছে।

বাপকে ধরে তোলার সময় গেরু দেখল, বাপের পা থেকে নীলরক্ত গড়িয়ে পড়ছে। ঝোপের ভিতর কিসে যেন বাপকে কামড়েছে।

সে চীৎকার করে উঠল—বাপ!

—তু জলদি চল! বাপ বাপ বলে চীৎকার হাকৃরালসনা।

—তুকে বাপ মা মনসার বাহন ছোবল দিছে। তু বস, পাটা জলদি বেঁইধে দি।

কৈলাশ খেঁকিয়ে উঠল, চুপ কর তু শালা শূয়োরের ছা, লটকনের বাচ্চা। মুখ কুঁচকে ব্যাঙের ছাতার মত হয়ে গেল। সে বলল, মা মনসার বাহন কামড়ে দিছে! বুললি আর অমনি হয়ে গেল। সাহস কিরে লটকনের ছা, শালী হামারে ছোবল মারবে! হাতে লাগেশ্বর কবচ তুর মুখ দেখার লাগি! শেষে কৈলাশ পাগলের মত হাসল। এবং এ-সময় ওর মুখ দেখলে ছুনিয়াব সব মানুষের দয়া হত। নসিবের ঘরে বদলা নেই, বদলা নেই—এ-ভাবটুকু শুধু মুখে। সে চলতে চলতে বলল, ও কিছু লয়, ও কিছু লয়। ছুঁচট খেয়ে পাটা ছিঁড়ে গেল। তু আয় বাপ, হামারে একটু ধরে চল।

চটানে ফিরে কোনরকমে ছুটো চোখ টেনে বলল কৈলাশ, বারান্দায় শুইয়ে দে বাপ! দোহাই তুর ওস্তাদের কাউকে ডেকে লিস না। বেশ আছি। আচ্ছাই তবিয়ত আছে। তু থোড়া পানি হামার শিয়রে রেখে যা বাপ। দোহাই তোর ওস্তাদের কাউকে ডেকে লিস না।

চালা ঘরের বারান্দায় বাপকে শুইয়ে দিয়ে ভিতরে ঢুকল গেরু। ঘরটা অন্ধকার। সে পকেট থেকে দেশলাই তুলে লম্ফ জ্বালল। হাতের পুঁটলিটা নীচে ঠেলে দিল। মাচানের উপর শনিয়া শুয়ে আছে। নিঃশেষে ঘুমুচ্ছে। কিন্তু এ-শরীর নিয়ে বৌর কাছে যেতে সঙ্কোচ হল। অথবা মনে সংশয়ের জন্ম হচ্ছে। সে বাইরে বের হয়ে হাত পা ধুল ভাল করে। চারপাশে আঁধার। অফিসঘরের বারান্দার ও-পাশে কারা যেন নেমে যাচ্ছে। শুধু ছুখিয়ার ঘরে লম্ফ জ্বলছে। অন্য চালা ঘরগুলোতে কোনো লম্ফ জ্বলছে না। নেলীর ঘর থেকে

গঙ্গা-যমুনা চটানে বের হয়ে এল। ওরা শূয়োরের খাটাল পার হয়ে আঁধারে নেমে গেল।

ঘাটে দুটো চিতা জ্বলছে। কতকগুলো মানুষ দুটো মানুষকে পোড়াচ্ছে। বাতাসের সঙ্গে পোড়া গন্ধ উঠে আসছে। বুক ভরে গন্ধটা নিতে খুব ভাল লাগল। কঙ্কালের গন্ধের চেয়ে ওর এ-গন্ধটা ভাল লাগছে।

উঠোনে দাঁড়িয়ে ভাবল গেরু, দুখিয়াকে ডেকে বাপের নীল রক্তের কথা বললে হয়। সে দু-কদম দুখিয়ার ঘরের দিকে পা বাড়াল। ডানদিকের বেড়াটা ঘেঁসে সে দুখিয়ার ঘরে ঢুকল। মদ খেয়ে ওরা দুজনে সন্ধ্যায় উন্মত্ত হয়েছিল, রাতে ঘরে আলো জ্বেলে শরীর যন্ত্রণার উপশম খুঁজেছিল। তারপর কখন আলো না নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সে ঘরে ঢুকে দেখল ওরা উলঙ্গ হয়ে শুয়ে আছে। খাটের কাঁথাকাপড়ের উপর ওরা দুজন মা-বসুন্ধরার মতই নীরব। হাঁড়ির মত দুটো পেট মদে ঢাক। এইসব দেখে গেরুর যন্ত্রণা বাড়ছে। সে উত্তেজিত হয়ে পড়ছে। সে মুখ বাড়াল। সে উঁকি দিল। মংলীর শরীরে মা-বসুন্ধরাকে দেখতে পাচ্ছে। সে যেন চিনতে পারছে এরা ভূমি। বীজ দুখিয়া। ভূমি মংলী। গেরু দেখল ভূমির শরীরে হাজার বীজ সব পড়ে আছে।

দুখিয়াকে ডাকতে পারল না গেরু। শরীরে ওর ভয়ানক উত্তেজনা। চোখ দুটোতে ভয়ানক জ্বালা। শরীরের যন্ত্রণা কমছে না। উঠোনের উপর নেমে এসেও ওর শরীর ঠাণ্ডা হচ্ছে না। সে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ঢুকে গেল। তাড়াতাড়ি মাচানে শুয়ে শনিয়াকে জাগাল।

তারপর আবার রাত কাটানোর পালা। চটানে সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে। চিতার আগুনে আকাশ আর লাল হচ্ছে না। বোধ হয় এতক্ষণে মানুষ দুটোও পোড়া হয়ে গেছে। শনিয়া, গেরু অনেকক্ষণ ধরে ফিসফিস করে কথা বলল। এবং এক সময় ঘুমিয়ে

পড়ল। অথচ ঘুম ভাঙতে দেরী হল না। মাচানের নীচে কিসের যেন শব্দ। কারা যেন মাচানের নীচে নাচছে। অথবা গোটা কঙ্কালটা প্রাণ পেয়েছে যেন। মাচানের নীচে কঙ্কালটা নাচছে। অথবা কঙ্কালটা হেঁটে বেড়াচ্ছে মাচানের নীচে। সে মাথা তুলে সব শুনল। সে ডাকল—বাপ! বাপ! কিন্তু বারান্দা থেকে কোনো জবাব এল না। সে ভয়ে ভয়ে ফের ডাকল, বাপ! বাপ দ্যাখ্, কঙ্কালটা মাচানের নীচে নেচেকুঁদে লিচ্ছে। তবু বারান্দায় কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। বাপের কথা মনে হল। তাবিজের কথা মনে হল। সঙ্গে সঙ্গে ভয়টা কেটে গেল। তখন লম্ফটা জ্বালল এবং সে আলোতে দেখতে পেল ঘাটের একটি অভুক্ত কুকুর কঙ্কালের রস চুষে খাচ্ছে।

—শালে তু। গেরু লাফ দিয়ে কোণ থেকে সড়কিটা টেনে নিতেই কুকুরটা ভয়ে চীৎকার করল এবং ছুটে পালাল। গেরু কুকুরটাকে তাড়াবার জন্যে উঠোন পর্যন্ত নামল এবং বারান্দায় বাপকে কিছু বলতে গিয়ে দেখল বাপের শরীরটা শক্ত হয়ে আছে।

কৈলাশ ডোম মারা গেছে।

একদিন গেল, দু-দিন গেল। একমাস, দু-মাস গেল। চটানে গোমানী নেই, কৈলাশ নেই। তেমন নাচন-কোঁদন নেই, হৈ-হল্লা নেই। শীত কমে গেছে। শিমুল গাছে ফুল থেকে ফল ধরেছে। ফল ফেটে এখন তুলা উড়ছে শ্মশানে, চটানে। হাওয়া উঠছে দুপুরের দিকে। ঝাড়ো ওর ঘরটার উপর বেশী কাঁথা-কাপড় চাপাচ্ছে। দুখিয়া একটা মাটির ঘর তুলছে। অথচ ঝড়ো হাওয়া সব উড়িয়ে নিতে চাইছে। গেরু এখন ফরাসডাঙ্গায় মাঝে মাঝে যায়। শনিয়া সেজেগুজে রাতে শুয়ে থাকে। দু-দিন ওরা সিনেমায় গিয়েছিল, শনিয়া প্রায়ই গুন গুন করে হিন্দী গান গায়। শনিয়া নেল্লীকে গানটা একদিন শুনিয়েছে। এতদিন শনিয়ার উপর যে

রাগটা পুষে ছিল গান শোনানোর পর থেকে সে রাগ আর থাকল না। রাগটা কেমন করে যেন জল হয়ে গেল। এবং সেদিন থেকেই শনিয়ার সঙ্গে দু-চারটা সুখ-দুঃখের কথা বলে নেলী সুখ পাচ্ছে।

আর সেদিনই নেলীর একবার বমি করার প্রবৃত্তি হল। সেদিনই শরীরটা ভারী ভারী মনে হল। মনে হল মা-বসুন্ধরা কেমন মাতাল হয়েছেন। মনে হল রাতে কিছু খেলে আবার বমি হবে। কিছু খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। শুধু শুয়ে থাকতে ভাল লাগছে। সমস্ত মুখে কেমন বিশ্রী থুথু উঠছে কেবল। সে একবার উঠে থুথু ফেলল, দু-বার ফেলল, তিনবার ফেলল—শেষে আর পারল না। মাচানে শুয়ে শুয়েই থুতু ছিটাতে থাকল। ঘরে আলো জ্বালল না নেলী। আঁধারের ভিতর চুপচাপ শুয়ে রইল। এবং এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোর বেলায় ঘুম থেকে ওঠার সময় সে চোখে-মুখে অন্ধকার দেখল। মনে হল পিসির কথা। ঝাড়োর বৌর কথা মনে হল। ওরা চটানে বাচ্চা দেবার আগে যে সব যন্ত্রণায় কাতর হত নেলীও সেই রকম যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়ছে। নেলী তাড়াতাড়ি মাচানে শুয়ে পড়ল। মনে হল তেষ্টা পেয়েছে খুব। সে ডাকল—শনিয়া, শনিয়ারে থোড়া পানি দে। থোড়া পানি দে শনিয়া।

তখন দুঃখবাবু উঠে গেল অফিস ঘরের বারান্দায়। নেলী বেড়ার ফাঁক দিয়ে দুঃখবাবুকে দেখল। সে হাসল। দুঃখবাবুর চোখে-মুখে এখনও লজ্জা। এখনও সংশয়, সংকোচ। দুঃখবাবুর এই চোখ, এই মুখ দেখে নেলীর খুব ভাল লাগে। ওর ভোরের ব্যথা দুঃখবাবুকে দেখে মুছে গেল। ওর ইচ্ছা হল ফের সে দুঃখ-বাবুর পায়ের কাছে গিয়ে বসে। দুঃখবাবুকে ভালবাসে। বাবুর সব কাজগুলো করে দেয়। দুঃখবাবুর শরীরটা ওর নিজের শরীরে এসে বাসা বেঁধেছে। এই সুখানুভূতিতে নেলী লজ্জায় এবং আনন্দে মুখ গুঁজে দিল। বাপ আবার ফিরে আসছে চটানে, বাপ আবার

ওকে আশ্রয় দেবে। বাপ নাচবে—কুঁদবে। নেলী এই সব ভেবে ফের ডাকল শনিয়া, শনিয়ারে থোড়া পানি দে। থোড়া পানি দে শনিয়া।

শনিয়া ঘরে এসে জল দিল নেলীকে। বলল, আভি তক শুয়ে থাকলি মাচানে। উঠবিনে? তবিয়ত বুঝি আচ্ছা না আছে?

নেলী শুয়ে থেকেই জবাব দিল, আচ্ছা না আছে।

—কিছু খাবি-দাবি? রুটি করে লিচ্ছি!

নেলী বলল, তুটো আম দিয়ে অম্বল করে লিবি?

—লিব। লেকিন তুর তবিয়ত আচ্ছা না আছে। খাটা খানেসে ভোগান্তি হোবে।

—কিছু হোবে না। তু দে লিবি, হামি খেয়ে লিব। হামার কিচ্ছু হোবে না।

শনিয়া চলে যেতে চাইলে নেলীর বলতে ইচ্ছা হল, তুকে একটা বাত বুলবে, লেকিন কাউকে বুলবি না। শনিয়া ততক্ষণে চলে গেছে। সুতরাং নেলীর বলা হল না। নেলী পাশ ফিরে শুল।

নেলীর সুঠাম শক্ত শরীরটা তু-একদিনের ভিতরই কেমন ভেঙ্গে যেতে লাগল। চটানের সকলেই ধরে ফেলেছে। শনিয়া চুপি চুপি বলেছে গেরুকে। হরিতকী এসে নেলীর ঘরে বসে বলেছে—এ আচ্ছা কাজ হল না নেলী। তু ভি হামার মত হলি। জ্বলে পুড়ে খাক হবি। যেন বলতে চাইল হরিতকী, তুকে নতুন বাবু থোড়াই কেয়ার করবে।

নেলী কোনো কথারই জবাব দিচ্ছিল না। সে চুপচাপ মাচানে পড়ে পাশের একটা মালশাতে থুতু ফেলছে। চোখ তুটো জ্বলছে। যেন বলতে চায়, ডাইনী মাগীর আবার ভাল মন্দ। একটা বাচ্চা হবে, তার আবার নতুন বাবু, পুরানা বাবু! তার আবার গেরু, টুনুয়া। গেরুর বিবি শনিয়া না হয়ে নেলী হতে পারত, চটানের যে কোনো মেয়ে হতে পারত। এ সব ভেবেও নেলী জবাব দিল না। এই সব ভেবে ভেবেই যেন চোখ তুটো ওর নীচে বসে যাচ্ছে। কেমন

করুণ দেখাচ্ছে। গিরীশ কিছু বলছে না। গেরু বলছে না কিছু। মংলী ঘরে ঘরে টি টি দিয়ে বেড়াচ্ছে। গোমানী মরল—তার মেয়েটাও মরদ ধরল। এমন সব কথা বলে মংলী মনের সুখ বাড়াচ্ছে, মনের ঝাল ঝাড়ছে। নেলী মাচানে শুয়ে সব শুনেও কোনো জবাব দিত না। অথবা জবাব দেওয়ার ইচ্ছা থাকত না।

নেলীব এ বমি-বমি ভাবটা কিন্তু বেশী দিন থাকল না। থুতু ফেলাটাও এখন কমে এল। তখন বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাস। গরমে ঘর-বার হওয়া দায়। নেলী এমন দিনেই আবার ঘর-বার হতে থাকল। ফলন্ত শরীর নিয়ে নেলী ঝাড়ো ডোমের সঙ্গে ব্যবসা আরম্ভ করল। ঝাড়োর কাছ থেকে ডালা-কুলো নিয়ে সে চটান থেকে বের হয়ে যেত। দুপুর রোদে গাওয়াল করে বেড়াত। গেরস্ত বাড়ী ঢুকে বলত, মা মাসীরা আছেন লাকি! ডালা-কুলো লেন।

গেরস্ত বৌরা বলত, তোর ডালা-কুলোর দাম বড় বেশী নেলী।

—তা যে হবেই মা মাসী। হামার যে আর কেউ লেইগ মা মাসী। থাকলে কমে দিতে পারতাম। এ পয়সায় হামি খাব, কিছু সঞ্চয় করে লিব। হামার ফলন্ত শরীরটা আর কদিন একা থাকবে মা মাসী।

এ সব শুনে গেরস্ত বৌদের দয়া হত যেন। করুণা হত। এমন নাক-চোখ মেয়েটার! এমন শরীর মেয়েটার! কেউ বলে নেই ওর! ওরা সেজন্য চাল দিত, ধান দিত বেশী। পয়সা দিত। নেলী সব মাথায় করে চটানে ফিরত, ঝাড়োর সঙ্গে হিসাব করতে বসত। ঝাড়োর পাওনা মিটিয়ে সে ঘরে ফিরত। ঘরে ফিরতে রাত হোত কোনোদিন। দূর গাঁয়ে গাওয়াল করতে গেলেই এমন হত। পেটের বাচ্চাটার জন্য নেলী গঙ্গা-যমুনাকে নিয়ে গাওয়াল করতে করতে কতদিন কোথায় চলে গেছে! কতদিন সূর্য মাথার উপর উঠে কখন হেলতে আরম্ভ করেছে, কখন বিকেল হয়েছে খেয়াল থাকত না নেলীর, সে হাঁটত। হাঁটত। সে ঘরে ঘরে গাওয়াল করত। ফলন্ত শরীরের জন্য মায়া হত। বাচ্চাটার জন্য মায়া হত।

গঙ্গা-যমুনা পাশে পাশে থাকত। পাশে পাশে হাঁটত। চাল, ধান, পয়সা কত হল, দু-চার বাড়ী গাওয়াল করে নিতে পারলে, দু-চারটা গ্রাম ঘুরতে পারলে আর কত হতে পারে—সেই হিসাব শুধু মনে। বাপ ফের ওর ঘরে ফিরে আসছে, বাপ আবার ওকে শাসন করতে আসছে—এই ভাবনায় সে শুধু পথ চলত। মাঝে মাঝে গঙ্গা-যমুনাকে বলত, তু'গো একটা ভাই হবে। হামার মতই কিন্তুক ওয়াকে ভালবেসে লিবি, হামি তো একা একা তু'দের জন্য কুথা চলে যাব, তখন তুরা উয়াকে পাহারা দিবি।

প্রতিদিনের মত আজও চটানে সূর্য উঠেছে। প্রতিদিনের মত আজও চটান থেকে নামছে নেলী। সঙ্গে গঙ্গা-যমুনা। নেলীর মাথায় ডালা, কুলো, ঝুড়ি। দিন রাত বসে ঝাড়ো আর ওর বৌ-ছেলেরা এসব তৈরী করেছে। নেলী ওদের থেকে কিনে নিচ্ছে। দূর গাঁয়ে ডালা কুলো সব বিক্রি করছে। সে এখন নদী পার হবে। গ্রীষ্মের নদী শুকনো। মরা নদী। কোথাও কোথাও জল জমে আছে। কোথাও কোথাও বালি চিকচিক করছে। জল আয়নার মত। নেলী নদীর জল ভেঙ্গে পার হওয়ার আগে দু-আঁজলা জল খেল। বলল, মায়ী গঙ্গা তুর দুধ খেয়ে লিলাম।

নেলী নদী পার হয়ে তিলতলা, গোয়ালজান, রসরাজপুর, হলদিচক, পদ্মনাভপুর হয়ে কাইন্দি, বাসন্তী বলরামপুর ঘুরে যখন কোনো বাড়ীর ভিতর ঢুকে দুটো কথা বলে বিশ্রাম করত, তখন কেউ প্রশ্ন করত—মুখটাত শুকিয়ে গেছে রে। কিছু খেয়ে বুঝি বের হসনি।

—কি যে বু'লেন মা! না খেয়ে ফলন্ত শরীর নিয়ে বের হতে আছে! মায়ীর দুধ খেয়ে লিছি, সারা দিনমানে ভুখ আর না লাগবে মা মাসী। তবু যদি ওরা পীড়াপীড়ি করত নেলী তখন দুটো খেয়ে বলত, মা ঠাকরুণ, বড় দয়া আপনাগ। হামারা গঙ্গা-যমুনাকে দুটো দিলাম—কিছু মনে করে লিবেন না।

সকলে কুকুর দুটোকে তখন দেখতো। কুকুর দুটোকে দেখে ওরা ভয় পেত। কুকুর দুটোর দিকে চেয়ে ওরা বলত, এ দুটোকে

সামলে চলিস বাপু। কুকুর পুষিসনি তো যম পুষেছিস। কখন কার সর্বনাশ করবে—তখন বুঝবি ঠেলা।

—মা-মাসীরা অমন কথা বুলবেন না। ওরা হামার বেটা আছে। ওরা হামার সাত জনমের মেহমান। নেলী কুকুর দুটোকে ধরে চুক চুক করত। ওর আদর করার ঢং দেখে গেরস্ত বৌরা হাসত।

সেদিনও নদী পার হয়ে চটানে ফিরতে রাত হয়ে গেল। অন্ধকার পথ—কিছু দেখা যাচ্ছে না। কুকুর দুটো ওকে পথ দেখিয়ে চলেছে। নেলী হাঁটছে পা চালিয়ে। মাথায় চালধানের বোঝা। শরীর ভারী বলে পা চালাতে পারছে না। বালিয়াড়ি অতিক্রম করতে খুব কষ্ট হচ্ছে। নদীর পারে ওঠার সময় সে খুব হাঁপিয়ে পড়ল। এখানে একটু বসল নেলী। সারাটা দিন স্যাঁকা রুটির মত গরমে সে পুড়েছে। নদীর ঠাণ্ডা হাওয়ায় বসে থাকতে ওর খুব ভাল লাগল। এখানে বসে চটানের আলো দেখতে পেল সে। দুঃখবাবু হয়ত এতক্ষণে ঘরে ফিরে গেছেন। শনিয়া, গেরু, হয়ত মাচানে ঘুমিয়ে পড়েছে। শ্মশানে আগুন জ্বলছে না। এখানে বসে বাবলার ঘন বনে কুকুর দুটোর আওয়াজ পেল। ওরা বুঝি শেয়াল তাড়াচ্ছে ভেতরে। নেলী দুটো পা ছড়িয়ে ঘাসের উপর শুয়ে পড়ল। যেন শরীরটাকে ঘাসের উপর বিছিয়ে দিয়ে একটু ঠাণ্ডা হতে দিল। শুয়ে শুয়ে নেলী এক, দুই করে তারা গুণল। এক, দুই করে ঘণ্টা পেটার আওয়াজ শুনল। এক, দুই করে এতদিনের সঞ্চয়ের কড়ি হিসাব করল। —বাপ, বাপরে। পেটের নীচে হাত বুলিয়ে যেন বলতে চাইল, তু আচ্ছা আছে ত বাপ। নেলী আরও নীচে হাত নামিয়ে বাচ্চাটাকে আদর করবার সময় লক্ষ্য করল, কে যেন সন্তর্পণে ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

নেলী ভয় পাওয়ার মতন করে বলল, কোন? কোন ওখানটায়? সে ডেকে উঠল, গঙ্গা! যমুনা!

দুঃখবাবু বললেন, আমি নেলী, তোর দুঃখবাবু

—বাবু! হামার খুব ভয়ে ধরেছিল বাবু।

—খুব গরম পড়েছে। শরীরে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগাচ্ছি।

—আজ রাতে তু বাবু ঘাটে থাকবি বুঝি?

—ঘাটোয়ারীবাবুর শরীরটা ভাল যাচ্ছে না বলে আজ রাতে থেকে গেলাম।

—তবে বসনা এখানে। বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। তুরও শরীরটা ঠাণ্ডা হবে। হামার ভি শরীর ঠাণ্ডা হবে।

আকাশে তেমনি নক্ষত্র জ্বলছে। দুটো পাশাপাশি নক্ষত্রের মত ওরা দুজনে পাশাপাশি বসে থাকল। দুঃখবাবু বললেন, তোর শরীর ভাল যাচ্ছে ত?

নেলী ভাবল, এতদিনে বাবু সময় পেল জানার শরীর ভাল যাচ্ছে কি মন্দ যাচ্ছে। নেলী হাসল। সে এতদিন দেখে এসেছে—বাবু রোজ ঘাটে এসেছেন, রোজ ঘাটোয়ারীবাবুর সাথে বসে গল্প করেছেন। অথচ চটানে নেমে একবারও বলেননি নেলী ঘরে আছিস নাকি? তোর শরীর শুনছি ভাল যাচ্ছে না! বাবু রোজ আসতেন ভয়ে ভয়ে, রোজ বের হয়ে যেতেন ভয়ে ভয়ে, অথচ একদিনও ডেকে বললেন না, আমি এসেছি। অথবা বললেন না, আমি যাচ্ছি। এই সব দেখে অনেকদিন নেলীর বলতে ইচ্ছে হয়েছে, বাবু হামি কাউকে বুলবে না তু হামার বাচ্চার মরদ আছিস। বুলবে না তু এক'রাতের মরদ হয়েছিলি হামার।

দুঃখবাবু নেলীর খুব ঘনিষ্ঠ হলেন। প্রকৃতই দুঃখবাবু এ ঘটনায় খুব অনুতপ্ত হয়েছেন। চটানে যত দেখেছেন নেলীকে, তত বেশী তিনি অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছেন। যত তিনি ভেবেছেন বাপ-মা মরা মেয়েটার প্রতি তিনি এমন লোভী না হলেই পারতেন। যত তিনি এই সব ঘটনা নিয়ে ভেবেছেন, তত তিনি মেয়েটার ভাল-মন্দের জন্য নিজেকে দায়ী করেছেন। দায়ী করতে গিয়ে

এক সময় দেখলেন ভালও বেসে ফেলেছেন। দুঃখবাবু বললেন, আমার খুব ইচ্ছা তোকে কিছু কিছু করে দি। কিন্তু কিছুই পেরে উঠছি না রে। কথাটা চটানে কতদিন বলব ভাবলাম, কিন্তু হয়ে উঠলো না। তোদের অন্য মরদেরা যদি কিছু ভাবে। তুই যখন মাচানে পড়ে থাকতিস, তখনও বারবার ইচ্ছে হয়েছে তোর কাছে যেতে, একটু বসতে, একটু ভালবাসতে—কিন্তু পারিনি।

এই সব কথা শুনে নেলী খুব খুশী হল। মা বসুন্ধরা এখনও তবে ওর জন্যে একটি মরদ রেখেছে যে নেলীকে ভালবাসে, যে নেলীকে পিয়ার করে। এই সব কথা শুনে নেলীর পুরনো ভালবাসাটা ফের মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে পুরনো ইচ্ছাটাও। নেলী দুঃখবাবুর মুখের সামনে মুখ নিয়ে বলল, বাবু তু হামারে পিয়ার করিস? এ বাত সাচ বাত বাবু?

—সাচ বাত নেলী। তোকে আমি পিয়ার করি। তোকে আমি ভালবাসি। আঁধার রাতে নতুনবাবু ভালবাসার জন্য মাতাল হয়ে উঠলেন।

—আমি তুকে ভালবাসি বাবু।

—নেলী।

—বুল বাবু।

—তোকে আমি কিছু দিতে পারছি না। ঘরে বৌ আছে, [illegible] প্র[illegible] আ[illegible] বাঁ[illegible]না। তোকে কিছু দিতে পারি না।

—সে জন্য কিছু ভাবিস না বাবু, হামি হামার বাচ্চার জন্য ঠিক সঞ্চয় করে লিচ্ছি।

তারপর ওরা দু-জন বসে আরও অনেক কথা বলল। পুরনো ইচ্ছাটা দুজনকেই মাঝে মাঝে বিব্রত করে মেরেছে। দুজনই পরস্পর ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছে। দুজনই দুজনকে সুখী করতে

চেয়েছিল—কিন্তু দুজনেই পারেনি। ওরা যেন শপথ করেছে মনে মনে সুখ-দুঃখের দুনিয়ায় ছল-চাতুরী থাকতে নেই।

ওরা দুজনেই শেষে উঠে দাঁড়াল। নেলী আগে আগে চটানে উঠে গেল। দুঃখবাবু একটু ঘুরে চটানে উঠলেন। ঘরে ঢুকে আলো জ্বাললেন। জানালাটা খুলে দিলেন। জানালায় দাঁড়িয়ে আঁধারেও নেলীর মুখটা দেখতে পেলেন। যেন আঁধারের গর্ভে নেলী ছুটেছে। উদ্দাম, উন্মত্ত হয়ে ছুটেছে। অথবা ঋতুমতী ঘোড়ার মত ছুটেছে। নেলী দুঃখবাবুকে দেখে যেন থামল। যেন বলল, পথ ছেড়ে দে। হামি ছুটবে।

দুঃখবাবু খুব শক্ত হাতে যেন ওকে ধরে রেখেছেন। যেন বলছেন এ ভাবে ছুটে তুই মরে যাবি। তোকে আমি মরতে দেব না। তোকে বাঁচতে হবে।

সে যেন বললে—কার জন্য বাঁচব বাবু?

—আমার জন্য। দুঃখবাবু জানালায় দাঁড়িয়ে আঁধারের গর্ভে এ সব দেখে চলেছেন।

তখন যেন দুঃখবাবু দেখলো নেলী ওর পায়ের নীচে পড়ে কাঁদছে। যেন বলছে, বাবু এ শরীরের বড় যন্ত্রণা। এ শরীরের দুঃখ কাউকে দিতে পারছি না বাবু। তু—যদি এ যন্ত্রণা দুহাত পেতে নিস!

জানালায় দাঁড়িয়ে দুঃখবাবুর মনে হল তিনি প্রকৃতই নেলীকে গভীরভাবে ভালবেসে ফেলেছেন। মনে হল তাঁর স্ত্রীর প্রতি যে গভীর ভালবাসা, নেলীর প্রতিও সেই গভীর ভালবাসা। তিনি জানালায় দাঁড়িয়ে আবেগে গলে গলে পড়ছেন। তিনি ভাবছেন—বাপ-মা মরা এই মেয়েটার সুখ-দুঃখকে অস্বীকার করলে ভগবানের পৃথিবীতে বেইমানি করা হয়। রাতের আঁধারে তিনি ভাবলেন, কালই বলবে নেলীকে—বাচ্চাটার বাপ হতে সে রাজী আছে। বলবেন, এ জন্যে আমার নসিবে যা আছে তাই থাকল নেলী, তবু তোর নসিবকে নষ্ট হতে দেব না। জানালায়

পাশে দাঁড়িয়ে দুঃখবাবু মনের অনুশোচনায় বড় কাতর হয়ে পড়লেন।

পরদিন ভোরে নেলী যথারীতি এল। দুঃখবাবুর ঘরদোর অনেক দিন পর পরিষ্কার করল। দুঃখবাবু কাঠ গোলায় কাঠ মেপে তখন ঘরে ফিরছিলেন। নেলীকে দেখে বললেন, তুই আমার ঘরে বোস। একটা কথা আছে।

দুঃখবাবু ঘাটোয়ারীবাবুর ঘরে ঢুকে বললেন, ইমতাজ আলী ষাঠ মণ কাঠ দিয়ে গেল। টাকাটা কি আজই মিটিয়ে দেবেন, না ওদের কাল আসতে বলব।

ঘাটোয়ারীবাবু চাদর ঠেলে উঠে বসলে ফের দুঃখবাবু প্রশ্ন করলেন, শরীরটা আজ কেমন আছে আপনার।

—ভাল আছি, বেশ আছি। কাল আদার কুঁচি, গরম জল খাওয়ায় বেশ কাজ দিয়েছে। একটু হেসে বললেন, ওদের বলে দিন টাকাটা কালই দেব। আপনি আজ এক ফাঁকে অফিস থেকে টাকাটা নিয়ে আসবেন। আপনার একটু অসুবিধে হবে বুঝতে পারছি।

—কি আর অসুবিধে হবে! আসবার সময় বাড়ি হয়ে আসতে পারব। ওদের একটু বাজার করে দিয়ে আসতে পারব। এই বলে দুঃখবাবু নিজের ঘরে গিয়ে দেখলেন নেলী তখনও কোনায় চুপ-চাপ বসে আছে। বাবুকে ঢুকতে দেখে সে উঠে দাঁড়াল। বলল, কি বলবি বাবু?

—বোস বলছি। দুঃখবাবু বলতে ইতস্তত করছেন। আঁধার রাতের পৃথিবীটা যেন এ পৃথিবী নয়। যেন এটা অন্য পৃথিবী। এই নিদারুণ পৃথিবীতে যেন আবেগধর্মীতার কোনো স্থান নেই। এই নিদারুণ পৃথিবীতে সমাজ আছে, সংসার আছে। বাপ হব বললেই হওয়া যায় না। ভালবাসব বললেই ভালবাসা যায় না। বরং তিনি যেন এখন সংসারের চোখে দেখছেন নেলীকে। নেলী কুৎসিত সকলকে একদিন বলে বেড়াবে এটা

দুঃখবাবুর বেটা আছে। অথবা এতদিনে বলে দিয়েছে। তিনি নেলীকে আরও কাছে এসে বসতে বললেন। তারপর নেলীর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললেন, লোককে কিছু বলেছিস ?

—কি বুলব বাবু ?

—লোকে তোকে বলে না বাচ্চাটা পেটে কি করে এল ?

—বুলে।

—তুই কি বল্লিস ?

—বুলি বাচ্চাটা ভগমান দিল। ও হামার ভগমান আছে।

দুঃখবাবু এবার কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললেন, আমার কথা বলিস—নি তো ?

—পাগল। তা হামি বুলি! কভি বুলবে না। বাবু হাম তেরে সাথ বেইমানি না করবে। লেকিন বাবু ওরা ত মরদ আছে। ওরা কি জানে না। ওরা কি টের পায় না বুলছিস ? লেকিন হামি কিছু বুলবে না বাবু। হামি বেইমানি করবে না। তু হামার ভগমান আছে, পেটে হামার ভগমান আছে।

দুঃখবাবু এবার বললেন, তাহলে তুই যা। এই কথা থাকল।

তখন গেরু নিজের ঘরে বসে হল্লা করছে। কৈলাশ মরে যাওয়ার পর থেকেই ওর ঘরে ফের অভাব ঢুকল। অভাবের জন্য সে কৈলাশকে ফরাসডাঙ্গায় টেনে নিয়ে গেছিল। সেখান পুঁতে কঙ্কালটা সংগ্রহ করেছিল এবং অল্প দামে বিক্রি করেছিল হিল্টন কোম্পানীর বড়বাবুর কাছে।

বড়বাবু ওকে শুধিয়েছিলেন, তোর নাম কি রে ?

—গেরু ডোম।

—বাপের নাম কি ?

—কৈলাশ ডোম।

—হ্যাঁরে তুই কৈলাশের ছা। কৈলাশ মরদ ছিল বটে।

—জী বাবু।

—কটা কঙ্কাল এনেছিস ?

—ছুটো।

—পুরুষ মানুষের না মেয়েমানুষের ?

—একটা পুরুষ মানুষের বাবু। একটা মেয়েমানুষের। একটা বাপের, অন্যটা ফরাসডাঙ্গায় পোঁতা।

বড়বাবু বিদ্রূপ করে বললেন, বল মায়ের। বাপেরটা দিয়েছিস, মায়েরটা দিতে ক্ষতি কি !

গেরু দাওয়ায় বসে হল্লা করছে। বলছিল, আসুক টিকায়ালা মাগীরা। ওয়াদের গঙ্গার পানিতে চুবিয়ে না লিচ্ছিতো হামার নাম গেরু লয়। ত্যাশে আর মড়ক লাইক। নেলী দেখল কৈলাশ মরতে না মরতে গেরু বাপের মত হয়ে উঠল। বাপের মত টেনে টেনে কথা বলছে। বাপের মত আফসোস করতে শিখেছে। শনিয়া পাশে বসে গেরুর গালমন্দ শুনছে। ঝাড়োর ঘরে বচসা হচ্ছে তখন। লখি, টুনুয়া, চাকু নিয়ে মারামারি করছে। লখির হাত থেকে এখন ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটছে। ঝাড়োর বৌ এবং ঝাড়ো মিলে ছুজনকে ছু ঘরে আটকে রাখল। নতুবা যেন তক্ষুনি চটানে একটা খুনোখুনি হত।

নেলী ভাত রাঁধছিল। ওদের হৈ-হল্লায়, নাচন-কোঁদনে সে সেখান থেকে নড়ল না। লখি, টুনুয়া তো চোর। ছিঃ চুরি করে পয়সা কামাচ্ছিস। মুখে তুদের পোকা পড়ুক। উনুনে পোড়া কাঠ গুঁজে দেবার সময় সে শুনল, গেরু বলছে, শালারা ঘড়ি চুরি করে লিছে। ঘড়ি চুরি করে আভি খুনোখুনি করছে, ভাগের পয়সা টুনুয়ার কম হল। মর শালারা খুনোখুনি করে।

শনিয়া বলল, ঘরে বসে ওদের গাল দিলি তুর চলবেক ?

—ক্যানে চলবেক না ?

—দু'টো দানা মুখে দিবি না ?

—কি করি বুল। নেলীকে যেন শুনিয়ে শুনিয়ে কথাগুলো বলল গেরু। গোমানী চাচার নোকরিটা ভি হামার জুটল না। ডাকদারবাবুকে ঘুষ দিয়ে নোকরিটা ছুখিয়া নিল। সেই কবে ফরাসডাঙ্গায়—তখন ফাগুন মাস,—একটা যাও ভি মিলল, তার দাম বড়বাবু ঠিক দিল না। বুলছে—এখন কি আর দাম আছে কঙ্কালের। কত আসছে, আমরা কিনতেই পারছি না ঠিক দাম দিয়ে। কঙ্কালের দাম কমছে তো কমছেই।

গেরুর রাগ এখন যেন সব শনিয়ার ওপর —শনিয়া তু দানা দানা করবি না। তু মরবি, হাম ভি মরে। গেরু দুটো হাত নাচিয়ে শনিয়াকে যেন এক্ষুনি গলা টিপে ধরবে এমন ভাব করল।

অভাব-অনটনে গেরু মাথা ঠিক রাখতে পারছে না। নেলী ঘরে বসে সব ধরতে পারল। নেলী ঘর থেকেই বলল, গেরু তু আয়। তুর বহু হামার ঘরে চারটো খাবে। তোরা আজ আমার মেহমান থাকলি।

কাটোয়া থেকে সেই লোকটা এসেছে। মংলীর ঘরে বসে দর-দস্তুর করছে ছেঁড়া তোষক-বালিশের। ঘরে বসে ওরা যেন কি সব সলা পরামর্শ করল। ছুখিয়া নেই। পুলিস এসে ওকে ডেকে নিয়ে গেছে। হরিতকীর ঘরে ওর মেয়েটা হাত-পা নেড়ে খেলছে। নেলী ভাত রান্না করতে করতে একবার পিসির ঘরে উঠে গেল। চঞ্চলাকে আদর করল। পিসি ঘরে নেই—নদীতে নাইতে গেছে। নেলী ভাবল, পিসিকেও আজ ওর ঘরে দুটো খেতে বলবে।

বিকেলের দিকে গুমট ভাব। আকাশের নীল রঙটা ক্রমশঃ কালো হচ্ছে। গরমে চটানের মেয়ে-মরদেরা হাঁসফাঁস করছে। নেলীর শরীরটা ক্রমশঃ মোটা হয়ে উঠেছিল বলে সে দুটো পা বিছিয়ে চালা ঘরটার মেঝেতে বসেছিল। আকাশ দেখছিল

মাঝে মাঝে। হয় বৃষ্টি হবে, নয় ঝড়। চালা ঘরটার উপরে তোষক-কাঁথা নেই বললেই হয়। ঝড় হলে যা আছে সব উড়ে যাবে, আর জল হলে ঘরে থাকা দায় হবে। বাইরে জল হওয়ার আগে ঘরে জল পড়বে। নেলী এই সব ভেবে ভেবে খুব মুষড়ে পড়ছিল। একবার গেরুকে ডাকলে হয়। বললে হয়, হামার চালে দুচারটা ছেঁড়া তোষক-কাঁথা ফেলে দে। দড়ি দিয়ে বেঁধে দে। লয়তো এ ঘরে থাকা হামার বড় দায় হবে।

কাটোয়া থেকে যে লোকটা এসেছিল, ঝড়-জলের আভাস পেয়ে চটানে থাকতে চাইল সে। লোকটা এখন চটানটা ঘুরে ফিরে দেখছে। দুখিয়া এলে বারান্দায় বসবে সে। দুজনে মিলে এক ছিলিম গাঁজা খাবে। চটান দেখার সময় সে আকাশও দেখল। খুব জল ঝড় হবে। আকাশ দেখার সময় সে এ কথা বলল।

গেরুও নেলীর,চালে বসে বলল, খুব জল ঝোড় হোয়ে লিবে। দে দেখি আর কি আছে। ঘরের সব কাঁথা-বালিশ দিয়ে লে। সব বিছিয়ে দি। রশি দে, পুরানো যা আছে সব দে, বেঁইধে দি।

নেলী শীতের সব কাঁথা-কাপড় টেনে বের করল ঘর থেকে। বাপের কাঁথা-কাপড়, ওর নিজের কাঁথা-কাপড়—সব কাঁথা-কাপড় বের করল। শীত আসতে আসতে আবার সব ঘাট থেকে জোগাড় করে নিতে পারবে। শনিয়া এবং নেলী দুজনে মিলে তোষক-কাঁথা সব উপরে তুলে দিল। গেরু চালার উপর বসে রশি দিয়ে বাতার সঙ্গে সব কাঁথা-কাপড় বেঁধে দিল।

গেরু চাঁল থেকে নামার আগেই ঝড় উঠেছে। উত্তর-পশ্চিম কোণের মেঘটা সারা আকাশে ছড়িয়ে পড়ল। গঙ্গার বালিয়াড়ি থেকে অজস্র বালির ঝড় উপরে উঠে আসছে। নেলী এই ঝড়ের ভেতরেই কয়েকটা পোড়া কাঠ ঘরে নিয়ে

ভুলল। শূয়োরের বাচ্চা দুটো এখন বড় হয়েছে। ওদের ডেকে সাড়া পেল না সে। কবুতরগুলো ঝড়ের ভিতর কোথায় হারিয়ে গেছে যেন। সে গঙ্গা-যমুনাকে ডাকল—কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামছে। বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটায় চটানের কঠিন মাটি ভিজতে থাকে। তারপর এক দুই করে আকাশ ভেঙে পড়ে। বৃষ্টির ধারা নেমেছে। বৃষ্টির জলে মা বসুন্ধরা ঠাণ্ডা হচ্ছে।

শরীরের গুমোট ভাবটা কাটাবার জন্য নেলী উঠোনের বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে ভিজল। মা বসুন্ধরার মত বৃষ্টির জলে সেও ঠাণ্ডা হচ্ছে। নেলী দেখল, বৃষ্টির ভেতর দু-একটা কাক উড়ে যাচ্ছে। দুটো শালিক বৃষ্টির জলে স্নান করছে। বিচিত্র সব শব্দ উঠছে আশেপাশে। ব্যাঙ ডাকছে। কচুর ঝোপে বৃষ্টি পড়ার টুপটাপ শব্দ। এই সব দেখে নেলীও ব্যাঙের মত বৃষ্টির জলে লাফাল, নাচল। আনন্দে ছুটে ছুটে বেড়ালো। পোড়া মাটিতে প্রথম বৃষ্টি পড়ার গন্ধ নেলীকে সব দুঃখ ভুলিয়ে দিল। সে চীৎকার করে উঠোন থেকে বলছে, শনিয়া গতরে পানি ঢেলে লে। পানিতে ভিজে পোড়া শরীর ঠাণ্ডা করে লে।

মংলী নিজের দাওয়ায় বসে বলল, মাগীর ঢং দেখ।

দুখিয়া এখনও ফেরেনি। কাটোয়ার লোকটা ঘরে বসে তখন মংলীকে ডাকছে। ভিতরে যেতে বলছে। মংলী যেন নেলীর জন্যেই ঘরের ভিতর গিয়ে বসতে পারছে না। উঠোনে দাঁড়িয়ে জলে ভিজছে আর মংলীর ইতর ইচ্ছার সাক্ষী থাকার চেষ্টা করছে।—ওলো মাগী তু মরবি—তু মরবি। তু ফুলে ফেঁপে মরবি। মংলী দাওয়ায় বসে যেন শাপ-শাপান্ত করল নেলীকে।

হরিতকী ঘর থেকে ডাকছে, নেলী তু আচ্ছা কাজ করে লিচ্ছিস না। দিনকাল বহুত খারাপ যাচ্ছে। জলে ভিজে তবিয়ৎ খারাপ হবে। ঘরে যা, ঘরে যা।

নেলীর তখন মনে পড়ল বাপের কথা। ওর ভগবানের কথা—ভগবান যে ওর পেটে। সে তাড়াতাড়ি ঘরে উঠে পড়ল। কাপড় ছাড়ল। শূয়োরের বাচ্চা দুটো জলে ভিজে ঘরে ঢুকছে। কবুতরের বাচ্চাগুলো টঙ-এর ভিতর এসে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। বৃষ্টি তেমনি জোর হচ্ছে। বেলা থাকতে চটানে রাত নেমে গেল। উঠোনের জল নালা নর্দমায় নামছে। ঘাটোয়ারী বাবুর জানালা বন্ধ। দুঃখ-বাবু চটানে নেই। নেলী কুপীটা ধরাল। কুপীব আলো দেখে শূয়োরের বাচ্চা দুটো ওর পাশে এসে বসল। নেলী আদর করল ওদের। গঙ্গা-যমুনা পাশে না থাকায় যে নিঃসঙ্গতাবোধ ছিল, ওরা পাশে এসে বসায় সে অভাব বোধটুকু কেটে গেল নেলীর। বাইরে জল পড়ার শব্দ হচ্ছে—টিপ টিপ—টুপ টাপ।

ভোর রাতের দিকেই আজকাল যা একটু ঘুম হয় ঘাটোয়ারী বাবুর। সারা রাত তিনি গরমে ছটফট করেন। শেষবাতের দিকে ঠাণ্ডা পড়লে সতরঞ্চটা পেতে শুয়ে পড়েন। এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘুমটা চলে আসে তখন। তারপর ভোরে ঘুমটা ভেঙ্গে গেলে তুড়ি দেন এবং হাই তোলেন। বলেন, পরম ব্রহ্ম নারায়ণ! তোমাবই ইচ্ছা ঠাকুর! এই সব বলে শরীরের সব জড়তা ভেঙ্গে উঠে পড়েন।

কাউণ্টারে একটা মুখ ভেসে উঠল। মুখটা উঁকি দিয়ে বলছে, একটু এদিকে আসবেন?

ঘাটোয়ারী বাবু সতরঞ্চতে বসে দুটো স্তোত্র পাঠ করলেন। কাউণ্টারের কথা তিনি ইচ্ছা করেই শুনলেন না। এখন তিনি স্তোত্র পাঠ করবেন। হাতমুখ ধোবেন। গঙ্গায় স্নান করবেন। এখন অনেক কাজ। তিঁনি জোরে জোরে মন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকলেন।

কাউণ্টার থেকে আবার গলাটা ভেসে এল।

তিনি যথারীতি দাঁড়ালেন—যথারীতি দড়ি থেকে গামছা টেনে দরজা খোলার সময় বললেন—একটু বসতে হবে। স্নানটা সেরে

আসি। মড়া নিয়ে যখন তখন এলেই ত চলবে না। ঘাটে গিয়ে বসুন। হন হন করে তিনি শিব মন্দিরের পথ ধরে গঙ্গায় নেমে গেলেন।

কাউণ্টারে সে লোকটা পায়চারী করতে থাকল। রাগে-দুঃখে তার ইচ্ছা হল ঘাটোয়ারীবাবুর গলা টিপে ধরতে। মৃত্যুর জন্য মানুষটার এতটুকু দুঃখ নেই। এতটুকু সহানুভূতি নেই। চামার যেন। লোকটা মৃত্যুর খবর শুনে একবার চমকাল না। একবার আহা পর্যন্ত করল না। মৃত্যুর জন্য কোনো দুঃখ নেই, মৃত্যুর জন্য যেন লোকটা হাঁ করে বসে থাকে। যেন এই মৃত্যুই স্বাভাবিক, বেঁচে থাকা অস্বাভাবিক। বেঁচে থাকার কোনো দাম নেই, শুধু দাম আছে জন্ম এবং মৃত্যুর। ভিতরের এই এত কাণ্ড সব যেন ওর কাছে জন্ম-মৃত্যুর বিকার। ওর মুখটা দেখে লোকটা পায়চারী করতে করতে এই সব ভাবল।

ঘাটোয়ারীবাবু নদীতে নামার সময় দেখলেন দশ বারো বছরের একটি হৃষ্ট-পুষ্ট ছেলেকে দুজন লোক কাঁধে করে ঘাটে নামাচ্ছে। বাপ পিছনে। তিনি বুক চাপড়ে কাঁদছেন। কাউণ্টারে তবে এই মড়ার লোকটাই ওকে এতক্ষণ জ্বালাচ্ছিল। ঘাটোয়ারী বাবু একবার দেখে আর দেখলেন না। অন্য লোকগুলো স্নান সেরে দূরে দাঁড়াল। তারা বলল—আহা কি সর্বনাশ! এই ধরনের সব দুঃখ প্রকাশ করল। ঘাটবাবু দাঁড়ালেন না। তিনি নেমে যাচ্ছেন। তিনি এই ধরনের কোনো দুঃখই প্রকাশ করলেন না। তিনি শুধু বললেন, হরিবোল। হরিবোল। যারা দুঃখ প্রকাশ করছিল তারা উপরে উঠেই বচসা আরম্ভ করে দিল। কে ছুঁয়ে কাকে অস্পৃশ্য করল সেই নিয়ে বচসা।

ঘাটোয়ারীবাবু ডুব দেবার আগে কানে আঙ্গুল দিলেন। গঙ্গার জলে শান্তি আছে কোথাও। সহস্র ডুব দিয়ে তিনি যেন তাই প্রত্যক্ষ করতে চাইছেন।

স্নান সেরে উঠে আসার সময় ঘাটবাবু দেখলেন লাঠি নিয়ে

হাঁটছে দুখিয়া। মংলী মনে মনে হিসাব কষছে—কত দাম হবে, কত বিক্রি হবে। মংলীর চোখ দুটো, দুখিয়ার লাঠি এবং চটানের মেয়ে-মরদের লোভী ইচ্ছাগুলো ঘাটোয়ারীবাবুর মনে বিরক্তির জন্ম দিচ্ছে।...দু দণ্ড সবুর কর। একটা ছোট মানুষ তোদের এই পৃথিবী থেকে চলে গেছে, পৃথিবীর হের-ফেরটাই জানতে পারেনি। সুখ-দুঃখের অর্থটাই ধরতে পারেনি—তার জন্য তোদের একটু কষ্ট হওয়া উচিত। একটু দূরে সরে দাঁড়া। ও ভাবে ঝুঁকে দাঁড়াস না মড়ার ওপর। তোদের চোখ লাগবে। তোদের নজর বড় খারাপ নজর।

নিজের এই চিন্তার জন্য তিনি আশ্চর্য হলেন। যত বয়স বাড়ছে তত পৃথিবীর জন্য দরদ বাড়ছে। তিনি নিজেকেই বললেন, ঘাটবাবু, তোমার অমন চিন্তা ভাল নয়। মৃত্যুই তোমার জীবনে বড় সত্য—তাকে অস্বীকার কোরনা।

অফিসঘরে ঢুকে তিনি কাপড় ছাড়লেন। ধূপ-ধুনো জ্বেলে টাঙ্গানো ছবিগুলোর সামনে ধরলেন। তারপর রেজেষ্ট্রি খাতায় কাঠের বাক্সে। তিনি ছবিগুলোর কাছে গিয়ে সকলকে এক, দুই করে প্রণাম করলেন। উপনিষদের দুটো পরিচিত শ্লোক উচ্চারণ করে সকলকে শুনালেন। লোকটা তখনও কাউণ্টারের ওপিঠে পায়চারী করছে। বিরক্ত হচ্ছে, ঘাটোয়ারীবাবুর বেয়াড়া কাজগুলো দেখছে। শুধু একবার কাউণ্টারে উঁকি দিয়ে বলছে কি হল আপনার?

—হবে, হবে। সময় হলে হয়ে যাবে। তখন আপনাকে বলতে হবে না। আর আমি ইচ্ছা করলেও দু দণ্ড দেরি করতে পারব না।

তিনি এ সময়ে দরজা, জানালা বন্ধ করে দিলেন। কাউণ্টারের ঝাঁপ ফেলে দিলেন এবং মহাভারতের আদি পর্ব থেকে পাঠ করতে থাকলেন: নারদ কহিলা তবে দেব নারায়ণে। অদিতি আছিল যত কুণ্ডল করনে॥ নরক আনিল বলে অদিতি কুণ্ডল।

লুটিয়া আমরাবতী অমরী সকল॥ পৃথিবীর পুত্র হয় নরক দুর্মতি। তারে না মারিলে যায় স্বর্গের বসতি॥

লোকটা কাউণ্টারের ওপাশ থেকে চীৎকার করে উঠল, অ মশাই! মহাভারতটা দয়া করে পরে পড়বেন। দয়া করে নাম ধাম লিখে অধমকে বিদায় করুন।

ভিতর থেকে কোনো জবাব এল না। অথবা কোনো শব্দ। রোদ বাড়ছে। রোদ ঘন হচ্ছে। ওরা মড়া আগলে ওর অপেক্ষায় বসে আছে। এখন শুধু ঘাটবাবু ছেড়ে দিলেই হয়। তারপর কাঠ নিয়ে যাওয়া আছে। চিতা সাজানো আছে। গঙ্গার জলে দেহটাকে শুদ্ধ করার কাজ আছে। অনেক বেলা হবে আগুন দিতে। সে এই সব ভেবে ফের ডাকল, অ মশাই!

কোনো জবাব নেই। কোনো শব্দ হচ্ছে না ভেতরে। ভেতর থেকে ধোঁয়াটে ভাব এবং গন্ধ। ···তিনি গঞ্জিকা সেবন করছেন তবে! ভারী বদ লোক ত দেখছি। লোকটা পায়চারী করতে করতে উত্তেজিত হয়ে উঠল।

তিনি ধোঁয়ার জগতে অনেকক্ষণ বসে জগতের অনিত্যতাকে উপলব্ধি করে কাউণ্টারের পাল্লা খুলে দিলেন। কি নাম, কোথায় থাকে, বয়স কত, হাসপাতালে মরল—ডেথ সার্টিফিকেট আছে কিনা, এ সব কথাগুলোও জিজ্ঞাসা করলেন।

এই সময় দুঃখবাবু এল। হরিতকী এল। লোকটা অফিস থেকে ঘাটে নেমে যাচ্ছে। কাঠ মাপছে ঝাড়ো। ডোমের মেয়ে-মরদেরা কাঠ নামাচ্ছে গঙ্গায়। কিছুদিন থেকে নেলী চিতা সাজানোর কাজটা পেয়েছে। নেলী চিতায় কাঠ সাজাবে। সেজন্য সে গঙ্গায় নেমে যাচ্ছে।

দুঃখবাবু হঠাৎ বললেন, বড় করুণ, বড় করুণ!

ঘাটবাবু জবাব দিলেন না। তিনি যেন কথাটার যথার্থ অর্থই ধরতে পারেননি এমন ভাব দেখালেন।

দুঃখবাবু হরিতকীকে উদ্দেশ করে বললেন, দেখলি হরিতকী লোকটার কি সর্ব্বনাশ! জলজ্যান্ত কাঁচা ছেলেটা গেল। আমাদের পাড়ার অরুণবাবুর ছেলে।

—আপনার ছেলেটা কত বড় হয়েছে দুঃখবাবু? ঘাটবাবু এতক্ষণে সব ধরতে পেরে প্রশ্ন করলেন নতুন বাবুকে।

—আর ছেলেপুলে! যমের ঘর নিয়ে সংসার মশাই। কখন যে কোনটা খসবে……! নতুন বাবুকে খুব বিষণ্ণ দেখাচ্ছে এখন।—ওরা আমার ছেলেপুলে নয়, সব ওঁর, সব ঈশ্বরের। বড়টার বয়স আশ্বিন এলে পাঁচ বছর পূর্ণ হবে।

—একদিন ছেলেটাকে নিয়ে আসুন না দেখি। বড় ইচ্ছা হয় দেখতে। কি বলব, আপনার সংসারের কথা শুনে আমার বড় আপসোস হয়। ইচ্ছা হয় নিজেও একটা সংসার করি। ঘর বাঁধি। ঘাটোয়ারীবাবু এইসব বলে কেমন লজ্জা পেলেন। তিনি আবার আগের কথায় এলেন। আমার কথা ওদের আপনি বলেছেন?

—বলিনি! কি যে বলেন, সব! বলেছি। আপনার কথা বলেছি, হরিতকীর কথা বলেছি। নেলী, গোমানী, কৈলাশ, গেরু—সকলের কথা বলেছি। ওরাতো লেগেই আছে এখানে আসবে বলে। আমি নিয়ে আসি না। মনটা আমার খুঁত খুঁত করে।

হরিতকী বিরক্ত করছিল তখন ঘাটবাবুকে—তুর জন্য কি রাঁধি বুলে দে। বেলাতো বাড়ছে। তুব সে খেয়াল আছে বাবু।

—যা হয় কিছু রেঁধে দে বাপু। এখন জ্বালাস নে। দেখছিস তো দুঃখবাবুর সঙ্গে গল্প করছি।

হরিতকী উঠে দাঁড়াল। একটা ঝাঁটা এনে ঘরটা ভাল করে পরিষ্কার করে দিল। তারপর আকাশের বেলা দেখতে বের হয়ে গেল।

দুঃখবাবুর সঙ্গে গল্প করে ঘাটোয়ারীবাবুর মনটা কোমল হয়ে উঠেছে। একটি ঘর, একটি সংসার, ছোট সুখ-দুঃখ,

ছোট ছোট কথার জন্য মনটা মাঝে মাঝে অবুঝ হয়ে ওঠে। তখন মনে হয় ঘাটের নিষ্ঠুরতা—ওঁর মন এবং হৃদয়ের উপর পাশবিক অত্যাচার চালাচ্ছে। তখন মনে হয় এ চটান ছেড়ে পৃথিবীর অন্য কোথাও গিয়ে বাঁচতে। ঘর বাঁধতে। ভাবতে ভাবতে আবার বলেন, একদিন নিয়ে আসুন না আপনার ছেলেকে, আপনার মেয়েকে। একটু আদর করি। আমি ওদের কোনো অনিষ্ট করব না। দুঃখবাবু, আমার আদর করার মত কেউ নেই। কথাগুলো বলে তিনি চোখ বুঁজলেন। একটি অনন্য সুখের ইচ্ছায় তিনি চোখ বুঁজে আছেন। চোখ খুললেই যেন সেই অনন্য সুখের ইচ্ছাটাকে চটানের নিষ্ঠুরতা গ্রাস করবে। চোখ বুঁজেই বললেন, কি আনবেন ত, কথা দিচ্ছেন ত? কথা বলছেন না কেন?

—নিশ্চয় আনব। নিশ্চয়।

—আপনার স্ত্রী আছে, বাবা মা আছেন, ভাবতে বড় ভাল লাগে। স্ত্রী স্বামীকে কত ভালবাসে তা জানার সৌভাগ্য আমার হয়নি। তবু বুড়ো বয়সে—বলতে লজ্জা কি—রসকলিকে দিয়ে সে স্বাদ এক কালে মেটাবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কথা কি জানেন, দুধের স্বাদ ঘোলে মেটে না মশাই, মেটে না। কোণো স্বাদ নেই। কোণো স্বাদ নেই। তিনি চোখ খুলেও যেন খুলতে পারছেন না। অনন্য সুখটা আর একটু থাক—এই তাঁর ইচ্ছা।

এক নতুন ইচ্ছায় ঘাটোয়ারীবাবু ডুবে যাচ্ছেন। জীবনের অনেকগুলো ক্ষুদ্র অনুভূতি অন্য এক মনোরম ধরিত্রীর অনুসন্ধানে ওঁকে উদগ্র করে তুলল। চোখ বুঁজেই তিনি সেই সুখকে ধরতে পারলেন। দুঃখবাবু যে ছোট ফুল দিয়ে সংসার সাজাচ্ছেন। হরিতকীর বাচ্চা হয়েছে। নেলীরও বাচ্চা হবে। ওরা ওদের ঘর নিয়ে বাঁচল। ওরা ওদের সুখ নিয়ে বাঁচল। শুধু এই ঘাটবাবু কড়ির হিসাবের মত মৃত্যুর হিসাব রাখছেন।

এই সব ভেবে ভেবে গভীর সমুদ্রে ডুবে গেলেন তিনি। শুধু আঁধার···আঁধার। জীবনের কোনো চিহ্ন দেখতে পাচ্ছেন না। তিনি চোখ বুঁজেই চেয়ারের হাতল দুটো জোরে চেপে ধরলেন। তিনি মৃত্যুর বীভৎসতায় শিউরে উঠলেন।

সহসা চোখ খুলে চেয়ারের হাতল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ইতস্তত কিছুক্ষণ পায়চারী করে দুঃখবাবুর মুখের উপর ঝুঁকে পড়লেন। বললেন, ভোরে যখন আসেন গিন্নি কিছু বলে না? বলে না, ঘাটের চাকরি ছেড়ে দাও? বলে না, অন্য চাকরি দেখ?

—ওসব বলে না, তবে বলে, তাড়াতাড়ি ফিরে এস। আমি ফিরে গেলে তবে ওর সব কাজ শেষ হবে। ফিরে গেলে নাইবার জল দেবে। সে জলে আমি স্নান করব। আমি খেতে বসব। ছেলে মেয়ে দুটো কোত্থেকে এসে জুটবে। যতই খাক, আমার সঙ্গে না খেলে ওদের পেট ভরবে না। ও আমাকে খাইয়ে দিয়ে দিবা নিদ্রার ব্যবস্থা করে তবে নিজে স্নান করবে। খাবে।

—খুব ভালো মেয়ে।

—হ্যাঁ, তুলনা হয় না।

—স্ত্রী, পুত্র, পরিবার নিয়ে তবে সুখেই আছেন।

—তা মোটামুটি আছি। সুখে-দুঃখে চলে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে টাকা-পয়সার জন্য খুব বিব্রত বোধ করি। অভাব অনটনের সংসার। বুঝতেই ত পাচ্ছেন।

—তা হলে বলছেন দুঃখও আছে।

—তা আছে।

তিনি বুঝলেন নিরবচ্ছিন্ন সুখ অথবা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ মানুষের থাকতে নেই। তিনি বুঝলেন এই সুখ দুঃখের জন্যই দুঃখবাবুর সংসার—সংসার হয়েছে। একটু দুঃখের জন্যই দুঃখবাবু এমন সুখের কথা বলতে পারছেন। এই সুখ-দুঃখ না থাকলে তিনিও যেন বলতেন, আর ভাল লাগে না মশাই, সংসারের উপর বীতরাগ হয়ে পড়েছি।

রোদের তাপ বাড়ছে। বেলা বাড়ছে। শ্মশানের আগুনটা দাউ দাউ করে জ্বলছে। ওরা দুজনেই আগুনটা দেখে চুপ করে থাকলেন কিছুক্ষণ। রোদের উত্তাপে আগুনটা খুব নিস্প্রভ মনে হচ্ছে। ঘাট থেকে উঠে আসছে নেলী। ওর কাজ হয়ে গেল বলে উঠে এল। কিন্তু ওরা দেখল, একটি ডোমের মেয়ে ওকে উঠে আসতে সাহায্য করছে। হরিতকী ছুটে চটান থেকে নামল। শনিয়া সকলকে বলছে চটানের—নেলীর বাচ্চা হবে।

দুঃখবাবু জানালায় দাঁড়ালেন। তিনি জানালা থেকে শনিয়ার কথা শুনতে পাচ্ছেন। তিনি আড়াল থেকে নেলীকে উঠে আসতে দেখছেন। নেলীর দীর্ঘ শরীরটা ব্যথায়, বেদনায় নুয়ে পড়েছে। চুলগুলো কপালে, মুখে ছড়িয়ে আছে। হরিতকী নেলীকে দাঁড় করিয়ে খোঁপা বেঁধে দিল। হরিতকী কপাল থেকে চুলগুলোকে সরিয়ে দিল, নেলীর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে। চোখ দুটো কোমল, সাদা-সাদা, ধীর। ওর চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে। শরীরের অসহ্য যন্ত্রণা ওকে সুখ এবং দুঃখ দুই-ই দিচ্ছে যেন। জানালার কাছে এসে নেলী চোখ তুলে দুঃখবাবুকে দেখল। চোখ নামাল। নেলী যেন বলছে, হামার ভগমান আসছে বাবু। হামি হামার মাচানে ভগমানকে নামাতে যাচ্ছি।

বড় করুণ! বড় করুণ! দুঃখবাবু জানালায় মুখ রেখে ফের উচ্চারণ করলেন। জানালা থেকেই দেখতে পাচ্ছেন—অরুণবাবু এই রোদের উত্তাপে বসে নিজের বাচ্চাটাকে ভস্ম হতে দেখছেন। তিনি তার একমাত্র পুত্রকে আগুনের জঠরে ঠেলে দিলেন। শ্মশানের শেষ ধোঁয়ার সিঁড়ি উপরে উঠে যাচ্ছে। ওর একমাত্র আত্মা স্বর্গের সিঁড়ি তৈরী করছে। নেলী এই পথ ধরে উঠে গেল। সে তার ভগবানকে মাচানে নামাতে যাচ্ছে। দুটো মোষ নেমে গেল গঙ্গায়। ওরা লড়াই করতে নেমে গেল। একটা লোক নানা-রকমের খেলনা শরীরে ঝুলিয়ে বিক্রির আশায় উঠে যাচ্ছে। সে শিব মন্দিরের পথ থেকেই নাচতে আরম্ভ করল, বলতে আরম্ভ

করল, লে যানা বাবু সাড়ে ছআনা। দেখে শুনে মন দেওয়ানা। আহা মন দেওয়ানা। দেওয়ানা ॥

চটানে নেলীর গোঙানী। গোঙানী থামছে না। অহরহ সেই আওয়াজ দুঃখবাবুকে বিব্রত করছে। নেলীর বুঝি খুব কষ্ট! জানালায় দাঁড়িয়ে নেলীর কষ্ট তিনি বুঝি ধরতে পারছেন। এখন এই জানালায় দাঁড়াতে ইচ্ছা হচ্ছে না। চটানে নামার ইচ্ছা। নেলীর মাচানে বসার ইচ্ছা। একটু আদর করার ইচ্ছা। কিংবা তিনি যেন ওকে সাহস দিতে চাইছেন। কিন্তু দুঃখবাবু নড়তে পারছেন না। নেলী মাচানে পড়ে পড়ে কাঁদছে—আর তিনি নড়তে পারছেন না।

হরিতকী জল গরম করছে ঘরে।

মংলী নিজের ঘরে বসে শাপ-শাপান্ত করছে। চটানে এত বিটির পেটে বাচ্ছা আসছে, ওর পেট কেবল খালিই যাচ্ছে। দুখিয়ার সঙ্গে ঘর করতে এসে কত বছর ঘুরে গেল। চটানে কত লোক এল গেল। অথচ ওর পেটে একটা বাচ্ছা এল না। চোখ খাগী ডাক ঠাকুর। নিজের গতরটা দেখল—নিজেকে, দুখিয়াকে শেষে চটানের সকল মেয়ে মরদকে শাপ-শাপান্ত করল।

দুঃখবাবু জানালায় দাঁড়িয়ে এ সবও শুনলেন।

জল গরম করে হরিতকী নেলীর ঘরে ঢুকল।

একটা শুকনো কাঠের গুঁড়ি গেরু এবং শনিয়া দুজনে মিলে ঘরের ভিতর ঠেলে দিয়ে গেল।

নেলী মাচানে এ-পাশ ও-পাশ হচ্ছে। উঠছে-বসছে, গাভীন গরুর মতো হামলাচ্ছে। মুখ, শরীর শক্ত করে দিচ্ছে।

হরিতকী বুঝল খুব কষ্ট হচ্ছে নেলীর। বাচ্চাটা হতে কষ্ট দিচ্ছে নেলীকে। হরিতকী সহ্য করতে না পেরে বাইরে এসে দাঁড়াল। গেরুকে ডেকে বলল, তুর বাপতো দানরী ফানরী করত। খুঁজে দেখ না দুচারঠো চিজ মিলে কি না! তুর বাপতো পোয়াতির বাচ্চা আনতে জেরা সময় লিত। খুঁজে দেখনা ময়রুন বিবির ফল তুর ঘরে

আছে কি না। নেলী বহুত কষ্ট পেয়ে লিচ্ছে। পেলে ওয়াকে ডুবায়ে দিতাম পানিতে। পানি খাইয়ে দিলে ও-মেয়েটা আসান পেত।

চটানে দাঁড়িয়ে গেরু হঠাৎ বাপের হেকিমী জীবনটার কথা মনে করতে পারল। মনে হল ওর—এইত সময়। কঙ্কালের দাম কমে যাচ্ছে। মড়ক আর লাগছে না। হিল্টন কোম্পানীর বড় বাবু কঙ্কাল কিনছেন না। এই ঠিক সময় বাপের ব্যবসাটা জোড়া-তালি দিয়ে ফের আরম্ভ করে দেওয়া যায়। সে তাড়াতাড়ি বাপের মাচানের নীচে ঢুকে গেল। হাতড়ে হাতড়ে ছোট বড় অনেক মেটে কলসী, হাঁড়ি বের করল। বেড়ার পাশ থেকে বেতের ঝুড়িটা টেনে বের করল। ঝুড়িটা ইঁদুরে খেয়েছে। উই পোকারা কেটেছে। মাকড়সার জাল ঝুল কালিতে ভরে আছে। সে ঝুড়িটা তুলে বাইরে নিয়ে এল।

এখনও ঢুটো একটা প্রায় সব রকমের গাছ-গাছড়াই আছে যেন। হেমতাল কাঠ আছে, নরসিং ঝাঁপ, ঢুর্গা ঝাঁপ আছে। বন রুই মাছের ছাল আছে। শ্বেত শিমুলের ছাল, গোঁড়ের ছাল আছে ঢুটো। নীল বানরের মাথা আছে। গেরু তন্ন তন্ন করে খুঁজছে। আছে, আছে, সব যেন আছে। সে নীচে ময়রুন বিবির ফুল পেয়ে চীৎকার করে ডাকল, পিসি আছে রে আছে। পেয়ে লিছিরে ময়রুন বিবিরে। দে দে জল দিয়ে খাইয়ে দে। ওরে শনিয়া, জলদি পানি লিয়ে আয়। ময়রুন বিবিরে ডুবায়ে দে। পানিটা খাইয়ে দে পোয়াতিরে, বাচ্চা হতে জেরা সময় লেবে। ঠিক বাপের মত গেরু সুর করে কথাগুলো বলতে থাকল।

পরদিন ভোরবেলায় গেরু দাওয়ায় একটা চাদর বিছিয়ে সব গাছ-গাছালিগুলো রাখল। ফুঁ দিয়ে ধুলো সাফ করল। সরু একটা কঞ্চি কেটে, বাপের মত কঞ্চিটা হাতে নিয়ে চাদরের চারপাশে

ঘুরতে থাকল। গেরু চাদরটার চারপাশে নাচল কুঁদল। লাফাল। বাপের মত ঘুরে ফিরে নেচে-কুঁদে রসল্লা দিচ্ছে। যেন কোনো ভুল না হয়। যেন আনাড়ী বলে লোকে ধরতে না পারে। সে ঘুরে ঘুরে বাপের কথাগুলো মুখস্থ করল। কোর্ট-কাছারীতে হেকেমী করার সময় বাপ যেমন চেঁচাত, সেও তেমনি চেঁচাতে থাকল। এ পুন্ন-পদের মাতুলী। এ ঝাড়ফুঁক লয়, এ যাদু মন্তর লয়, এ আছে জড়ি-বুটির কারবার—দব্য গুণ। ডান পুকুসে টান মারে, তোষক করে, পীর-পরীতে নজর দেয়, বাণ মারে, এ মাতুলি দেহে লিলে আসান পাবে দেহ। বহুত সামান্য দাম আছে লিয়ে যান। বিবি বুঢ্‌ঢার লাগি লিয়ে যান। গেরু বাপের মতই সুর করে কথা বলল।

শনিয়া বলল, এবেনে এটা কি হচ্ছে?

গেরু বিরক্ত হয়ে বলল, এবেনে এটা কাম হচ্ছে। এবেনে তু কাজিয়া না করবি। খাওয়ান খাওয়ান মাত করবি। হামি হাড়-গোড়ের ব্যবসা করবে না। হ্যাকিমী ব্যবসা করবে। তু চারঠো গাছ-গাছালি যোগাড় করে লিলেই হবে। তু থাম।

শনিয়া গেরুর চোখ দুটো দেখে ভয় পেল। সে কিছু বলল না। চুপ চাপ দরজার পাশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। গেরুর লাফ-ঝাঁপ দেখল, এবং ফিক করে হেসে দিল এক সময়। গেরু এখন অজগর সাপের মত হয়ে যাচ্ছে। সে বলছে—ডিহিবড়া সাপের চোয়াল গা। গেরু ডিহিবড়া সাপের মত মুখ করে হাই তুলছে। শনিয়া ওর হাই তোলা মুখের ঢং দেখেই হাসল।

গেরু রুখে উঠল, তু হাসলি কেনে?

—হামি হাসলাম কুথি আবার?

—তু হাসলি না, ফিক করে হাসলি না তু?

—তু অমন করছিস ক্যানে? মুখটাকে সাপের মত করে হাই তুলছিস।

—হাই তুলবো না। সাপের কথা তুললে সাপের মত হতে হয়। বানরের কথা তুললে বানরের মত হতে হয়।

তবে দানরী-ফানরী হবে। কাজ কারবার হবে। এটা তামাসা ভেবে লিস না শনিয়া। এ বহুত তন্তর-মন্তরের কারবার আছে। তু মত হাসবি। ঠিক এখানটাতে বসেই বাপ হামাকে গাছ-গাছালির নাম শেখাত। বাপ বুলত। শিখে লে বেটা। এ কাম করে খেতে পারলে চটানে ভুখা থাকতে হোবে না। শনিয়ার দিকে মুখ তুলে ফের বলল, তু—হাসবি না।

—হাসব না।

গেরু বাপের মত রসল্লা দিতে লাগল আবার। সে ঘুরে ঘুরে লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে। যেখানে যেমন সে বলছে, সেখানে সে তেমনটি হওয়ার চেষ্টা করছে। বাঘের কথা বলছে বলে বাঘের কত হাঁটছে। সে বলছে—সুন্দরবইনা বাঘ। বাবুরা বলেন রুয়েল বেঙ্গল টাইগর। নীল বানরের মাথা, বন মানুষের হাড়, কুল কুহলীর গাছ। মরদ রাঙ্গের মূলে ছ দফের রেণু মিলে কবচ দিলে নাম তার মহাশক্তি কবচ বাণ। গুণ বহুত পেকারের। যে আদমী বিছানা খারাপ করে, আস্বপ্ন-কুস্বপ্ন দেখে, যার বাদী দুশমন শত্রু আছে—বাণ মারে, বন্ধ করে—তার লাগি এই কবচ বাণ। বড় সামান্য দাম আছে। —মাত্তর স পাঁচ আনা। খুব বেশী দাম লয়। ঘাটে পথে দোকানে দুশমনে কত পয়সা যায়—মাত্তর স পাঁচ আনা। এক-সঙ্গে এতগুলো কথা বলে এবং লাফালাফি ক'রে গেরু অবসন্ন হয়ে পড়ল যেন। সে বসল কালো চাদরটার পাশে। তারপর শনিয়ার দিকে চেয়ে বলল, কেমন শুনলি বুল?

—বহুত আচ্ছা।

—তুর একটা মাদলি কিনতে শখ গেল না?

—জরুর শখ গেল।

—ও হামি আচ্ছা বলিয়ে লিচ্ছি। পয়সা, পয়সা, কত পয়সা হবেক দেখবি।

একদিন, দুদিন, তিনদিন রসল্লা দিল গেরু। তিনদিনই

দরজায় দাঁড়িয়ে শনিয়া দেখল সব। তিন দিনই সাকরেদের মত গেরুকে সাহায্য করেছে। গাছ-গাছলি বিছিয়েছে। গাছ গাছালি চাদর থেকে তুলে ঘরে রেখেছে। তিনদিনই মনে হয়েছে—গেরু অন্য মানুষ। গেরু দানরী হয়ে গেছে কিংবা হ্যাকিমদার।

পরদিন ভোরে মাথায় কাঠের বাক্স নিয়ে হাতে হ্যারিকেন নিয়ে চটান থেকে নেমে গেল গেরু। শিব মন্দিরের পথ ধরে সে সহরের রাস্তায় পড়ল। রাস্তায় প্রচণ্ড ভিড়। সে লোক ঠেলে যেতে লাগল। কোর্ট কাছারী করতে যাচ্ছে। সুতরাং বাপের কথাগুলো আওড়াচ্ছে মনে মনে। সে রাস্তার এক পাশ ধরে হাঁটে। মোটর রিক্সা বাঁচিয়ে হাঁটে। একদিন, দুদিন এবং অনেকদিন হাঁটল। কোর্ট কাছারীতে বসল। অনেকদিন। বাপের মত জোর গলায় কথা বলেছে অনেকদিন। বাপের মত অশ্বত্থ গাছের নীচে দাঁড়িয়ে চাদরের উপর জড়ি-বুটি বিছিয়ে নেচেছে, কুঁদেছে। অথচ বিক্রি ভাল হয়নি। এত করেও বাপের মত বিক্রি তুলতে পারছে না, মাদুলি বিক্রি হয়েছে, কিন্তু কোনো কাজে আসেনি। মামলা-মোকদ্দমায় হেরে গিয়ে ওকে এসে ধরেছে। বলেছে জুয়াচোর। ভিন্ন ভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গালমন্দ দিয়েছে। ওব তখন ভয়ানক আপসোস। কারণ হাড় বাদে সব তাবিজ-ওবিজ বে-ফয়দা। সে নিজেই যেন নিজের নসিবকে ঠকাচ্ছে। রাহু চণ্ডালের হাড় না হলে গাছ-গাছালির দ্রব্যগুণ ফাঁকা মাঠে ঘোড়দৌড়ের মত। সবই হবে–শুধু কাজ দেবে না। শুধু গাল-মন্দ জুটবে। সে এখন যেন মনে মনে বাপকে খুঁজছে। ডোমন সাকে খুঁজছে। মনে মনে বাপের কথা আওড়াচ্ছে। হ্যাকিমী বলিস, দানরী বলিস, এ চীজ বেইমান মানুষের দু-শ দশদফে কাজে লাগে। আউর শালা শুমে লে, রাহু চণ্ডালের হাড় লাগে, তুরা যাকে বলিস জীয়ন হাড় কিংবা বেহ্মা চণ্ডালের হাড়। দানরী-ফানরীতে হাড়টাই সব।

নেলীর বাচ্চা এতদিনে হামাগুড়ি দিচ্ছে চটানে। হাঁটছে। হাঁটতে হাঁটতে পড়ে যাচ্ছে। অঃ...অঃ...করে কথা বলছে। কাক তাড়াচ্ছে। মাছি, ব্যাঙ তাড়াচ্ছে। হেঁটে হেঁটে ঘাটোয়ারী বাবুর ঘরে চলে যাচ্ছে। ঘাটোয়ারীবাবুর পায়ের কাছে বসে সারাদিন খেলছে। ঘাটোয়ারীবাবুও কথা বলছেন ওর সঙ্গে। ঘাটোয়ারীবাবুও অঃ...অঃ...করছেন। হাত নেড়ে, চোখ বড় করে, পু...পু...করে বলছেন, খেলছেন সারাদিন। তিনি এখন বাচ্চাটাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। বাচ্চাটাকে নিয়ে মন্দ কাটছে না।

গঙ্গা যমুনা নেলীর সঙ্গে এখন যাচ্ছে না। ওরা চটানে বাচ্চাটার পাহারায় থাকছে।

অশ্বত্থ গাছের শেষ পাতাটা থেকে যখন সূর্যের রঙ সরে যায়, গেরু ওর পুঁটুলি বেঁধে কাঠের বাক্স মাথায় নিয়ে পাশের দোকানীকে বলে, দাও ত দেখি, এবার তবে উঠতে পারি।

দোকানী এক পয়সার একটা বিস্কুট দিল। গেরু বিস্কুটটা এক টুকরো কাগজে মুড়ে সযত্নে পকেটে রাখে, তারপর হ্যারিকেন জ্বালিয়ে সহর ধরে গঙ্গায় নেমে গেল। চটানটা দেখলেই নেলীর বাচ্চার কথা মনে হয়। বাচ্চার জন্য মায়া হয়। বাচ্চাটাকে একটা বিস্কুট খাওয়াতে পারলে খুসী হয় সে। চটানে উঠে গেরু ডাকল, চাচা হামার কাঁহারে? চাচা।

নেলী যেদিন সকাল সকাল গাওয়াল করে ফেরে সেদিন বাচ্চাটা ওর কোল থেকেই অঃ..অঃ...করে উঠবে। দুহাত নাড়বে। কল কল করে উঠবে। যেদিন ফিরবে না, সেদিন হয় দুঃখ বাবুর ঘরে, নয় ঘাটোয়ারীবাবুর ঘরে থাকবে। গেরুর গলার আওয়াজ পেলেই জানালা দিয়ে উঁকি দেবে। শব্দ পেয়ে গেরু জানালায় দাঁড়াবে। আলোটা তুলে ধরে বলবে, চাচা খা লে।

তখন ঘাটোয়ারীবাবু চেয়ারে বসে চোখ বুঁজে থাকেন। চোখ বুঁজেই বলেন, গেরু এলি?

—হে বাবু, এলাম।

১৪

—ব্যবসা তোর চলছে কেমন ?

—আচ্ছা না বাবু। আচ্ছা না চলছে। তারপর ধীরে ধীরে গেরু জানালা থেকে মুখটা নামিয়ে নেয়। ব্যবসা জমে উঠছে না। মন ভারী হয়ে উঠেছে দিন দিন। দিন দিন কেবল বাপকে মনে পড়ছে আর, রাহু চণ্ডালের হাড়ের কথা ভাবছে সে। এ সব ভেবে চটানে উঠে যেতে থাকে। এ সময় শনিয়া আসে। গেরুর মাথা থেকে কাঠের বাক্স নামাতে সাহায্য করে। হাত-মুখ ধোয়ার জল রাখে দাওয়ায়। ঘরে ঢুকে মাচানে বসে গেরু বলে, রাহু চণ্ডালের হাড় না হলে আর চলছে না বৌ। বাদী-বিবাদীরা রোজ বচসা করছে। মাতুলি কেউ লিচ্ছে না। সবাই বলছে হামি ধোঁকা দিয়ে পয়সা লিচ্ছি।

—তু খেয়ে লে ত। যা হবেক পরে হবে।

খেতে খেতে গেরু বলল, নেলী ফেরেনি ?

—না।

—নেলীর ব্যবসাও আচ্ছা যাচ্ছে না বুল।

—হামি কি'করে বলবে ?

শনিয়া একটু পচাই ঢেলে বলল, লে, খা লে। শনিয়া জানে এই পচাইটুকুর বিনিময়ে গেরু চটানের সব দুঃখের কথা ভুলে যাবে। তখন ওর মনে হবে দুনিয়ায় বেঁচে সুখ আছে। দুনিয়াকে ছেড়ে যেতে খুব কষ্ট।

সব পচাইটুকু শেষ করে গেরু ঝিম মেরে বসে রইল। শনিয়া ওর হাত মুখ ধুয়ে দিয়ে মাচানে তুলে দিল। গেরু মাচানে বসে ঝিমোয়। চার্চের ঘড়িতে তখন কে ঘণ্টা পেটাচ্ছে। তখন নেলী নিজের ঘরে বসে আদর করছে বাচ্চাটাকে। ঘাটোয়ারীবাবু সুর করে মহাভারত পড়ছেন। কেউ বচসা করছে ঝাড়োর সঙ্গে। ওদের উনুনে আজ হাঁড়ি চড়েনি। বচসাতে সে সব ধরতে পারছে। দু' চারদিন পরে এ ঘরেও হাঁড়ি চড়বে না। বিক্রি এখনই কমেছে। নেই বললেই চলে।

ছুটো পেটের দায় ওকে পীড়িত করতে থাকল। হাড় সংগ্রহের জন্ম মন ভিন্ন ভিন্ন চিন্তায় ডুবে যেতে থাকে। গেরু নিষ্ঠুর হতে চাইছে, বীভৎস হতে চাইছে। সে বাপকে মনে করতে পারছে। রসিদের দরগা, কালীর থান এবং অনেক সব বীভৎস গল্প যা বাপের কাছে শুনেছে—সব মনে করতে পারছে। গেরু একটা মদের ঢেকুর তুলল। পাশের ঘরে এখনও পু · পু করছে...বাচ্চাটা। ওর লোভ বাড়ছে। গেরু নিষ্ঠুর হতে চাইল। বীভৎস হতে চাইল। বাচ্চাটা কখন ঘুমোবে। নেলী কখন ঘুমোবে। গঙ্গা যমুনা কখন নদীর ঢালুতে নামবে। কখন নেমে যায়? কখন ঘাটোয়ারী বাবু জেগে থাকবেন না—কখন, কখন এমন সব ঘটবে। সে মাচানে বসে অধীর হয়ে উঠল। সে নিষ্ঠুর হতে চাইল। বীভৎস হতে চাইল। নেলীর বাচ্চাটাকে সে রাতের আঁধারে চুরি করে খুন করতে চাইল। খুন করে হাড় সংগ্রহের ইচ্ছা।

ভোর হলে রাতের ভাবনাটা আর থাকে না। শরীরটা হাল্কা লাগে। মন মেজাজ ছুই-ই তখন প্রসন্ন। তখন মনে হয় কি দরকার নতুন ভাবে বেঁচে। বরং ফের ফরাসডাঙ্গায় যাবে অথবা ঝুমঝুমখালিতে—কঙ্কাল খুঁজে খুঁজে বেড়াবে। ছুটো পেটের দায় একটা খুনখারাপির দিকে টেনে নিয়ে যাবে? মনে মনে সে তা চাইল না।

সে ভোরে উঠল। গামছাটা কাঁধে ফেললে। বাবুচাঁদ শূয়োর নিয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে। এখন ভরা গাঙ। চটান থেকে বর্ষার জলে নৌকা দেখা যাচ্ছে। পাল দেখা যাচ্ছে। মাস্তুলের ডগায় ছু-একটা পাখী বসে আছে। সূর্যের গাঢ় রঙ নদীতে। শ্মশানটা চটানের খুব কাছাকাছি এখন। এ ভোরে এই সব দেখে বাচ্চাটাকে দেখার ইচ্ছা গেরুর প্রকট হয়ে উঠল। সে বাইরে থেকে ডাকে, চাচা ঘুম থেকে উঠলি? ভিতরে ঢুকে গেল সে। বাচ্চাটা নেলীর পাশে বসে খেলছে। নেলী ঘুমোচ্ছে। গেরুকে দেখেই কোলে ওঠার জন্য ছু হাত বাড়িয়ে দিলে।

গেরু তখন কথা বলছে, ভয় দেখাচ্ছে কোলে নেবে না। রাগে দুঃখে অভিমানে নেলীর চুল ধরে টানে বাচ্চটা। নেলী ঘুমের ভিতরই বলল, বাপ, তু হামারে জ্বালাসনে। থোড়া ঘুম যেতে দে। এই ঘুমের ভিতর নেলী যেন কত বছর আগে চলে গেছে। গেরু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। ভারী মজা পায়।...... শনিয়া যদি এমন একটা বাচ্চা দে লিত চটানে।

গেরু বলল, চল হারুয়া, গঙ্গার ধারে চল। নেলীর দিকে চেয়ে বলল, হামি হারুয়াকে লিলামরে নেলী।

আজ গেরু কোর্ট-কাছারী করতে গেল না। যা আছে তাতে ওরা দু-পাঁচ দিন খেতে পারবে। কাছারীতে গেলেই এখন শমনের মত লোকগুলো ওর চারপাশে জড় হতে থাকে। অপমান করার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। গেরু দুটো কথা বলতে উঠলেই ওরা বলে ধোঁকা বাজ। গেরু বাপেব মত কসরত দেখিয়ে যখন সমস্ত জনতাকে বশ করে আনে তখন হয়ত একটি মাত্র লোক বলে ওঠে, এ সব মাদুলি-ফাদুলিতে কোনো কাজ হয় না। সোয়াঁ পাঁচ আনা পয়সাই জলে। গেরু তবু থামে না। লোকটার কথা পরোয়া করছে না। এমনি ভাব ওর চোখে-মুখে। সে নাচে, লাফায়। সে বলে, বিশ্বাসে আশ্বাস বাবু। দশজনের কথায় কান দেবেন না। নিজের শরীরে ধারণ করে লেন। পরখ করেন। বিশ্বাসে আশ্বাস বাবু। বিশ্বাসে আশ্বাস।

কিন্তু ঐ একটি মাত্র লোকই ওর ব্যবসায় ক্ষতির পক্ষে যথেষ্ট। লোকগুলো ওর নাচন-কোঁদন দেখে মাত্র। তামাসা দেখে মাত্র। নাচন-কোঁদন থেমে গেলেই ওরা ধীরে ধীরে সরে পড়ে। মনে হয় এতক্ষণ ওরা ওর কেরামতি দেখার জন্যই দাঁড়িয়ে ছিল। সে বিরক্ত হয়ে বলে, শালাবা! একটা জীয়ন হাড় লাইরে! তবে তুগো সমঝে দিতে পারতাম হ্যাকিমী-দানরী বুলে কাকে।

গেরু গঙ্গার ধারে হারুকে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে এমনি সব কথা ভাবে।

বর্ষার গঙ্গা বলে সে নীচে নামতে পারল না। এক মাল্লা, দু মাল্লা—সব নৌকাগুলো ঘাটে ঘাটে ভিড়ছে। ফজলি আমের নৌকা। কাঁঠালের নৌকা। গেরু হারুকে নিয়ে নৌকার আশে পাশে ঘুরে বেড়ায়। আম কাঁঠালের গন্ধ নাকে আসে। দুটো একটা পাখী ওড়ে নদীর জলে। ওদের ছায়া পড়ে না। জল ঘোলা। জলে ঘূর্ণি। ঘূর্ণিতে একটা গোবরে পোকা ডুবছে। পোকাটাকে ডুবতে দেখে গেরুর কেমন কষ্ট হতে থাকে।

হারুর দিকে চেয়ে বললে গেরু, কিরে সাঁতার দিয়ে লিবি? তুর মায়ী ত সসাঁতরে গঙ্গা পার হত।

হারু দুটো হাত একসঙ্গে করে নাড়তে লাগল। পু···পু···করতে থাকল। যেন গেরুর কথা সে কত বুঝতে পেরেছে।

গেরু খুশী হয়ে হারুকে দু হাতের উপর নাচাল। মাথার উপর ঘোরাল। তারপর গালটা গালে ঘষে দিয়ে খুব জোরে দু'টো চুমু খেল। —আঃ। অদ্ভুত সে একটি শব্দ তুলল গলায়।

জল নামছে নীচে। ঘূর্ণি উঠছে। ঘোলা জল। অন্যপারে একটা ধস পড়ার শব্দ হয়। গেরু দেখে ধসটা একটা অতিকায় কচ্ছপের মত যেন নদীর গর্ভে নেমে গেল। হারু ওর কোলে। হারু নীচে নামতে চাইছে। নীচে নেমে দুষ্টুমি করতে চাইছে। গেরু ওকে দুষ্টুমি করার সুযোগ দেওয়ার জন্যই যেন নীচে নামিয়ে দিল। হারু তখন হামাগুড়ি দিচ্ছে, হারু তখন ছুটছে। গেরু যত ওকে ধরার জন্য ছুটছে, সেও তত ছুটছে এবং হামাগুড়ি দিচ্ছে ও হেসে গড়িয়ে পড়ছে। গেরু অনেক্ষণ ওর সঙ্গে ছুটাছুটি করল। অনেকক্ষণ হাসল। অনেকক্ষণ ওরা দুজনে নদীর পারে, নদীর হাওয়ায়, নদীর জলে পুলকিত হল। তারপর একসময় ওরা নদীর পারে চুপচাপ বসে থাকে। নদীর জল দেখে, ঘূর্ণি দেখে। ধস নামা দেখে। গুণ টানা নৌকায় ছইয়ের ওপর মাঝিদের গান শোনে। গেরু এবং সে এই সব দেখে আপাতত মশগুল হয়ে থাকে।

গেরু হারুকে নিয়ে অনেকদিন মশগুল হয়েছিল। অনেক দিন হারুকে কাঁধে করে নদীর পারে পারে অনেকদূর চলে গেছে। বর্ষার ভরা গাঙে ওরা দু-পা ডুবিয়ে বসেছে। তখন দুটো একটা কথা বলতে পারছে হারু। গেরুর শরীর ধরে কাঁধে উঠবার চেষ্টা করত হারু। কত রকমের কথা বলত। সে পাখী দেখলে বলত, গেউ···চাচা···পাখ···ই-··। গেউ চাচা ফস-দাঙ্গা যাবে। গে· ·উ চা...চা···ল · দি···র পা···নি···খাব·· অ ··।

গেরু চুপচাপ বসে থাকে। জলের ধারে ওর ছায়া পড়ে তখন। হারু কথা বলে—রাজ্যের কথা। গেরুর খুব ভাল লাগে। অভাবের যন্ত্রণা ভুলে থাকতে পাবছে। নদীর অন্য পাবে সানাই বাজে। বাবুদের বাড়ী বিয়ে। বাপ ওর বিয়ে দিয়েছিল। বিবি ওর এখনও চটানে আছে। কোনদিন চটান ছেড়ে ভাগবে। কোনদিন বলবে, তুর লাখান মরদ হামাব লাগে না। হামি অন্য চটানে উঠে যাবে। গেরু যেন সেই ভয়ে চটানে বেশীক্ষণ থাকে না। যতক্ষণ পারে চটানের বাইবে কাটিয়ে সাঁঝ লাগলে চটানে উঠে যায়। কখন জানি বলবে মেয়েটা, চললাম রে মরদ। কখন জানি বলবে মেয়েটা—হামার মবদ বটে তু। দুটো পেটের দানা চটানে তুলতে লারিস। সাঁঝ লাগলে চটানে উঠত গেরু, কিন্তু শনিয়ার সঙ্গে কথা না বলে মাচানে উঠে পড়ে ঘুমোত।

কোথায় যেন চলে যায় নেলী—ফিরতে গভীর রাত করে। মালসা মালসা খাবার আনে। হারুকে পেট ভরে খেতে দিয়ে সকলকে মুঠো মুঠো দেয়। নিজে খায় পেট ভরে।

ঠিকমত খেতে না পেয়ে শনিয়া দিন দিন শুকনো কাঠ হয়ে যাচ্ছে। চুরি-চামারি করে গেরুর আজকাল যা হচ্ছে—শনিয়াকে সে কথা জানতে দিচ্ছে না। পয়সায় সে কেবল মদ গিলছে। মদ গিলে আজকাল কেমন চেহারা হয়ে উঠেছে, কেমন বেলেল্লাপনা করতে শিখেছে। দুনিয়াতে কিছুই তার আর ভাল লাগছে না। শুধু হারুকে নিয়ে কোথাও চলে যেতে ভাল লাগছে। কোথাও বসতে

অথবা ওকে ভালবাসতে ভাল লাগছে। যত এমন হয় তত ওর একটা বাচ্চার সখ জাগে। ওর বাপ হতে ইচ্ছা হয়। হারুর মত ওর একটা বাচ্চার সখ। শনিয়ার পেটে একটা বাচ্চা হবে। হারুর মত রাজ্যের সব পাখী টিকটিকিদের সঙ্গে কথা বলুক ওর বাচ্চাটা এই সখ মনে মনে। যত এই সব মনে হয়, তত হারুকে কোলে নিয়ে ঘুরতে ইচ্ছা করে। তত সে হারুকে কাঁধে করে মাঠ, নদী, বন পার হয়ে যায়।

গেরু কোনো কোনোদিন হারুকে কাঁধে নিয়ে নদীর পারে সূর্য ওঠা দেখে। সূর্যাস্ত দেখে, নদী দেখে। পৃথিবী, আকাশ, নক্ষত্র দেখে। ওরা এই ধরণীকে ভালবাসতে চায়। এই ধরণীকে ভালবেসে বাঁচতে চায়।

বর্ষার রাতে চটানে ফিরে গেরু দেখল, শনিয়া মাচানে পড়ে আছে। শনিয়ার চোখ দুটো ছল্ ছল্ করছে। গেরুকে অপলক দেখছে শনিয়া। ভুখা থেকে শনিয়া বুঝি কথা বলতে পারছে না।

শনিয়ার চোখ দুটো দেখে গেরুর খুব কষ্ট হতে থাকে। ভুখা থেকে মেয়েটা বুঝি মরে যাবে—তবু চটান ছেড়ে যাবে না, চোখ দুটো শনিয়ার এমন ভাবই প্রকাশ করে। গেরু শনিয়ার পাশে বসে। অথচ কিছু বলতে পারে না। আদর অথবা কোনো সোহাগের কথা বলতে পারল না। এ সময় শনিয়াকে কি বলা যায়। কি বললে শনিয়া সুখ পাবে—সে ভেবে পেল না। অথচ শনিয়া গেরুর হাত টেনে বুকের কাছে রাখল এবং ইশারা করে একটু ঘন হয়ে বসতে বলল। গেরু ঘন হয়ে বসল এবং শনিয়ার ঠোঁট দুটো নড়তে দেখে বলল, তু কিছু বুলবি?

শনিয়া হাসল। ঠোঁট দুটো বেত পাতার মত কাঁপছে। পাতলা ঠোঁটে অল্প হাসিটুকু গেরুর খুব ভাল লাগছে।

শনিয়া বলল তু কেবল বাইরে বাইরে থাকিস। তু হামাকে দেখবি না?

গেরু বলল, জরুর দেখব। লেকিন তুকে কিছু খেতে দিতে পারছি না, বহুত কষ্ট হামার।

—কোনো কষ্ট না আছে। তু আয়, কথা শোন।

গেরু নিজের মুখটা শনিয়ার উপর নামিয়ে দিল।

শনিয়া ফিস্ ফিস্ করে বলল, হামার পেটে তুর একটা বাচ্চা এয়েছে গেরু। বহুত সুখের কথা বাচ্চাটা তুকে বাপ ডাকবে, হামারে মায়ী ডাকবে। বলতে বলতে শনিয়াব চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠে। গেরুরে গেরু, তু আচ্ছা হো যা। হামি ভাল হয়ে উঠব। হামি কাজ করবে তু কাজ করবে। একটা বাচ্চার কৈ দুখ্ না থাকবে।

গেরু আনন্দে অধীর। ইচ্ছা হয় সকলকে ডেকে বলে, হামভি চটানে মরদ বনে গিলাম। কিন্তু রাত আঁধার বলে, সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে বলে, সে শনিয়াকে কাঁধে ফেলে ঘুরতে থাকল। কয়েকটা পাক খেল ঘরে, শনিয়া চীৎকার করে, গেরু হেরে তু করছিস কি! খুশির চোটে তু কি হামারে মেরে ফেলবি!

গেরু শনিয়াকে মাচানে শুইয়ে দিল। দু দণ্ড পাশে শুয়ে থাকল। তারপর সে শনিয়াকে মাচানে রেখে শহরের দিকে চলে যাওয়ার আগে বলল, তু ঘুম যাস না। হামি আ-ভি ফিরে আসবে।

সারা রাত ঘুরে সহরের কোনো ঘরে, কোথাও সে চুরি করতে পারল না। ভোর রাতের দিকে সে ফিরে এল। সে দেখল মাচানে তখনও শনিয়া জেগে আছে। সে বললে, না-রে কিছু হল না।

শনিয়া মাচানের নীচে থেকে একটা থালা বের করে দেয়। তু খা লে। নেলী হামারে একথাল, তুরে একথাল দিয়ে গেল।

গেরু খেতে খেতে বলল হামার ভি একটা বাচ্চা হবে। হামার ভি ঘর হবে। লেকিন অভাব হামার যাবে না শনিয়া। একটা জীয়ন হাড় না হলে তু মরবি, হামি মরবে,

বাচ্চাটা-ভি মরবে। একটা বেম্ম চণ্ডালের হাড় হামার জরুর লাগে। গেরু এ সময় হারুর বিবর্ণ মুখটা দেখতে পেল।

দীর্ঘ সময় ধরে ঘাটোয়ারীবাবু কালো রঙের চেয়ারে বসে জানালার গরাদে নিরবধি কালের মুহূর্তকে প্রত্যক্ষ করলেন। প্রত্যক্ষ করলেন এবং ভাবলেন—বিস্বাদ, বিস্বাদ শুধু। শুধু যন্ত্রণা, শুধু মৃত্যু, শুধু বিষণ্ণতা। ভিন্ন ভিন্ন সব যন্ত্রণার প্রহসন।…বরং কোথাও চলে যাওয়া ভাল। মৃত্যুর প্রহসনে, যন্ত্রণার রাজ্যে বেঁচে সুখ নেই। যত নেলীর ছেলে বড় হচ্ছে, যত দুঃখবাবু চটানে এসে ছেলের দুষ্টুমির গল্প করছেন তত ঘাটোয়ারীবাবু এই সব ভেবে অধীর হচ্ছেন।

পাখীরা আকাশে নেই। পুরোনো অশ্বথের নীচে দুটো কাক মরে পড়ে আছে। দুটো দোয়েল আকন্দ গাছটার ছায়ায় বসে জানালার গরাদে ঘাটোয়ারীবাবুকে দেখছে। ওর চোখ, মুখ দেখছে। ঘাটোয়ারীবাবু জানালায় কেমন পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছেন। বর্ষার নদী দেখছেন। নদীটা চটানের পোয়াতী বৌদের মত কল কল করছে। দোয়েল দুটো এখন শিস্ দিচ্ছে। নেলীর ছেলেটার বয়স বাড়ছে। অফিস বারান্দায় হাতে লাঠি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে জানালায় উঁকি দিচ্ছে। হাত পা নেড়ে কত রকমের কথা বলছে। বড় বড় চোখ হয়েছে বাচ্চাটার, নাক, চোখ, মুখ নেলীর মত। মুখের গড়নটা, শরীরটা দুঃখবাবুর মত। ঘাটোয়ারীবাবু এ সময় কিঞ্চিৎ হাসলেন। ব্রাহ্মণের ঔরসে চণ্ডালিনীর গর্ভে সন্তান—কৈলাশ হলে বলত, বেম্ম চণ্ডালের ছা। তিনি কিঞ্চিৎ হাসলেন। তেমন ছা থেকেই রাহু চণ্ডালের হাড় হয়। শুধু হাড়টার উপর এক রোজের পূজো আর্চ্চা কালীর থানে মানত। বাচ্চাটাকে জলের নীচে শ্বাস বন্ধ করে মারা এবং রাতে মা শ্মশানকালীর পূজো। যখন কৈলাস প্রথম এল চটানে, যখন সে হাকিমী করত কোর্টে, তখন সে বলত, বাবু ও বড়লাখোটিয়া চীজ আছে। এ সহজে মিলবে না বাবু। ওস্তাদ রসিদ বহুত

কসরত করে পেরাগের থেকে একটা বেম্ম চণ্ডালের ছা চুরি করেছিল। তারপর বহুত তন্তর-মন্তর, তারপর বাচ্চাটাকে জলে শ্বাস বন্ধ করে মারা। বলতে বলতে কৈলাশ কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ত। ঘাটোয়ারী বাবু এখনও যেন সে সব কথা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন। যেন কৈলাশ ওর পিছনে দাঁড়িয়ে এইমাত্র কথাগুলো বলে গেল। হাড়টা চুরি যাবার পরও কৈলাশ কতবার এসেছে বাবুব কাছে। বসেছে, বলেছে, একটা হাড় লাগে বাবু। লেকিন কাঁহা মিলে? কাঁহা মিলে! নেলীর বাচ্চাটাকে দেখে বাবুর মনে হল কৈলাশের প্রেতাত্মা যেন ওর চারপাশে ঘুবছে। ওর শরীর থেকে হাড় বের করে নেওয়ার জন্য দিনরাত সেই প্রেতাত্মার চোখে ঘুম আসছে না। প্রেতাত্মা চটানের চার পাশটায় ঘুবছে ফিরছে। ফাঁক খুঁজছে চুরি কবার জন্য।

ঘাটোয়াবীবাবু ধমক দিলেন, এই তুই এখানে কেন? তোর মা কোথায়?

হারু বড় বড় চোখে তাকাল। বাবু যে ওকে ধমক দিচ্ছে ও বুঝতে পারল। বুঝতে পেরে সে কাঁদল।

—ওঃ কাঁদা হচ্ছে। আমি তোর ভালর জন্যই বলছি। একা একা কোথাও যাবি না। তোর মা কোথায়? মাকে ডাক, কথাটা বলে দি।

হারু কিছু বুঝতে পারল না। সে একটা থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। লাঠি দিয়ে মেঝেতে বার বার আঘাত করল। সে বাবুর মত আকাশ কিংবা পাখী দেখলে না। দেয়াল ধরে টিকটিকি নামছে। সে লাঠি দিয়ে টিক্ টিকিটা মারতে গেল। হাত দিয়ে ধরতে গেল। টিক্‌টিকি ভয়ে উপরে উঠে গেল। টিক্‌টিকিটা নাগালের বাইরে গিয়ে লেজ নাড়তে থাকল। হারু টিক্ টিকিটা ধরতে না পেরে রাগে লাঠিটা বাইরে ফেলে দিল। তারপর ভিতরে ঢুকে বাবুর পায়ের কাছে বসল। বাবুর পায়ের চুল ধরে টানতে থাকল

—এই শালা ব্যাথা পাচ্ছি। ব্যাটা তো দিন দিন খুব পাজি হয়ে উঠছে। তুই যে লোম ধরে টানছিস আমি ব্যাথা পাই না রে?

হারু বলল, বাউ···ত···ত···।

ঘাটোয়ারীবাবু সোহাগ করলেন, বাউ···ত···ত। আমি বুঝি তত বাবু?

টিকটিকিটা দেয়ালে ক্লপ ক্লপ করল। ক্লপ ক্লপ করে টিকটিকিটা একটা মাছিকে আক্রমণ করল। ঘাটোয়ারীবাবু ক্লপ ক্লপ শব্দ শুনলেন। তিনি বাইরে এসে টিকটিকি দেখলেন। দেখছেন। মাছিটা দূরে গিয়ে বসেছে। টিকটিকিটা উপরে উঠে গেল। কোনো আক্রমণের ইচ্ছা এখন আর নেই। তিনি দেখলেন টিকটিকির চোখ, মুখ গেরুর মত এবং হারু মাছি হয়ে দেয়ালে উড়ছে। টিকটিকিটা আনন্দে দেয়ালে লেজ নাড়ে। এই সব দেখে কৈলাশের প্রেতাত্মা গেরুর চোখে ঘুম নেই—ঘাটোয়ারীবাবু যেন টের করতে পারছেন। গেরুর হ্যাকিমী ব্যবসাটা তিনি ভাল চোখে দেখছেন না। গেরু ফের কোর্ট-কাছারী যেতে আরম্ভ করেছে। ফের রসল্লা দিচ্ছে ঘরে।

যত দিন যাচ্ছে গেরুর অভাব তত বাড়ছে। নেলী রোজ রাতে কিংবা দিনে বের হতে পারছে না। চটানের উপর দিয়ে আশ্বিন মাস গেছে, কার্তিক মাস যাচ্ছে। গেরু শুধু রসল্লা দিয়েই যাচ্ছে। দুঃখবাবু এসে শুধু গল্প করছেন, কোনো কাজের নাম নেই। এবার একটু কাজের চাপ দিতে হবে। খড়িঘরে কাঠ নেই। কাঠ সংগ্রহের জন্য ওকে যেতে বলতে হবে। অনেক কাঠের দরকার হয়ে পড়েছে। কিছুদিন থেকে খুব মড়া আসতে শুরু করেছে। কার্তিক মাসের টানে বুড়োরা মরছে খুব। রোজ তিনটে-চারটে করে আসছে। জ্বলছে। খুব দূর থেকে আসছে সব—দশ ক্রোশ, বিশ ক্রোশ হবে।

হারু হেঁটে হেঁটে বেড়াচ্ছে বারান্দায়। কোনো ভয় ডর নেই। নেলী চটানে পড়ে ঝাড়োর ঘরে পাতি তুলছে। হারুকে দেখে

বুড়ো মানুষরা মরছে খুব ভাবটা মনে মনে কাজ করছে ঘাটোয়ারী বাবুর। তিনি তাঁর শরীরের সব গ্রন্থিগুলো দেখে বিষণ্ণ হলেন। মৃত্যুর ইচ্ছা এ শরীরে যেন প্রকট হচ্ছে। মৃত্যু—মৃত্যু—মৃত্যু। তিনি বারান্দায় পায়চারী করার সময় উচ্চারণ করলেন তিনবার। তিনবার তিনি ঈশ্বরের স্মরণ নিলেন। তিনবার তিনি সকলের অলক্ষ্যে হারুকে প্রদক্ষিণ করলেন। যেন হারু ওঁর সন্তান। অথবা হারু তাঁর এক অন্য জীবনের প্রতীক। হারুকে দেখলে ওঁর মন অযথা খুশির ইচ্ছায় উদার হতে থাকে। তখন বাঁচার ইচ্ছা তীব্র হয়। তখন পৃথিবীর কুটোগাছটা পর্যন্ত অর্থবহ মনে হয়। তখন চটান ছেড়ে চলে গিয়ে অন্য পৃথিবীর মানুষ হয়ে বাঁচতে ইচ্ছা হয়। মৃত্যু—নরক, দুঃখ এবং যন্ত্রণার প্রতীক।

যে ভোরে তিনি এমনসব ভাবছিলেন, সে রাতেই ঘটনাটা ঘটল। দুঃখবাবু ঘরে ফিরে গেছেন। কাকপক্ষির কোনো সাড়া নেই চটানে। মদ খেয়ে হল্লা করছে না কেউ। রাত না নামতেই চটানটা নিঝুম হয়ে গেছে, কেমন ফাঁকা ফাঁকা কেমন নিঃসঙ্গ। নেলী সকাল সকাল শুয়ে পড়েছে মচানে। গঙ্গা, যমুনা, নীচে ঘুমিয়ে আছে। হারু অন্য পাশটায় উপুড় হয়ে ঘুমুচ্ছে। ঘাটোয়ারী বাবুর শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না বলে তিনি সকাল সকাল শুয়ে পড়েছেন। ঘাটে কোনো মড়া জ্বলছে না। ওপারে রেলের শব্দ পর্যন্ত সে রাতে ওঠেনি। ট্রেনটা যেন কোথাও আটকে আছে। অথবা কোথাও আটকে গর্জাচ্ছে, ফুঁসছে। রাতের ঘন আঁধারে লক্ষ লক্ষ মৃত্যুর দূত যেন পায়চারী করে বেড়াচ্ছে চটানে। লক্ষ লক্ষ প্রেতাত্মা যেন উড়ছে চটানটার উপর।

গেরু:দরজা দিয়ে বের হবার সময় শনিয়া হাত টেনে ধরল—তু না যাস গেরু। হামার কীরা। তু না যাস। ও কাম করতে হবে না। হামি উপুস করবে, মরবে, লেকিন তু এ কাম না করবি।

গেরুর চোখ দুটো জ্বলছে। গেরুর চোখদুটো ভয়ানক হয়ে উঠেছে। ওর গলাটা শুকনো এবং কঠিন। সে বলল, তু হাত ছেড়ে কথা বুল মাগী। তু জায়দা ঢং মাত দেখা আভি। হামি এক রাতে জরুর ফিরে আওগে। তু হাম কাঁহা ভি চল যাউগে। বলে গেরু জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিল। কৈ আদমি তুকে কিছু বুলে তো তু বুলবি হামি না জানে ও কাঁহা গেছে। এ বাত তু মনে রাখবি। লয়তো তু ভি খুন হো যাবি চটানে—বুলে দিলাম।

গেরুর চোখ দুটোতে অমানুষিক ভাব। চটানে নেমে ওর মনে হচ্ছে মাথাটা ঝিম ঝিম করছে। প্রথম রাতে মরা তুলতে গিয়ে ফরাসডাঙ্গায় যেমন ভাব হয়েছিল চোখে-মুখে, মনে সে ভাবটা হুবহু কাজ করছে এখন। মনে হচ্ছে দূরে কেউ যেন শোকের কান্না কাঁদছে। গলা টিপে ধরলে যে শব্দটা গলা থেকে বের হয়—সে শব্দটা কাছাকাছি কোথাও উঠেছে। অথবা কোনো মানুষকে জলের নীচে শ্বাস বন্ধ করে মারলে ফুসফুসের রংটা যা হয়, ওর চোখে সেই রং। সে নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। দুরন্ত যন্ত্রণায় সে কাতর হচ্ছে। তবু, তবু সে যাচ্ছে। তবু, তবু সে হাঁটছে। কোমরে চাদর বাঁধল গেরু, গামছা দিয়ে মাথাটা পেঁচিয়ে নিল। শরীরে, মনে, অমানুষিক ভাবের জন্ম দিল। আঁধারে গেরুকে আর দেখা যাচ্ছে না। গেরু হাঁটছে—হাঁটছে।

দরজায় জবু-থবু হয়ে শনিয়া দাঁড়িয়ে আছে। ওর ইচ্ছা হল চীৎকার করতে। ইচ্ছা হল বলতে, গেরু তু না যাস। গেরু তু খুন মত কর। হামি তুর সাথে যাবে, তুর সুবিধা অসুবিধা দেখবে। কিন্তু গেরুকে তখন দেখা যাচ্ছে না। নেলীর ঘরেও কোনো চীৎকার উঠছে না। সে দরজায় দাঁড়িয়ে হারু কিংবা নেলীর চীৎকার শোনার অপেক্ষায় রইল।

নেলী যদি মাচানে জেগে থাকত, সে দেখতে পেত, দুটো ভয়ংকর বলিষ্ঠ হাত ওর মাচানের উপর এগিয়ে আসছে। সে দেখতে পেত, গঙ্গা যমুনা চোখ তুলে তাকিয়ে পরিচিত জন বলে

কিছু বলছে না। গেরু প্রথমে গঙ্গা যমুনাকে আদর করল। ছুটো মুড়ি দিল খেতে। শেষে মাচানের উপর ঝুঁকে ঘুমন্ত হারুকে কাঁধে নিয়ে ধীরে ধীরে চটান থেকে ভালমানুষের মত নেমে গেল হারুকে নিয়ে যেন বেড়াতে যাচ্ছে এমন ভাব গেরুর।

সকলে তখন ঘুমোচ্ছে চটানে। কেবল শনিয়া ঘটনার সাক্ষী হয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে। অথচ বাচ্চাটা একবাব কেঁদে উঠল না। সে বিস্মিত হয়ে কেবল দরজায় দাঁড়িয়ে থাকল। গেরু কোন পথ ধরে চটান থেকে নেমে যাচ্ছে দরজায় দাঁড়িয়ে সে তা ধরতে পারছে না।

গেরু চটান থেকে নেমে ছুটতে থাকল। কার্তিক মাস শেষ হয়ে আসছে। কার্তিক মাসেব রাত্রি। নদী এখন অনেক নীচে নেমে গেছে। সে নদীব পার ধরে ছুটল। হারু ভয়ে এখন চীৎকার করলেও চটানের কেউ শুনতে পাবে না। ঘাসেব উপর শিশির পড়েছে। সে শিশির মাড়িয়ে চলল। বাতের কোনো পাখি ঝোপে জঙ্গলে ডাকছে না। ওপারে ট্রেনেব শব্দ নেই অথবা আলো এসে পড়ছে না। সুতরাং সে ছুটতে থাকল।

সহসা কোনো প্রবল ঝাঁকুনিতে হারুব ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে ভয় পেল। সে দেখল আঁধাবে কে যেন ওকে মাটি থেকে তুলে নিচ্ছে। কে যেন ফেব ওকে নিয়ে নদীব পাব ধরে ছুটছে। সে এবার কেঁদে উঠল। সে জোরে কাঁদতে থাকল।

গেরু ওর কান্না শুনে থামল। মুখেব কাছে মুখ এনে বলল, তু চিনতে পারছিস। হামি তুর গেউ চাচা। তুকে নিয়ে হাম সেখান বাড়ী যাচ্ছে। তু রোনেসে আদমি লোক আচ্ছা না, বুলবে হারুয়া।

গেরুকে চিনতে পেরে হারু নির্ভয় হতে পারছে। কার্তিক মাসের রাত। শীত শীত করছে হারুর। সে গেরুর শরীব জড়িয়ে থাকল। শরীরের উত্তাপ নিতে চাইল। বলল, গেউ চাচা মায়ী যাব। তু-উ মায়ী যাবি না? টু…প…লে…না।

—হে. যাবে। জরুর যাবে। তুর মাইকা পাশ জরুর যাবে। লেকিন আভি কথা বুলেনা। বাপ ত আচ্ছা আছে। গেরু যত হারুর সাথে কথা বলছে তত যেন ওর ভয় বাড়ছে। সে চলতে চলতে ভাবল ফরাসডাঙ্গার জঙ্গলে পোড়ো বাড়ীটাতে রাত কাটাবে। হারুর শরীরটা চাদরে পেঁচিয়ে ভাঙ্গা পাঁচিলের আঁধারে ফেলে রাখবে। ভোররাতের দিকে কাঁঠাল গাছটার নীচে কবর দেবে। তারপর সে কিছুদিন এধার ওধার করে বেড়াবে। কিছুদিন জল ঢালবে হারুর শরীরটার উপর। হারুর শরীর পচিয়ে বাঁ হাতের হাড় সংগ্রহ করবে। হাড়টা গঙ্গা জলে শুদ্ধ করে শ্মশানে কালীর পূজো দেবে একটা। শেষে সে বের হয়ে পড়বে। গাছ-গাছালী নিয়ে দূরে কোথাও চলে যাবে। সঙ্গে শনিয়া থাকবে, বাচ্চাটা থাকবে। বাচ্চাটা বাপ বলে ডাকবে। গেরু বলবে, শিখে লে শালা, এর নাম জীয়ন হাড়। এ হাড় দু-শ পচিশ দফে বেইমান মানুষের কাজে লাগে। জড়ি বুটি দ্রব্যগুণ, মন্তর-তন্তর এ সবের জেরছে কারবার।

হারু গেরুর কাঁধে হাত পা নেড়ে খেলল। অজস্র কথা বলল। গেরু চাচার সঙ্গে ঘুরতে পেরে হারুর এ আঁধার খুব ভাল লাগছে। অন্যদিনের মত বুকের উপর হারু পা দুটো নাচাল। দোলাল। হাত তুলে আকাশের ছোট চাঁদকে ডাকল। গেরুর কপালে টিপ দিল। হাসল। সে অজস্র রকমের কথা বলে গেরুকে অন্যমনস্ক করতে চাইছে। সে ডাকল, গেউ চাচা·· উ ··উ···আ···আ। দূরে শেয়াল ডাকে। সে বলে বা·· যা···জি·· জি...। জু··· জু। গে···উ···চা···চা। পু···পু। হারু যেন এই কাক জ্যোৎস্নায় মেমানো বাড়ীই যাচ্ছে। কোনো ভয় ডর অথবা শঙ্কা জাগছে না। কোন সংশয় জন্মাচ্ছে না। গেরু চলতে চলতে দেখল রাজ্যের সব ভয় ওকে এসে জড়িয়ে ধরেছে। হারুই যেন গেরুকে নিয়ে যাচ্ছে জলে ডুবিয়ে মারার জন্য। গেরুর হাত কাঁপছে। পা কাঁপছে। হারু যত ঘাড়ের উপর রাজ্যের কথা এনে হাজির করছে, তত গেরু

বিষণ্ণ হয়ে পড়ছে। বিরক্ত হয়ে পড়ছে। এইসব শুনে গলা শুকিয়ে উঠছে গেরুর। সে চলতে পারছে না। চলতে কষ্ট হচ্ছে। ইচ্ছা হয় তক্ষুনি হারুকে মাটিতে আছড়ে অথবা গলা টিপে মেরে ফেলতে, কিন্তু সেই শরীর থেকে জীয়ন হাড় পাবে না ভেবে. সে বিরক্তিতে চীৎকার করে ওঠে, হারু তু থাম, তু থাম। সে চোখ মুখ ঢেকে মাটিতে বসে পড়ে। হারু পাশে দাঁড়িয়ে আছে। গেরুকে এ ভাবে বসে থাকতে দেখে সে চুল ধরে টানতে থাকে। গেরুর মুখ দেখতে চায়। মুখ দেখে বলতে চায় গে···উ···চা···চা···তু···ভা···ল। হামি···ভা···ল। না···গে···উ···চা···চা।

হারুর মুখের দিকে চেয়ে গেরু ফের চীৎকার করে উঠল, তু থাম! তু থাম! গেরু কি ভেবে হারুকে কোলে তুলে নদীর দিকে নেমে যেতে থাকে। বেশী দেরী করলে সে যেন ধরা পড়বে। বেশী দেরী করলে সে নিজেই খুন হয়ে যাবে। সে ছুটে ছুটে নদীর দিকে নেমে যেতে থাকে, আর বলতে থাকে, তু থাম, তু থাম।
গেরুর এই বিসদৃশ ভাবটুকু দেখে হারু অভিমান করল। গেউ চাচা ওকে ধমকে দেয়। হারুর অভিমান বাড়ছে। সে মুখ ফিরিয়ে রাখে। সে কথা বলে না। ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদতে চায়। গেরু অন্যদিনের মত বলতে পারছে না, আয় বাপ তুকে কিছু না বুলবে। সে বলতে পারল না, অথচ ওর কষ্ট হতে থাকল। নদীর জলের দিকে সে যত ছুটে যাচ্ছে কষ্টটা যেন তত বাড়ছে। তত অন্যদিনের কথা, নদীর ভরা বর্ষার কথা, একটি বিস্কুটের কথা ওকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। যত এই সব মনে হয় ততই সে জোরে ছুটতে থাকে। সত্বর সে ওকে জলে ডুবিয়ে নিঃশ্বাসটা বন্ধ করে দিতে চায়।

গেরু কোমর জলে গিয়ে নামল। সে বুঝতে পারছে হারু ওর কোলে অভিমান ভরে মুখ ফিরিয়ে আছে। সে বুঝতে পারছে সাধ না করলে, সোহাগ না করলে সে মুখ ফেরাবে না। সে ওকে ওর অভিমান সহ জলের নীচে ডুবিয়ে দিতে চাইল। সে বুকের উপর

থেকে হারুকে জলের উপর নিয়ে এল। ধীরে ধীরে জলে ডুবিয়ে দিতে চাইল। হারুর পা দুটো জলে নেমে যাচ্ছে। হারু কিছু বলছে না। প্রচণ্ড অভিমানে সে এখনও মুখ ঘুরিয়ে আছে। গেরু ওর মুখটা দেখল। দুজনের ছায়া সে জলে দেখতে পায়। অথচ হারুর এই অবোধ অভিমানে গেরুর বুকটা প্রচণ্ড মোচড় দিয়ে উঠছে। আকাশের আলো, বালিয়াড়ির সাদা রঙ, একটি বিস্কুটের স্মৃতি এবং হারুর এই অবোধ অভিমান গেরুর মনে প্রচণ্ড ঝড় তুলেছে। সে যত ওকে জলে ডুবিয়ে দিতে চাইছে, তত যেন সে ওকে প্রচণ্ডভাবে ভালবেসে ফেলছে। সে যেন দেখছে—নেলীর দুটো ভিজে চোখ বলছে, হামার সাত রাজার ধনকে তু খুন না করিস। এবং তখনই দেখল হারু ওর দিকে চেয়ে হাসছে। ফের হাজার রকমের কথা বলছে। বলছে, গেরু···চা···চা···তু···হামারে চু··উ ··না···দিবি।

গেরু নিজেকে আর কঠিন কঠোর করে রাখতে পারে না। সে আর নৃশংস হতে চায় না। সে বরফের মত গলে গলে পড়ে। কোমর জলে হারুকে বুকে নিয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকে। ওর পায়ের কাছে দুটো মাছ নড়ছে। জল কাঁপছে, ওদের ছায়া দুটো কাঁপছে। আকাশের এক টুকরো চাঁদ এখন গাঁয়ের ছায়ায় নেমে যাচ্ছে। ধরণী শান্ত। কোথাও কোনো ভয়-ভীতির চিহ্ন নেই। কোথাও কোনো সংশয় নেই। সন্দেহ নেই। গেরুর হাত পা এখন কাঁপছে না। সে ধীরে ধীরে বালিয়াড়ি ভেঙে উপরে উঠল।

হারু ফের বলে, তু...চু...উ...দে...চাচা।

—জরুর দেবে। হামি তুরে চুমু না দেবে ত কোন দেবে? হারুর কপালে গেরু চুমু খেল। যেমন করে রোজ গালটা মুখটা ওর নরম গালে ঘসে দিত আজও তেমনি ঘসে দিল। গেরু সুখ পেল, আনন্দ পেল। হ্যাকিমী দানরীর কথা ভুলে গেল। ভুলে গেল সে আজ দুদিন ধরে ভুখা আছে। সে ভুলে গেল হারুকে কিছুক্ষণ আগেও খুন করার কথা ভেবেছে। রাতের নিঃসঙ্গতা ধরণীকে

শান্তি দিচ্ছে এখন। ওর মনে শরীরে যে অশান্তির যন্ত্রণা এতক্ষণ হচ্ছিল, পারে উঠে সব কেমন উবে গেল, নিঃশেষ হয়ে গেল।

একদল বাদুড় উড়ে গেল নদীর অন্য পারে। কিছু শেয়াল ডাকে ডহরের পারে। খানা-খন্দে, ঝোপ-জঙ্গলে পাখীরা সব শান্তির ডাক ডাকছে। পাখীরা সব ঘুম থেকে উঠে দেখে ধরণীর এই শান্ত ভাবের সঙ্গে গেরু পা মিলিয়ে হাঁটছে। কাঁধে হারু হাজার রকমের কথা বলে খুশী হচ্ছে।

ধীরে ধীরে গেরু চটানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সে শ্মশানটার কাছে এসে দেখল চালা ঘরে চার পাঁচটা লোক বসে বিড়ি টানছে। চালা ঘরটার পাশেই মড়াটা রাখা রয়েছে। ওর শিয়রে হ্যারিকেন জ্বলছে। মড়াটা চাদরের নীচে থেকেই ফুলে ফেঁপে উঠেছে। গেরু মড়াটা দেখে ধরতে পারল, গন্ধ নিয়ে ধরতে পারল—মড়াটা পচে গেছে। সে দাঁড়াল মড়াটার কাছে। লোকগুলো কিছু বলছে না। ওরা জানে গেরু চটানের লোক। ওরা এখানে আরও কত-বার মড়া বেচে অথবা পুড়িয়ে চলে গেছে। গেরু ওদের চিনতে পারল। গেরু ওদের মত করে কথা বলল। গেল সালে তোমরা এয়েছিলে নাকো মোড়লের বেটা?

ভিতর থেকে বুড়ো লোকটা উত্তর করল, হ্যাঁ এয়েছিলাম বটে। তুর বাপ বেঁচে নেই আর আমাদের চিনচে কে?

গেরু বলল, না চিনলে চলবে কেন? না চিনলে বললাম কি করে তুমরা গেল সালে এয়েছিলে?

বুড়ো লোকটা জবাব দিচ্ছে।—গেল সালের মড়াটা তো পুড়িয়েই যেতে হলরে বাপু। তুই চিনতে পেরেই আর কতটা উপকার করলি।

গেরু বুঝল, ওরা মড়াটা বিক্রি করতে চায়। বুঝল, ওরা বিশ ক্রোশ, পঁচিশ ক্রোশ পথ ভেঙ্গে মড়াটাকে গঙ্গা পাইয়ে দিতে এসেছে। গঙ্গার জলে চুবিয়ে মড়াটা ইচ্ছে করলে ওরা বিক্রি করতে পারে। ইচ্ছে করলে এমনি দিয়ে যেতে পারে। ইচ্ছে করলে কাঠের পয়সায়, ঘাটের পয়সায়, ওরা ফুর্তি করতে পারে। গেরু

জানে, কৈলাশ বেঁচে থাকলে মড়াটা নিয়ে নিত বাবুকে বলে। বাবু রসিদ লিখতেন অথচ কাঠ পুড়ত না। অথচ টাকা পেতেন কিছু, ওদের কাঠের দাম লাগত না। ঘাটেব দাম লাগত না। সে পয়সায় নিমা বাগদীব লোকেবা মদ খেত, ফুর্তি করত। গাঁজা-ভাঙ খেয়ে পাশেব একটা বস্তিতে উলঙ্গ হয়ে নাচত।

গেরু বলল, মড়াটা আমি নিলে দেবে আমাকে?

—নিবি তুই! নিলে দুর্ভোগ পোহাতে হয় না।

গেরু বলল, তবে জলদি হ্যারিকেনের আলোটা নিভিয়ে দাও। বালিয়াড়িতে নেমে চুপচাপ বসে থাকো।

দুদিন খেতে না পেয়ে গেরুর মুখটা শুকিয়ে গিয়েছিল। মড়াটা পাবে ভেবে শুকনো মুখটা ফের ভরে উঠল। সে হারুকে কাঁধে নিয়ে তাড়াতাড়ি চটানে উঠে যাচ্ছিল এমন সময় ঘাটোয়ারী বাবু ডাকলেন, কে যায়?

—হামি গেরু আছে বাবু।

—কোথায় গেছিলি নেলীর বাচ্চাকে নিয়ে?

—নদীর ধারে বাবু।

—নদীব ধাবে গেছিলি! কেমন সন্দেহ গলায় বললেন ঘাটোয়াবীবাবু।

—হে বাবু নদীর ধারে। দুরোজ ভূখা থেকে নিদ নেই আতে বাবু। গেরু মনে মনে খুব খুশী হচ্ছে। খুব বুদ্ধি করে কথাটা বলতে পেরেছে ভেবে সে খুব খুশী। ও পা বাড়ায় চটানের দিকে।

ঘাটোয়ারীবাবু পুনরায় ডাকলেন, যাস না কথা আছে।

গেরু বলল, থোড়া বাদ আসছে বাবু। সে হারুকে নেলীর পাশে বাখতে যাচ্ছে।

ঘাটবাবু শিবরাম ঘোষ জানালায় বসে অপেক্ষা করলেন। দেয়ালে হ্যারিকেনটা নিবু নিবু হয়ে জ্বলছে। দুঃখবাবু বিকেলে ছেলে-পিলের গল্প করে গেছেন। গল্পগুলো এত ভাল লেগেছিল যে তিনি চটানে বসে থাকতে পারেননি—তিনি দুঃখবাবুর সঙ্গে সহর

পর্যন্ত হেঁটে গিয়েছিলেন। দুটো কমলা লেবু কিনে দিয়ে বলেছিলেন ওদের দেবেন। বলবেন, তোদের জ্যাঠামশাই দিয়েছে।

তিনি বসে বসে এমন সবই ভাবছিলেন। ভাবছিলেন হয়ত দুঃখবাবু ওর দেওয়া কমলা লেবু দুটো ওদের হাতে দিয়েছেন। ওরা খুশী হয়েছে। হয়ত দুঃখবাবুর স্ত্রী বলেছেন একবার নিয়ে এস না ওনাকে। একদিন এখানে দুটো খাবেন। অথচ তিনি ধরতে পারলেন না কখন হারুকে চুরি করার মতলবে গেরু নেলীর ঘরে ঢুকেছে, কখন সে নেমে গেছে নদীতে। তিনি ভাবলেন, এই নিয়ে গেরুকে একটু বকতে হবে। গেরুকে সাবধান করে দিতে হবে। তিনি গেরুর অপেক্ষাতে জানালার ধারে বসে থাকেন।

—বাবু।

গেরু বুঝি এল। তিনি চোখ তুললেন।

—কে? অঃ গেরু—আয়।

গেরুকে পাশে বসতে বলে বল্লেন, তুই নেলীর বাচচাকে নিয়ে যখন তখন চটান থেকে নেমে যাবি না।

—যাবে না বাবু।

—তুই মনে করবি না আমি কিছুই টের করতে পারিনা।

গেরু চুপ করে থাকে। ঘাটোয়ারীবাবুর পায়ের কাছে বসে মুখ নীচু করে থাকে।

—তুই মনে করবি না তোর মত বুদ্ধি আর কারো নেই। গেরু এবার মুখ তুলে বাবুর দিকে তাকায়।

—তুই মনে করবি না বাচ্চাটা শুধু নেলীর, বাচ্চাটা আমার। ওটা আমার পায়ের কাছে মানুষ। ওর শরীরে আমার মাংস না থাকতে পারে। কিন্তু আমার ভালবাসা আছে। বলতে বলতে সহসা চুপ করে যান। জানালা দিয়ে অন্ধকারটা দেখতে দেখতে উদাসীন হয়ে যান।

—বাবু!

—বল।

—বাবু একটা কথা বুললে রাগ করে লিবেন না?

—কি কথা বলবি ?

—বাবু একটা মড়া এয়েছে ঘাটে। নিমা বাগদীর মড়া। ঠিক করে বুললে আপনি হয়ত চিনে লিবেন। সাঁইথিয়ার নিমা বাগদী। মড়া বেচে আদমীটা মদ খায়। আপনি জরুর চিনে লেবেন। ও হামারে মড়াটা দিয়ে দিতে চায়। বুলে দিন না বাবু। গেরু বাবুর পায়ের কাছে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল। পা দুটো ছুঁতে চাইল। চোখ দুটো ফের নরম করে ডাকল, বাবু।

ঘাটোয়ারীবাবু একটু সরে বসলেন।—এ কি হচ্ছে। তুই অসময়ে আমার পা ছুঁবি না।

গেরু যথার্থই আর পা ছোঁয়ার চেষ্টা করল না। চোখ দুটো ভারী করে বলল, দুরোজ ভুখা আছে বাবু। দু রোজ দানা-পানি কিছু পড়ছে না পেটে। ঠাকুর ভি ধারে দিচ্ছে না। বৌটা না খেয়ে মরে যাবেক বাবু।

ঘাটোয়ারীবাবু চোখদুটো উদাসীনের মত করে রাখলেন। গেরুর কথা তিনি যেন শুনতে পাচ্ছেন না।

গেরু দুটো হাত মেঝের উপর রাখে। হাত দেখানোর মত করে রাখে। বলে, বাবু আপনি চটানের মা—বাপ!

ঘাটোয়ারীবাবুর চোখদুটো জ্বলতে থাকে। চোখের মণি দুটো ঘুরতে থাকল যেন। ভাগ, ভাগ। শালা ভাগ। তিনি খিস্তি করতে আরম্ভ করলেন। আমি মা-বাপ! ছেলে-পুলে নেই, ঘর-সংসার বলতে কিছু নেই—আমি চটানের মা-বাপ? আমি মরলে তোরা কখনও কাঁদবি? তোরা চোখের জল ফেলবি? তোদের পাষাণ আত্মা আমার জন্য চোখের জল ফেলবে? দুঃখ করবে? ঘাটোয়ারীবাবু কথাগুলো বলতে বলতে গভীর গ্লানিতে গলে গলে পড়েন। গেরু মাথা নীচু করে যেমন বসেছিল, তেমনি বসে থাকে।

ঘাটোয়ারীবাবু রামায়ণ মহাভারত দুটো ঠেলে দিয়ে কাউন্টারটা খুলে দিলেন। লোকগুলো এখনও আসছে না—

তিনি বিরক্ত হচ্ছেন। তিনি মড়ার নামধাম রেজেস্ট্রি খাতায় তুলে শুয়ে পড়বেন। আর বসে থাকতে ভাল লাগছে না। জেগে থাকতে ভাল লাগছে না। গেরুকে উঠতে না দেখে বলেন, টাকা চাই? টাকা—নেবার সময় ত মনে থাকে, দেবার সময় ত মনে থাকে না!

গেরু ডোম চোখ তুলল না। বাবুর পায়ের উপর চোখ রেখেই বলল টাকা হামার লাগে না বাবু! আপনি কত দিয়ে লিবেন?

—তবে কি চাই! কি চাইরে কৈলাশের ছা! নেমক-হারাম পাষণ্ড! আমি কি দিতে পারি তোকে!

—বাবু আপনি ইচ্ছা করলে সব দিতে পারেন। মড়াটা ফুলে-ফেঁপে গেছে বাবু। মড়াটা হামারে দিয়ে দিতে চায় বাবু। আপ বুলেম ত হামি লিয়ে লি। লয়ত হাম মরবে, বিবিটা ভি মরবে। বাচ্চাটা ভি মরবে।

ঘাটোয়ারীবাবুর মনে হল তিনি ভুল শুনেছেন। মনে হল গেরু ওর সঙ্গে মস্করা করছে। অথবা তঞ্চকতা করছে।

গেরু ফের বলে, হামার বাচ্চাটা ভি মরবে বাবু!

—তোরও বাচ্চা হল রে গেরু! গেরুর বাচ্চা হবে জেনে তিনি চেয়ারে বসে থাকতে পারলেন না। তিনি ঘরের ভিতরেই দ্রুত পায়চারী করতে থাকলেন। একবার ঘাটের দিকে, একবার চটানের দিকে মুখ ফেরাতে থাকলেন। রাত বাড়ছে তখন। রাত ঘন হচ্ছে। দূরে কোনো পুরনো অশ্বত্থের ছায়ায় ঘাসের নীচে প্রজাপতিরা ডিম পাড়ছে যেন। ডিমের উত্তাপ এ শরীরে এসে তা দিচ্ছে। তিনি এখানে দাঁড়িয়ে হরিণ-হরিণীর জলপান করার শব্দ পেলেন। তারপর দেখতে পেলেন মনের রাজ্যে ওরা গভীর অরণ্য হয়ে গেছে। গভীর অরণ্যে ঐ সব হরিণেরা ভালবাসার চিহ্ন রেখে যাচ্ছে। যেন কোন নীহারিকার অতীত থেকে এ বর্তমান শুধু চিহ্ন রেখে যাওয়া। ডিম পেড়ে যাওয়া—হরিণেরাও ডিম পাড়ে—এমন ভাবতেই ঘাটোয়ারীবাবুর ভাল লাগছে। কালের অক্ষয়ে ইচ্ছার জন্মকে তিনি কোনো সুখ

পরিবারে আটকে রাখতে পারলেন না। তিনি শুধু জেনেছিলেন মৃত্যু—মৃত্যুই সব। মৃত্যুর কড়া-ক্রান্তির হিসাবে তিনি কেমন অবিশ্বাস্যভাবে এতদিন এই চটানে...একটা চটানে...বাঁজা হরিণ হয়ে ছুটেছিলেন। গেরুর বাচ্চা হবে জেনে এ সময় হরিতকীকে কাছে পেতে খুব ইচ্ছা হল। একটা বাঁজা হরিণের মত না বেঁচে একটা ফলন্ত হরিণের মত বাঁচতে ইচ্ছা হল ওঁর।

ঘাটোয়ারীবাবু জানালার পাশে দাঁড়ালেন। জানালা ধরে অন্ধকার গলে গলে পড়ছে। গেরু পাশে চুপচাপ অপরাধীর মত বসে আছে। বাবুর ইচ্ছা হচ্ছে না গেরুর চোখে-মুখে ডিম পাড়ার আনন্দ-চিহ্ন থাকুক। ইচ্ছা হচ্ছে না চটানে গেরু বাপ হোক! তিনি বিদ্রূপ করে বললেন, তাহলে তুইও বাপ হলিরে গেরু!

বাবুর কথা শুনে গেরু লজ্জা পেল। সে কোনরকমে বলে, জী বাবু, হামি বাপ হবে।...বাবু তিনদিন হোবে মানুষটা মরল।

ঘাটোয়ারীবাবু নিমা বাগদীকে চেনেন। নিমা বাগদীর দল আছে একটা। ওরা দেশ-দেশান্তরের মড়া পুড়িয়ে বেড়ায়। মড়াকে গঙ্গা পাইয়ে দেয়। দূর দূর গাঁয়ের মড়া নিয়ে সে ঘাটে আসে। দূর থেকে এলে মড়াগুলো ফুলে-ফেঁপে ওঠে। কৈলাশ থাকলে সে ব্যবস্থা করত ওদের। পোড়ানোর কাঠ লাগত না। ওদের কাঠের পয়সা বাঁচত, ঘাটবাবুর কাঠ বাঁচত। কৈলাশের থাকত কঙ্কালটা। কৈলাশ কঙ্কালের পয়সার ভাগ দিত বাবুকে। নিমা বাগদীর অনেকদিন দেখা নেই। তিনি ভেবেছিলেন নিমা বুঝি মরেছে।

গেরু বাপের মত শরীর টেনে বলল বাবু আপনার ভি কুছু হোবে। হামার ভি কুছু হেবে।

তিনি জবাব দেন, তা হয় না। দশমাসের আগের মানুষটা আমার বেঁচে নেই। মানুষটাকে পোড়ানো হবে না, সে টাকায় ওরা মদ খাবে। আমার কাঠ বাঁচবে, দু পয়সা হবে? এ সব আমার ভাল লাগে না। ঘাটোয়ারীবাবু ফের চেয়ার টেনে নেন। জানালায়

ঝুঁকে পড়েন। কি ভেবে গেরুকে কাছে ডেকে বলেন, তুই যা। মড়াটা পাবি না। মরা মানুষকে ঠকাতে আমার ভয় করছে গেরু।

গেরুকে উঠতে না দেখে তিনি ফের প্রশ্ন করেন, বাচ্চাটার কি নাম রাখবি?

—বাচ্চাটা না হতে বিবিটা যে মরে যাবে গ।

ঘাটোয়ারীবাবু যেন সব ভুলে গেছেন এমন ভাব দেখিয়ে বলেন, কেন, কেন? কেন মরবে বিবিটা?

—ভুখা থেকে। সে বাত ত বুলছি বাবু।

এ সময় ঘাটোয়ারীবাবুর ইচ্ছা হল বিবিটা ওর মরুক। চটানের সব মরুক। মরে মরে সাফ হয়ে যাক। এত মড়া দেখেছেন, আর একটা মড়া দেখতে ক্ষতি কি? তিনি এবারেও বলেন, তুই যেতে পারিস গেরু। মড়া আমি তোকে দিতে পারব না। চিরদিন তাজা মানুষকে ঠকিয়ে ঠকিয়ে এখন মড়া মানুষকে ঠকাতে ভয় করছে।

গেরু শেষবারের মত চেষ্টা করল, বাবু একটা মরা মানুষ পেলে দুটো জেতা মানুষ বাঁচে।

—তুই আর তোর বিবির কথা বলছিস?

—জী না। বিবি-বাচ্চাটার কথা বুলছি। বাবু হামার বাচ্চা হবে, ওয়ারে মেরে লিবেন না। হামার বাচ্চা—বড় সাধের, বড় সখের। থোড়া মেহেরবানী করেন। আপ মা-বাপ আছে। গেরু ঘাটোয়ারীবাবুর পা জড়িয়ে কাঁদতে থাকে।

—আমি তোর বচ্চাটাকে মেরে ফেলব! খুন করব বলছিস?

—জী বাবু!

—ঠিক বলছিস তুই?

—জী ঠিক। আপ দয়া করেন বাবু।

নিমা বাগদী আকন্দ গাছটার নীচে বসে সব শুনছে।

হরিতকী অফিস ঘরে গেরুর কথা শুনতে পেল। এতরাতে গেরু বাবুর ঘরে কেন? সে ধীরে ধীরে সিঁড়ি ধরে উঠতে থাকে।

গেরু বলে উঠল, বাবু ?

ঘাটোয়ারীবাবু অন্যমনস্কভাবে জবাব দেন, ওঠ! যা! মড়াটা নিয়ে পুঁতেদেগিয়ে। তোর বাচ্চাটা, বিবিটা তো বাঁচুক আগে। পাপ পুণ্যের কথা পরে ভেবে দেখব।

গেরু ডোম বের হয়ে গেল। নিমা বাগদী ঢুকল। গড় হল। ঘাটোয়ারীবাবু বললেন, এখনও তবে বেঁচে আছিস ?

—আছি বাবু। নিমা বাগদীও ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

ঘাটোয়ারীবাবু জানালা থেকে এখন আকাশ দেখছেন।

দূরে পুরনো অশ্বত্থের ছায়ায় ঘাসের নীচে তেমনি প্রজাপতিরা ডিম পাড়ছে। তিনি তার উত্তাপ পাচ্ছেন। গভীর অরণ্যে হরিণ-হরিণীরা তেমনি ছুটছে, ছুটবে। তিনি আকাশ দেখেন আর ভাবেন। তিনি যেন আজ প্রথম আকাশ দেখছেন। আকাশে কত নক্ষত্র, আকাশে কত আলো! কত আনন্দ! কত আনন্দ এই জীবনধারণে। তিনি জানালায় দাঁড়িয়ে গভীর দুঃখে নুয়ে পড়তে থাকেন।

হরিতকী ঘরে ঢুকে দেখে বাবু জানালায় দাঁড়িয়ে আকাশ দেখছেন। সে ডাকে, বাবু।

ঘাটোয়ারীবাবু উত্তর দিতে পারেন না। তিনি জানালায় দাঁড়িয়ে গভীর এক নিঃসঙ্গ যন্ত্রণায় দুঃখ পান।

বাবু উত্তর দিচ্ছেন না দেখে হরিতকী বিস্মিত হয়। ডাকে, বাবু।

হরিতকী ফের ডাকে, বাবু! বাবু! বাবু!—হরিতকী ডেকে সারা হতে থাকে। বাবু জানালা থেকে মুখ তোলেন না। তবু বলেন না—কেন ডাকছিস ? হরিতকী জোর করে বাবুকে টেনে নেয় জানালা থেকে। দেখে বাবু কাঁদছে।

—বাবু তুই কাঁদছিস ?

ঘাটোয়ারীবাবু পাগলের মত হরিতকীকে বুকে টেনে আনেন, যাবি, যাবি তুই ? যেদিকে দু চোখ যায়—এ চটান ছেড়ে অন্য কোথাও ?

হরিতকী হেসে গড়িয়ে পড়ল। – বাবু বুলছিস কি তুই? শেষ বয়সে সোয়ামী-বৌ হয়ে সং সাজতে ইচ্ছা তুর। হরিতকীর হাসি আর থামছে না। এর লাগি কাঁদছিস তু বাবু?

জীবনের এই সং সাজার রাজত্বে আজ মনে হল ঘাটোয়ারী-বাবুর—নিজেও এখানে সং সেজে বসে আছেন। সং সাজার রাজত্বে দুঃখবাবু, গেরু ডোমের সং সাজার সার্থকতা আছে। কারণ তাদের পাত্র পাত্রীরা চোখের জল ফেলবে। কিন্তু ঘাটোয়ারীবাবু সারা জীবন ধরে সং সেজে সেটুকু উপার্জন করতে পারেননি।

হরিতকীর হাত ধরে তিনি বলেন, আমি মরলে তুই কাঁদিস। তিনি ধীরে ধীরে চেয়ারটায় বসলেন। হরিতকী চলে গেল। রামায়ণ মহাভারতের উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন তিনি। রাত বাড়ছে, রাত হাল্কা হচ্ছে। এই ধরণীর কোণে প্রজাপতিরা সব ডিম পাড়ছে। তিনি চোখ বুজে থেকে কোন এক গভীর অরণ্যে চলে যাচ্ছেন, ধরণীর বিচিত্র রকমের জীবনধারণের সঙ্গে ঘাটোয়াড়ীবাবুর আবার সেই ইচ্ছাটা জন্মাল……।

চটানে আবার ভোর হল। আবার রাত্রি হল। দিন রাত্রি যেতে মাস গেল। শীত এলো, শীত গেল। গ্রীষ্ম এল। ঘাটোয়ারীবাবু চেয়ারটায় বসে রামায়ণ পড়তে পড়তে গরমে ছট-ফট করেন।

ঘন বৃষ্টি হয়েছিল যেমন দুদিন, আবার ঘন রোদ তেমনি দু সপ্তাহ। দুপুরের দিকে আবার সেই গরম হাওয়াটাই উঠছে। শিমুল গাছের নতুন পাতাগুলো পুরনো হচ্ছে। এখন একটা পাখী পর্যন্ত চোখে পড়ছে না। এই ঘন রোদে কিছু লোক বাবলার বনে কাঠ কাটছে। নদী থেকে শেষ লোকটা স্নান করে উঠে গেল। দুজন লোক একটা লোককে আমকাঠে পুড়িয়ে শেষ বারের মত 'হরিবোল' দিল। ঘাটোয়ারীবাবু জানালায় বসে সব দেখেন। জানালার একটা কপাট খোলা। ভিতর দিকের দরজা বন্ধ। অন্য জানালাটাও বন্ধ। গরম হাওয়াটা ঘরের ভিতর বেশী ঢুকতে পারছে না। গরম হাওয়াটা দরজায় কিংবা জানালায় আছড়ে পড়ে শব্দ

তুলছে। বাতাসের শব্দটা বিরক্ত করে মারে বাবুকে। তখন চটানের মেয়ে-মরদদের বলতে শোনেন, গেরুর ছেলে হল।

গেরুর ছেলে হওয়ার কথা শুনেই কেন জানি ঘাটোয়ারীবাবুর একটা পাখী দেখার সখ হল। এই ঘন রোদে পাখীরা উড়ছে না। ওরা কোথায় গেল জানার সখ ল। তিনি দরজা খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। দরজা বন্ধ করে শেকল তুলে দেন। তারপর ধীরে ধীরে পাখী দেখার জন্য চ্যান পার হয়ে অশ্বত্থ গাছটার নীচে এসে দাঁড়ান। এখানে শুধু কাক। ওরা অধিকাংশ ডালে ডালে বসে আছে। মাত্র একটি কাক উড়ে উড়ে চিৎকার করছে।

তিনি অন্য পাখী দেখার ইচ্ছায় ক্রমশঃ অশ্বত্থ গাছ পেরিয়ে সরু একটা পথে নামলেন। রোদটা ঠিক কপালে এসে নামছে। সেই পথ ধরে যাওয়ায় কয়েকটা বুলবুল পাখী একটা ইষ্টিকুটুম পাখী ও গোটাদুই শালিক দেখতে পেলেন। তিনি এখানেও থামলেন না। পথটা ধরে ক্রমশঃ দক্ষিণ দিকে আন্দাজ এক ক্রোশ পথ হবে, হেঁটে একটা আমকাঠালের বাগানে এসে বসেন। এখানে সব রকমের পাখীরা যেন বাস করে, এমন একটা ধারণা হল ঘাটোয়ারীবাবুর।

তিনি স্মৃতির ঘরে অনেকক্ষণ হেঁটেও মনে করতে পারছেন না— একটা চালা ঘর, কিছু কাঠ, কিছু মেয়ে-মরদ ভিন্ন তাঁর অন্য অস্তিত্ব আছে। তিনি কিছু ঘাসের উপর সেই স্মৃতিকে বার বার ঠেলে দিয়ে এই পৃথিবীকে দেখার জন্য চোখ খুললেন। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হল এটা যেন দুঃখবাবুর সংসার। কিছু ছেলে, কিছু মেয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটছে। কিছু পাখী দোল খাচ্ছে। খঞ্জনা পাখীরা ঘাসের উপর শুয়ে শরীরের উত্তাপ কুচি ঘাসে মিশিয়ে দিচ্ছে। ছেলে-মেয়েরা কোঁচড়ে ভরে বাতাসে-ঝরা আম তুলে নিচ্ছে। হাওয়া, পাখী, ফুল, ফল, ফুটফুটে ছেলের দল ঘাটোয়ারীবাবুকে বসতে দিল না। তিনি নিজেও কেমন যেন ওদের ছোট হয়ে গেছেন। ধরণীর এইসব বিচিত্র কচিকচি উপা-

দানগুলো যেন বলছে, তুমি আনন্দ কর, আনন্দ কর। তুমি ফুল ফোটাও। তুমি কঠিন হয়ে থেক না। তুমি পাষাণ হয়ে বেঁচনা। তিনি সে জন্য আজ ছুটতে চাইলেন। ছেলে-মেয়েদের কোঁচড়ে কোঁচড়ে আম তুলে দিলেন। আর সকল পাখীদের ডেকে বলেন, আমি আসব, আবার চলে আসব।

—শেষে ঘাটোয়ারীবাবু দেখেন সন্ধ্যা হচ্ছে। সূর্য পাটে বসেছে। গাছে গাছে তার শেষ আলো। নিজেকে বিলিয়ে নিজেকে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। ছেলের দল, মেয়ের দল, এক দুই করে চলে যেতে থাকে। এক দুই করে পাখীরা কোন আঁধারের আশ্রয়ে যেন হারিয়ে যেতে থাকে। নদীর পার ধরে ঘরে ফেরে এই ধরণীর সব সুখী লোকেরা। দুঃখবাবুও হয়ত চটান ছেড়ে ঘরে চলেছেন। দুঃখবাবুর সাজানো সংসারের কথা জেনে আজ কেন জানি মনে হচ্ছে যদি তিনি গাছ, অথবা ফুল কি পাখী হয়ে বাঁচতে পারতেন আর। মনে হল ফুলের ভেতর সৌরভ আছে। সেই সৌরভ তার কানে কানে বলে গেল, ঘাটোয়ারী বাবু, ফুল ফোটাও—ফুল ফোটাও। ঘাটোয়ারীবাবু, সুখ মেয়েতে-মদে নয়, রামায়ণ মহাভারতেও নয় সুখ সৌরভ ফুলের ভেতরে, ফুল ফোটার ভেতরে। তিনি উপলব্ধি করলেন। জীবন-মৃত্যুর চেয়ে বড়। মৃত্যুকে উপেক্ষা করার জন্য তিনি শেষ বারের মত জীবনে ফুল ফোটাতে চাইলেন। তিনি গাছ-ফুল পাখী হতে চাইলেন। কিন্তু হায় তখন তাঁর পারের কড়ি জমা পড়ে গেছে। তিনি গাছ, ফুল অথবা পাখী হতে পারলেন না।